অ্যালবাম

নিমাই ভট্টাচার্য

ডি এম লাইব্রেরী
কলকাতা

প্রথম প্রকাশ
বৈশাখ ১৩৬৮

প্রকাশক
শ্রীগোপালদাস মজুমদার
ডি এম লাইব্রেরী
৪২ কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা

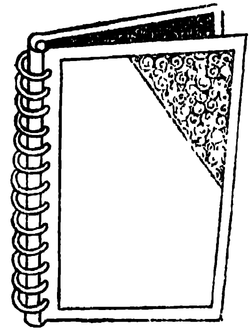
মুদ্রাকর
শ্রীপ্রভাতচন্দ্র রায়
শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড
৫, চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা-৯

সবিনয় নিবেদন,

বেশ ক'বছর আগে 'রাজধানীর নেপথ্যে' লিখে আপনাদের সঙ্গে আমার যোগাযোগ ঘটে। তারপর আরও অনেক বই বেরিয়েছে। মেমসাহেব, ভি-আই-পি, ব্যবিবার, পিকাডিলী সার্কাস, ককটেল, ম্যাডাম, ডার্লিং, তোমাকে, সোনালী ইত্যাদি লিখে সে যোগাযোগ আরও ঘনিষ্ঠ হয়েছে। সম্প্রতি কলকাতার বইয়ের বাজারে আরেক নিমাই ভট্টাচার্যের আবির্ভাব ঘটেছে। আরও হয়তো বেরোবে। সুতরাং, আমার পাঠক-পাঠিকাদের কাছে সনির্বন্ধ অনুরোধ তাঁরা যেন আমার বই কেনার আগে আমার স্বাক্ষর ও সম্পূর্ণ বইয়ের নামের তালিকা মিলিয়ে বই কেনেন।

সকৃতজ্ঞ

নিমাই ভট্টাচার্য



ইন্দ্রাণী

কাজকর্ম দায়-দায়িত্ব, হাসি-ঠাট্টা চিন্তা-ভাবনা থেকে হঠাৎ কিছুক্ষণের জন্য মুক্তি পেলেই মনে মনে আমি যেন মার্কোপোলোর মত ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ি। ঘুরে বেড়াই উত্তর বাংলার জলে-জঙ্গলে, কাঞ্চনজঙ্ঘার কোলে, রাজকাহিনীর দেশ রাজস্থানের মরুভূমিতে। কখনও যাত্রা করি দক্ষিণে। হয়ত নর্মদার তীরে বসে কোন দেব-দেউলে সন্ধ্যারতি দেখে ভোরের সূর্যের প্রত্যাশায় রাত কাটাই কোন সাধুর আখড়ায়। না, আমি থেমে থাকি না, থাকতে পারি না। দিগন্ত বিস্তৃত মহাশূন্য যেন দু' হাত বাড়িয়ে আমাকে ডাক দেয়, আমন্ত্রণ জানায়। আমি উল্কার বেগে ধূমকেতুর মত ঘুরে বেড়াই মধ্যপ্রাচ্যের মেরু প্রান্তরে, সাঁতার কাটি বেইরুটের সমুদ্র সৈকতে, স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকি ইতিহাস বিশ্রুত রোম সম্রাটদের অতীত কীর্তির সামনে। না, এখানেও আমি দাঁড়িয়ে থাকি না, এগিয়ে যাই অনেক দূরে। হয়ত বা মাঝপথে ভেনিসের সেই মার্কস স্কোয়ারে পায়রা নিয়ে খেলা করি। এ খেলাও বেশীক্ষণ ভাল লাগে না। থমকে দাঁড়াই ক্রেমলিনে জার সম্রাটের ঐশ্বর্য দেখে।

ঐ কিছুক্ষণের জন্য মুক্তি পেয়েই আমি আরো কত কি দেখি। পাড়ি দিই সাগর-মহাসাগর, পার হয়ে আসি কত দেশ-মহাদেশ।

না, না, শুধু অরণ্য-পর্বত, শহর-নগর, লুপ্ত সাম্রাজ্যের গৌরব, বর্তমানের বিস্ময় দেখি না। দেখা হয় কত অসংখ্য মানুষের সঙ্গে। ছেলেমেয়ে বুড়ো-বুড়ি। তাদের সঙ্গে হাসি, গল্প করি, নাচ-গান হয়, খাই-দাই, ঘুরে বেড়াই। আরো

কত কি।.........

আজ এতদিন পর পুরানো অ্যালবামটার পাতা ওটাতে গিয়েই বার বার আনমনা হয়ে যাই। মনে পড়ছে কত কথা, কত স্মৃতি।......দৈনন্দিন জীবনে আঘাত-সংঘাতের পলিমাটি দিয়ে যেসব মানুষকে দূরে সরিয়ে রাখি তারা হঠাৎ আমার সামনে এসে দাঁড়ায়।.........

—নমস্কার! খুব ভাল লাগল আপনার গান।......

—ধন্যবাদ।

—সত্যি বলছি, লণ্ডনেএসে এত ভাল রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনব, তা কল্পনাও করি নি।

আমার প্রশংসায় ভদ্রমহিলার সুন্দর দুটো চোখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠলেও লজ্জায় মুখ নীচু করেন। লজ্জা পাবার কারণ ছিল। ওব একটু দূরে তখনও প্রাইম মিনিষ্টার দাঁড়িয়ে। হাসতে হাসতে ভারতীয ছাত্রদেব অটোগ্রাফ দিচ্ছেন। হাই কমিশনারও পাশেই রয়েছেন। বি বি সি-ব রেকর্ডিং কবা শেষ হলেও মাইক্রোফোনটা তখনও ভদ্রমহিলার সামনে সগর্বে তার অস্তিত্ব প্রচার করছে। এ ছাড়াও লণ্ডনের ভারতীয় সমাজেব অনেক কেষ্ট-বিষ্টু চারপাশে উপগ্রহেব মত ভিড় করে আছেন।

দু পা এগিয়ে উনি একটু মুখ তুলে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি বুঝি প্রাইম মিনিষ্টারের সঙ্গে এসেছেন?

– হ্যাঁ। সংক্ষিপ্ত জবাব।

— আপনি কী ডিপ্লোম্যাট?

—না না, আমি জার্ণালিষ্ট। প্রাইম মিনিষ্টারের সঙ্গে যেতে হবে মালবোরা হাউস। তাই সময় নষ্ট না করে বলি লণ্ডন ছাডার আগে আরেকদিন ভাল করে আপনার গান শুনব।

—নিশ্চয়ই শোনাব। এবার একটু ভাল করে আমার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করেন, কতদিন এখানে থাকবেন?

মোটামুটি দিন পনের থাকব ভেবে এসেছি। এবার একটু ঠাট্টা করে বলি, আপনি যদি নিয়মিত গান শোনান, তাহলে কবে ফিরব বলতে পারি না।

হাজার হোক ওঁর বয়স বেশী নয়। তার উপর আছে দেহ সৌষ্ঠব ও রূপ। উনি আমার কথায় আরো লজ্জিত হন। তবু সহজ হয়ে বলেন, আপনার সময় হলে রোজই গান শোনাতে পারি। এবার উনি আমাকে প্রশ্ন করেন, শনিবার

সন্ধ্যায় কী আপনি ফ্রি আছেন ?

—শনিবার সকালে প্রাইম মিনিষ্টার রওনা হবার পরই আমি ফ্রি।

—তাহলে শনিবার দুপুরে আমার ওখানে আসুন। গানও শুনবেন, খাওয়া-দাওয়াও করবেন। উনি সঙ্গে সঙ্গে হ্যাণ্ড ব্যাগ থেকে বের করে একটা ভিজিটিং কার্ড আমার হাতে দিলেন।

—তথাস্তু।

শনিবার সকালে হিথরো এয়ারপোর্টে প্রাইম মিনিষ্টারকে বিদায় জানিয়ে কেনসিংটনে হাই কমিশনারের বাড়িতে কিছুক্ষণ কাটালাম। তারপর হোটেল। তারপর পিকাডিলী লাইনের টিউবে কিংস্ ক্রশ ; সেখান থেকে নদার্ণ লাইনের এজওয়াজের গাড়ীতে গোল্ডার্স গ্রীন।

ইন্দ্রাণী চৌধুরী হাসিমুখে আমাকে অভ্যর্থনা করে প্রশ্ন করলেন, আসতে কোন কষ্ট হয় নি তো ?

মুগ্ধ হয়ে ইন্দ্রাণী চৌধুরীর দিকে তাকিয়ে মাথা নেড়ে বললাম, না।

ভিতরে এলাম, বসলাম। দুজনেই। পাশাপাশি না হলেও বেশ কাছাকাছি।

—আগে চা খাবেন, না গান শুনবেন ? নাকি এখনই লাঞ্চ খাবেন ?

আমি মাথা নেড়ে বললাম, না, কোনটাই না। আগে একটু কথাবার্তা বলি।

—কথাবার্তা তো নিশ্চয়ই হবে কিন্তু আপনার ক্ষিদে লাগে নি তো ?

—না।

ইন্দ্রাণী একটু হেসে বলে, দেখবেন, লজ্জা করবেন না।

—লাজুক হলে কী এভাবে আপনাকে বিরক্ত করার ক্ষমতা হতো ?

—না, না, ওকথা বলবেন না। আমি বিরক্ত হবো কেন ? ইন্দ্রাণী হঠাৎ চোখের দৃষ্টি গুটিয়ে নেয়। মুখ নীচু করে বলেন, আপনি এসেছেন বলে খুশীই হয়েছি।

—কেন ?

ইন্দ্রাণী মুখ না তুলেই বলেন, ছুটির দিনগুলো যেন কাটতে চায় না। এবার একবার আমার দিকে তাকিয়ে বলেন, আপনি এসেছেন বলে তবু আজকের দিনটা বেশ কেটে যাবে।

আমি অবাক হয়ে বলি, লণ্ডনে বাস করেও বলছেন ছুটির দিনগুলো কাটতে

চায় না। লণ্ডনেতো সবাই ছুটির দিনে আনন্দে পাগল হয়ে যায়।

—তা ঠিক।

—তাহলে আপনিই বা ছুটির দিনে একলা থাকেন কেন?

উনি হেসে বললেন, আমি একলা বলে।

ইন্দ্রাণীর কথা শুনে একটু খটকা লাগল কিন্তু ঐ বিষয়ে কোন প্রশ্ন করলাম না। জানতে চাইলাম, কতকাল লণ্ডনে আছেন?

—বছর দুয়েক।

—তার আগে?

উনি একটু হেসে বললেন, তার আগে আর কোথায় থাকব? সেই জব চার্ণকের কলকাতাতেই ছিলাম।

—হঠাৎ চলে এলেন কেন?

ইন্দ্রাণী আমার দিকে তাকিয়ে বলে, জীবনের সব বড় ঘটনাই তো হঠাৎ ঘটে।

—তা ঠিক কিন্তু······

—এই যে প্রাইম মিনিষ্টারের মিটিং-এ হঠাৎ আপনি আমার সঙ্গে······

ওর কথা শুনেই হাসি পায়। এই কথার মাঝপথেই আমি বাধা দিই, এটা তো তেমন কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা নয়।

হঠাৎ এক ঝলক হাসিতে ইন্দ্রাণীর সারা মুখখানা ভরে গেল। বললো, হতেও তো পারে।

কথায় কথায় সময় গড়িয়ে যায়। ইন্দ্রাণী হঠাৎ উঠে দাঁড়ায়। বলে, ছি, ছি, আপনাকে এক কাপ কফিও দিলাম না।

কফি আর গল্পে সময় আরো এগিয়ে যায়। কথায় কথায় বেরিয়ে গেল আমরা দুজনেই এক কলেজে পড়েছি। উনি সকালে, আমি দুপুরে। তাছাড়া দুজনে প্রায় সমসাময়িক। আমরা দুজনেই অনেক সহজ হই।

হা ভগবান! তিনটে বেজে গেছে। হঠাৎ ইন্দ্রাণী প্রায় চীৎকার করে ওঠে। ও সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাড়িয়ে বলে, চলুন, চলুন, শিগগির খেতে বসি।

খেতে বসেই ইন্দ্রাণী বললো, আপনাকে গান শোনানোই হলো না।

—ভালোই হলো।

—কেন?

আমি একটু হেসে বললাম, কাল আবার আসব।

ইন্দ্রাণী হেসে বললো, শুধু কাল কেন, যে কদিন এখানে আছেন, সে কদিন রোজই আসুন।

-- প্রস্তাবটা আমার পক্ষে লোভনীয় হলেও সেটা কী উচিত হবে ?

ও লুকিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে একটু যেন ম্লান হাসি হেসে বললো, আপনার মর্যাদায় না বাধলে আমার দিক থেকে কোন আপত্তি বা ভয়ের কারণ নেই।

আমি হাসতে হাসতেই বলি, সত্যি ?

ইন্দ্রাণী আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে বললো, সত্যি।

ভেবেছিলাম খাওয়া-দাওয়ার পরই চলে যাব ও সম্ভব হলে কিংষ্টনে গিয়ে সত্যপ্রিয় ও মনীষার সংসার দেখে আসব। কিন্তু না, ইন্দ্রাণী ছাড়ল না। বললো, একটু বিশ্রাম না করে যাবেন কোথায় ? বিশ্রাম না, হলো আড্ডা আর খোশ গল্প। তারপর শুরু হলো গান—অনেক পাওয়ার মাঝে মাঝে কবে কখন একটু-খানি পাওয়া, সেইটুকুতেই জাগায় দখিন হাওয়া। পর পর আরও অনেক গান। একবার বললাম, আপনার তো সারাটা দিনই আমি নষ্ট করলাম। আর একটা গান শুনেই আমি উঠব। ইন্দ্রাণী কোন কথা না বলে হারমোনিয়ামটাকে আরও কাছে টেনে নিয়ে গাইল -হায় অতিথি, এখনি কি হল তোমার যাবার বেলা।

আমার জীবনে সে এক অবিস্মরণীয় দিন। হাসি, খুশি, গানে ভরা সেদিনের কথা কোনদিন ভুলবো না। আমাদের দুজনের অতীত অপরিচয়ের হিমালয় ঐ একদিনের মেলামেশায় মাটিতে মিশে গেল। ঠিক বিদায় নেবার আগে বললাম, কাল তো রবিবার। কোন এনগেজমেণ্ট আছে নাকি ?

—হ্যাঁ : কাল তো আমার অনেক কাজ।

—সারাদিনই ব্যস্ত থাকবে ?

—হ্যাঁ।

— সন্ধ্যার পর ?

সন্ধ্যার পর ওয়েষ্ট এণ্ডে সিনেমা দেখতে যাব।

এবার আমি হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করি, কাল কাকে নিয়ে এত ব্যস্ত থাকবে ?

ইন্দ্রাণী হাসতে হাসতে বললো, তোমাকে নিয়ে।

রবিবার সারাদিন ঘোরাঘুরির পর ওয়েষ্ট এণ্ডে সিনেমা দেখতে যাবার আগে হাইড পার্কের সারপেনটাইনের ধারে বসে দুজনে গল্প করছিলাম। হঠাৎ ইন্দ্রাণী বললো, ভাবিনি এমন করে কারুর সঙ্গে মিশব।

—সত্যি, এমন করে আমার সঙ্গে মেলামেশা করছ কেন ?

—ইচ্ছে করল। ইন্দ্রাণী একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো, কতকাল আর কত ইচ্ছাকে দমন করে রাখব।

কথাটা কেমন বেসুরো লাগলো। বললাম, তার মানে ?

ও একটু অদ্ভুতভাবে হাসল। বললো, তার মানে আমিও জানি না।

—তবে কেন মনের ইচ্ছা চেপে রেখেছ ?

—রাখতে হয়।

ইন্দ্রাণী আমার দু-এক হাত দূরে বসে থাকলেও মনে হলো, সে যেন আমার অপরিচিতা, বহু দূরের মানুষ। কিছুতেই সাহস করে দু'চোখ তুলে ওর দিকে তাকাতে পারলাম না। সারপেনটাইনের জলের উপর দিকে দৃষ্টি ছড়িয়ে দিলাম হাইড পার্কের সীমান্ত রেখায়।

আমি মনে মনে ইন্দ্রাণীর কথা ভাবতে ভাবতেই কেমন যেন তন্ময় হয়ে গিয়েছিলাম। ভাবছিলাম, ওর রূপের কথা, অফুরন্ত যৌবনের কথা, ওর গানের কথা। অপূর্ব ! মুগ্ধ না হয়ে উপায় নেই কিন্তু কোথায় যেন একটা ছন্দপতন ঘটে গেছে। কি যেন একটা বেদনা, বুকভরা অভিমান লুকিয়ে আছে ওর মনের মধ্যে।

আমি ওর কথা ভাবতে ভাবতে কোথায় যেন হারিয়ে গিয়েছিলাম। হঠাৎ আমার একটা হাতের উপর হাত রাখতেই চমকে উঠলাম। আমি কিছু বলার আগেই ও বললো, চলো, উঠি। দেরী হয়ে যাবে যে—

—আর সিনেমা দেখতে ইচ্ছে করছে না।

—কেন ?

—এমনি।

ইন্দ্রাণী আমার হাতের উপর থেকে ওর হাত সরিয়ে নিয়ে জোর করেই একটু হাসল। বললো, অনেকটা পথ রোদ্দুরের মধ্যে হাঁটার পর ভেবেছিলাম গাছের ছায়ায় একটু জিরিয়ে নেব কিন্তু তাও হলো না।

এবার আমিও একটু হাসি। বোধহয় বিদ্রূপের হাসি। বলি, তুমি কী প্রেমে পড়েছিলে ?

ইন্দ্রাণী আমার প্রশ্ন শুনে হাসে। একটু প্রাণ খুলেই হাসে। বলে, হঠাৎ এ প্রশ্ন করছ কেন ?

—তোমার কথাবার্তা শুনে মনে হচ্ছে, বোধহয় প্রেম করেও বিয়ে করতে পারো নি ; তাই বড় দুঃখ পেয়েছ।

ওর মুখে তখনও হাসি। প্রশ্ন করে, আর কিছু মনে হয় না?

—হয় বৈকি।

—কী মনে হয়?

—মনে হয়, তোমাকে কোনদিনই রোদ্দুরের মধ্যে বেরুতে হয় নি; বরং বেশ সুখে, স্বাচ্ছন্দ্যে ও আনন্দেই জীবন কাটিয়েছ।

হঠাৎ ইন্দ্রাণী কালকেউটের মত ফণা তুলে গর্জে উঠল, থান কাপড় পরে হাউ-মাউ করে না কাঁদলে বুঝি······

আমি যেন হাজার ভল্টের ইলেকট্রিক শক্ পাই। বলি, কী বললে?

ইন্দ্রাণীর কণ্ঠস্বরে আগুন, রূপ-যৌবন কী গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দেওয়া যায়? নাকি রূপ-যৌবন থাকাও মহা অপরাধ?

সত্যি আমি বুঝতে পারি নি, যে মাটির উপর দিয়ে হাঁটছি তার তলাতেও জল। বসন্তের পরই যে গ্রীষ্মের রুক্ষতা, তা কী সব সময় মনে পড়ে?

ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেবার পর ইন্দ্রাণী বেড়াতে গিয়েছিল কাকার কাছে কার্শিয়াং-এ। তখন গরমকাল। কার্শিয়াং-এ সবার বাড়ীতেই কিছু অতিথি। ডাঃ ঘোষালের বাড়ীতে ওর কাকা-কাকীমা এসেছিলেন। ওরা ইন্দ্রাণীকে দেখে মুগ্ধ। সঙ্গে সঙ্গে প্রস্তাব, মেয়েটিকে আমরা পুত্রবধূ করব। খবরটা শুনে ইন্দ্রাণী প্রথমে হেসেছিল, কিন্তু না, সে হাসি দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। এমন সুপাত্রকে হাতছাড়া করতে রাজী হলেন না ইন্দ্রাণীর বাবা-মা। ইন্দ্রাণী বিদ্রোহ না করলেও প্রতিবাদ করেছিল—মা, আমি পড়াশুনা করব। এখন আমার বিয়ে দিও না। বলেছিলেন, এমন সুপাত্র কী কেউ হাতছাড়া করে? তাছাড়া ওরা তো তোকে পড়াবে বলেছে।

সতের বছর বয়সে ইন্দ্রাণী স্বামীর হাত ধরে চলে গেল বাঁকুড়া।

উৎসব বাড়ীর আলো নিভে যাবার ক'দিন পরই স্বামী চলে গেলেন কলকাতা; নববিবাহিতা স্ত্রীকে রেখে গেলেন বাবা-মার সেবায়।

মাসখানেক মোটামুটি ভালই কাটল। তারপর শুরু হলো টীকা-টিপ্পনী ও ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ। শ্বশুর-শাশুড়ী, ননদ-দেওর সবার। এসব শুনে দুঃখ পায় ইন্দ্রাণী কিন্তু মনে মনে স্বপ্ন দেখে, স্বামী তাকে কলকাতায় নিয়ে যাবে। সে কলেজে পড়বে, ভাল করে গান শিখবে। আরও কত কি। মাসখানেক পর পরই স্বামী দু-একদিনের জন্য আসেন কিন্তু ইন্দ্রাণীকে সোহাগ করেই চলে যান। কলকাতা নিয়ে যাবার কোন কথাই বলেন না।

সারাদিন সংসারের কাজকর্ম আর শ্বশুর-শাশুড়ীর সেবা করে ইন্দ্রাণী হাঁপিয়ে

ওঠে। তবু পুরানো অভ্যাস ছাড়তে পারে না। একটু ফুরসত পেলেই অন্তত কপালকুণ্ডলা বা দেনা-পাওনার উপর দিয়েই আবার চোখ বুলিয়ে নেয়। সঙ্গে সঙ্গে একজন ননদ ছুটে আসবেই, হা ভগবান! তুমি নভেল পড়ছ? ওদিকে ভাত নামাতে গিয়ে মার হাত পুড়ল। ইন্দ্রাণী মনের দেনা-পাওনা না মিটিয়েই ছুটে যায়। না, হাত পোড়ে নি; তবে চোখে ছানি পড়েছে বলে দু-এক হাতা ভাত পড়ে গেছে।

একদিন ইন্দ্রাণী বোধহয় ভুল করেই খাটের তলা থেকে পুরানো হারমোনিয়ামটা টেনে বের করল। হঠাৎ গাইতে শুরু করল—ভেঙ্গে মোর ঘরের চাবি নিয়ে যাবি কে আমারে, বন্ধু আমার।

বিদ্যুৎ বেগে ছুটে এলো ননদ, এ রাম! কি অসভ্য গান গাইছ তুমি?

একে বাতের রুগী, তার উপর চোখে ছানি। তাই শাশুড়ীর আবির্ভাব হলো মিনিটখানেক পরে। কোন ভূমিকা না করেই বললেন, তোমার কি কোন কাণ্ডজ্ঞান নেই বৌমা? এটা কি বেশ্যা-বাঈজীর বাড়ী যে অমন করে হারমোনি বাজিয়ে গলা ছেড়ে গান গাইছ? অতই যদি গান গাইবার সখ হয় তাহলে যাও না শ্বশুরকে গিয়ে কেত্তন শোনাও গে।

ইন্দ্রাণী হাতের উপর থুতনি রেখে একটু হেসে বলে, শরৎচন্দ্র এত লিখেও মেয়েদের দুঃখ কিছু কমে নি। ক'টা বছর কি অপমান আব কি অত্যাচার সহ্য করেছি তা তোমাদের কল্পনার বাইরে।

—তুমি কি বরাবরই বাঁকুড়ায় ছিলে?

—না। শাশুড়ী মারা যাবার পর শ্বশুরকে নিয়ে কলকাতায় এসেছিলাম।

—তারপর?

—তারপরও শুনতে চাও?

—যখন বলছ, তখন সবই বলো।

—ওসব বলতেও ঘেন্না করে। তাছাড়া শুনলে তোমারও মন খারাপ হয়ে যাবে। ইন্দ্রাণী হঠাৎ একটু আনমনা হয়ে যায়। কি যেন ভাবে। তারপর বলে, কেন জানি না, বাঁকুড়ায় যাবার পর থেকেই সব সময় আমার মনে হতো, আমাকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে। তাই কলকাতায় আসার পর শ্বশুরের সব তর্জন গর্জন উপেক্ষা করেও আমি পড়াশুনা শুরু করলাম।

—তোমার শ্বশুর-শাশুড়ী বা ননদ যে তোমাকে এত অপমান, অত্যাচার করত কিন্তু তোমার স্বামী কোন প্রতিবাদ করতেন না?

—না। ঐ কূপমণ্ডুক পরিবারের ছেলে হয়ে প্রতিবাদ করার সাহস তাঁর হয় নি ঠিকই কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে তিনি কোনদিন আমাকে দুঃখ দেন নি।

—উনি মারা গেলেন কিভাবে?

—বাড়ী-ঘরদোর মেরামত করাবার ব্যবস্থা করতে কদিনের জন্য বাঁকুড়ায় গিয়েই ওঁর জ্বর হলো। আমি খবর পাবার পর অসুস্থ শ্বশুরকে নিয়ে যখন হাজির হলাম, তখন আর তাঁর দেখা পেলাম না।

—ইস।

ইন্দ্রাণী হাসে। অদ্ভুত হাসি। বলে, সম্পত্তির ভাগীদার হয়ে যাতে দাবি না করি সেজন্য শ্বশুরবাড়ীর লোকজন সিঁদুর মুছে, শাঁখা ভেঙ্গে, থান পরিয়েই আমাকে কলকাতায় পাঠিয়ে দিল।

—ওরা তোমাকে রাখলেন না?

ইন্দ্রাণী মাথা নেড়ে বললো, না। ছেলেই যখন চলে গেল তখন বিধবা বউয়েব বোঝা তাঁরা বইবেন কেন?

এবার আমি খুব জোরে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললাম, চমৎকার।

কিছুক্ষণ কেউই কোন কথা বলি না। আমি অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে বসে থাকি। ওর মুখের দিকে তাকাতেও ভয় লাগে।

একটু পরে জিজ্ঞাসা করলাম, দেশ ছেড়ে লণ্ডনে চলে এলে কেন?

—বাপের বাড়ী শ্বশুরবাড়ী কারুরই বোঝা হবো না বলে।

—শুধু এই জন্য?

ইন্দ্রাণীর মুখে ম্লান হাসি ফুটে উঠল। বললো, না। ও একটু থেমে বেশ টেনে টেনে বললো, আমার অনেক টাকার দরকার।

—কেন?

ও একটু জোরেই হাসে। বলে, আমাকে বাঁকুড়া যেতে হবে না?

—তার জন্য অনেক টাকা কী হবে?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, অনেক টাকার দরকার। ইন্দ্রাণীর ওষ্ঠে বিদ্রূপের হাসি, চোখে যেন প্রতিহিংসার আগুন। বলল, স্বামীকে হারাবার পর প্রথম যখন শ্বশুরবাড়ী যাব, তখন তো খালি হাতে যেতে পারি না।

আমি বিদায় নেবার দিন ইন্দ্রাণী ভিকটোরিয়া টার্মিন্যাল থেকেই ফিরে গেল না; হিথরো এয়ারপোর্ট পর্যন্ত এলো। আমি ইমিগ্রেশন কাউণ্টারে যাবার ঠিক আগে ইন্দ্রাণী বললো, আমাকে একটু সাহায্য করবে?

—নিশ্চয়ই করব।

—সামনের বছর বাবা-মাকে দেখতে দেশে আসব কিন্তু প্রথমেই কলকাতা যাব না। দিল্লী আসব। তুমি কী আমাকে একদিনের জন্য গয়া নিয়ে যেতে পারবে?

—নিশ্চয়ই নিয়ে যাব।

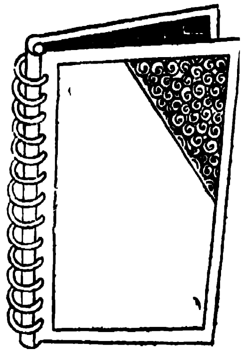
আমি ইমিগ্রেশন কাউন্টারের দিকে পা বাড়িয়েও থমকে দাঁড়াই। অবাক হয়ে ইন্দ্রাণীকে দেখি। ভাবি। আনমনে রোমন্থন করি সদ্য বিগত দিনগুলোর স্মৃতি। তারপর আবার ওর দিকে তাকিয়ে ওর চোখের কোনায় জল দেখে চমকে উঠি কিন্তু কোন কথা বলতে পারি না। ইন্দ্রাণী একটা চাপা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললো, যাও, আর সময় নেই।

আমি ওর দিকে তাকিয়েই দৃষ্টি গুটিয়ে নিই। বোধহয় একটা দীর্ঘশ্বাসও ফেলি।

ও আবার বলল, চিঠি দিও।

আমি মাথা নেড়ে বললাম, হ্যাঁ, দেব।

ইন্দ্রাণী আমার দিকে তাকিয়ে আর এক মুহূর্তও দাঁড়াতে পারল না। ও চোখের জল লুকোবার জন্য প্রায় দৌড়ে পালিয়ে গেল।



কেউ বলে তাস, কেউ বলে দাবা-পাশা; কেউ বা বলে মদ-গাঁজা। এসব নেশা ধরলে নাকি ছাড়া যায় না। আমি বলি, এহ বাহ্য! পথের নেশা আর মানুষের নেশার মত সর্বনেশে নেশা হয় না। একবার যে এর স্বাদ পেয়েছে, তাকে আর কোন নেশাতেই কাত করা যাবে না।

দাবা-পাশা মদ-গাঁজা বৈমাত্র ভাই। এদের দুজনকে একসঙ্গে তাল দেওয়া দায়। প্রায় অসম্ভব। কিন্তু পথের নেশা মানুষের নেশা—তা নয়। এরা যেন সহোদর। বড় সদ্‌ভাব দুজনের মধ্যে। একজনকে ধরলেই আরেকজন এগিয়ে আসবে। ভারী মজা এ যৌথ নেশায়।

ছোটবেলায় মাকে হারিয়েছি। তাই ঘরের আকর্ষণের চাইতে পথের আকর্ষণ আমার কাছে বরাবরই বেশি। কৈশোরে, যৌবনে সে আকর্ষণ কমেনি; বরং বেড়েছে। ঘরের চার দেয়ালের মধ্যে নয়, পথের ধারে, গাছের ছায়ায়, মাঠের কাছে, নদীর পাড়েই ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে আমার জীবনের টুকরো টুকরো অবিস্মরণীয় মুহূর্তগুলির স্মৃতি। ইতিহাস।

সে ইতিহাসের নায়ক আমি নই, অন্যেরা। নানা জন। কচিকাঁচা থেকে বুড়োবুড়ী। হরেক রকমের মানুষ। মেয়ে, পুরুষ। কেউ সুখী, কেউ দুঃখী, কেউ ফর্সা, কেউ কালো। সবাইকে হয়ত সবার পছন্দ হবে না, ভাল লাগবে না। কেউ কেউ হয়ত এদের ঘেন্নাও করেন। তা হোক। পথে বেরিয়েই

এদের দেখেছি। ভালবেসেছি। এদের দেখতে আবার পথে বেরিয়েছি। এ গোলক ধাঁধা থেকে বেরুবার রাস্তা নেই, বোধহয় ইচ্ছেও নেই।

সব সময় যে এদের দেখার জন্য পথে বেরোই, তা নয়, কাজেই বেরোই। সংবাদপত্রের সংবাদ সংগ্রহের জরুরী কাজে। সঙ্গে লেদার জ্যাকেটে মোড়া ছোট্ট বেবি হার্মেস টাইপরাইটারটা থাকবেই। তবু এদের সঙ্গে দেখা হয়। হবেই। এ যেন সুন্দরবনের জমিজমা। সমুদ্রের নোনা জল ঢুকে পড়বেই। বাঁধ দিলেও ভেঙ্গে যায়। বার বার। সব সময়।

যাচ্ছি দিল্লী থেকে বাঙ্গালোর। পথে দু'তিন দিনের জন্য মাদ্রাজ। এয়ারকণ্ডিসনড্ ডিলুক্স এক্সপ্রেস। এয়ারকণ্ডিসনড্ টু-টায়ার স্লিপার কোচের একটা লোয়ার বার্থ আমার। আমার উপরের বার্থ এক মৌলানার। সামনের নীচের বার্থে একটি মেয়ে; তার উপরের বার্থ এক তামিল ভদ্রলোকের। দিল্লী থেকে মাদ্রাজ দীর্ঘ পথ। তাই ষ্টেশনে এসে কামরায় ঢুকেই কোচ এ্যাটেনডাণ্টকে বললাম, বিছানা দাও। ট্রেন ছাড়ার আগেই বিছানা তৈরী করে দিল কোচ এ্যাটেনডাণ্ট। ট্রেন ছাড়তে না ছাড়তেই আমি কোট-প্যাণ্ট ছেড়ে পাবজামা পাঞ্জাবি পরে এলাম বাথরুম থেকে। তারপর ব্রীফকেশ থেকে ডজন খানেক খবরের কাগজ আর ইংরেজি-বাংলা পত্র-পত্রিকা বের করে অর্ধশায়িত হলাম।

ট্রেনে উঠলেই কিছু মানুষের মুখে খৈ ফোটে। বিশ্বসংসারের সমস্ত বিষয়ে তাবা বিশেষজ্ঞ। সব ব্যাপারেই তাদের বক্তব্য আছে। স্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট বক্তব্য। কোন সহযাত্রী ভিন্ন মত প্রকাশ করলেই তর্ক-বিতর্ক। কখনও কখনও ঝগড়া। আমি ঠিক এর বিপরীত। ট্রেনে উঠলেই বোবা। কদাচিৎ কখনও সৌভাগ্যক্রমে বন্ধুত্বপূর্ণ সহযাত্রী পেলে আমি আর চুপ করে থাকতে পারি না। হাসি-ঠাটা গল্প-গুজবে যোগ দিই। হয়ত মেতেও উঠি। অন্যথায় নৈব নৈব চ।

ট্রেন ছাড়ল ঠিক সময়। সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ডিনার এল। খাবার আর প্যান্ট্রিকারের কর্মীদের দেখেই বোঝা যায়, এ গাড়ী মাদ্রাজ চলেছে। মৌলানা সাহেব প্যান্ট্রিকারের খাবার নিলেন না। ওঁর সঙ্গে বিরাট একটা টিফিন কেরিয়ার। বুঝলাম, আগামীকালও উনি প্যান্ট্রিকারের মুখাপেক্ষী হবেন না। সামনের মেয়েটি খাবার নিলেও তামিল ভদ্রলোক নিলেন না। বোধহয় খেয়ে এসেছেন।

আমার খাওয়া প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, এমন সময় মৌলানা সাহেব টিফিন কেরিয়ার খুললেন। ভাবলাম, বোধহয় এবার উনি খাবেন কিন্তু না, উনি খেলেন

না। কোন ভূমিকা না করেই উনি আমার প্লেটে বেশ খানিকটা হালুয়া দিয়ে বললেন, খুব ভাল হালুয়া। খেয়ে দেখুন।

আমি চমকে উঠি। বলি, একি! আমাকে দিলেন কেন? আপনি খান।

মৌলানা সাহেব আমার দিকে তাকিয়ে এক গাল হাসি হেসে বললেন—

কভি ব্যয়ঠে বৈঠায়ে দিলকি হালত
এয়সী হোতি হ্যায়,
তড়পকর চ্যয়ন মিলতা হ্যায়।
খুশি রোনেসে হোতি হ্যায়।

আমি মুগ্ধ হয়ে ওর দিকে তাকাতেই উনি মাথা নেড়ে দাড়ি দুলিয়ে বললেন, তুমি বল ভাইসাব, কখনও কখনও কৃচ্ছ্রসাধনেই শান্তি হয় কিনা? তুমিই বল, কখনও কখনও হাউ হাউ করে কেঁদে চোখের জল ফেলেই আনন্দ হয় কিনা?

আমি বললাম, জরুর।

তবে খাও; কোন প্রশ্ন করো না।

আমি আর প্রশ্ন করি না। খেতে শুরু করি। সত্যি অপূর্ব। এ বাঙ্গালী বাড়ীর সুজি নয়, উত্তর ভারতের হালুয়া। তার উপর বেগম সাহেবার তৈরী। হালুয়া খেয়ে মনে হয়, অতীত দিনের কোন বাদশা-বেগমের রক্ত তাঁর শিরা উপশিরায় এখনও বইছে। হালুয়া খেয়েই বুঝতে পারি, এদের গলায় দরবারী কানাড়া কেন ভাল লাগে।

হঠাৎ কানে এল তামিল ভদ্রলোকের কণ্ঠস্বর, ইজ ইট উর্দু কাপলেট?

মৌলানা সাহেব বললেন, ইয়েস।

সামনের দিকে মুখ তুলে শুধু তামিল ভদ্রলোককেই দেখলাম না, মেয়েটির দিকেও নজর পড়ল। মেয়েটির শুধু যৌবন নেই, রূপও আছে। মনে হল, বেশ আগ্রহের সঙ্গেই আমাদের কথাবার্তা শুনেছে, শুনছে।

এবার মৌলানা সাহের মেয়েটিকে বললেন, বহিনজী! বলুন।

তমন্নাও কোঁ জিন্দা আরজুও কোঁ
জোঁয়া করলু—
এ শর্মিলী নজর কহে দে তো
কুছ গুস্তাকিয়া কর্লু—
হাজারো সথ আরমাঁ লে
রহে হ্যায় চুটকিয়া দিলমে
হায় উনকি ইজাজৎ দে
তো বেবাকিয়া কর্লু।

আমি মৌলানা সাহেবের শের শুনেই বললাম, সুভান-আল্লা ! সুভান-আল্লা।

উনি আমার দিকে তাকিয়ে কৃতজ্ঞতা জানাবার জন্য একবার মাথা নীচু করেই মেয়েটিকে বললেন, তোমার লাজুক চোখের অনুমতি পেলে অ'মার খুব ইচ্ছে, একটু অন্যায় করি। আমার মনের একান্ত বাসনা কোন সঙ্কোচ না করে বলাব জন্য ভিক্ষা চাইছি।

মেযেটির চোখে- মুখে খুশির হাসি। বলল, বলুন। এত দ্বিধা করছেন কেন ?

মৌলানা সাহেব বললেন, একটু হালুয়া দিতে চাই।

মেয়েটি হেসে বলল, নিশ্চয়ই দেবেন।

ভেবেছিলাম, শুয়ে-বসে আর একটু আধটু পডাশুনা করেই এই দীর্ঘ যাত্রা-পথ পাড়ি দেব কিন্তু মৌলানার কৃপায় তা হল না। সাড়ে ন'টায় মথুরা পৌঁছবাব আগেই আমাদের আলাপ পরিচয় গল্প-গুজব জমে উঠেছে। জানলাম, মৌলানা সাহেব রামপুরের বাসিন্দা। নবাব বাড়ীর সঙ্গে আত্মীয়তা আছে মায়ের সূত্রে। বিয়েও করেছেন নবাব বাড়ীর এক আত্মীয়ের কন্যাকে। তবে ব্যবসা কবেন মোরাদাবাদে। এখন চলেছেন মাদ্রাজ। সেখান থেকে ভেলোর।

ভেলোর ! ভেলোরে কেন ? আমি আর তামিল ভদ্রলোক প্রায় একসঙ্গেই প্রশ্ন করি।

মৌলানা সাহেব হেসে বললেন, ঠিকই সন্দেহ করছেন। ক্রিশ্চিয়ান মেডিক্যাল কলেজেই যাচ্ছি।

কেন ? আবার আমবা প্রশ্ন করি।

মৌলানার মুখে সেই হাসি। বললেন, রামপুরের ডাক্তাররা সন্দেহ করছে, ব্রেনে কিছু হয়েছে। তাই যাচ্ছি।

মুহূর্তের মধ্যে আমাদের তিনজনের মুখের চেহারা বদলে যায়। উৎকণ্ঠিত হই তিনজনেই। মনে মনে সমবেদনা অনুভব করি। মৌলানার দৃষ্টি এড়ায় না। উনি হেসে বলেন—

তবীবী সে কেয়া পুঁছ
ইলাজে দর্দদিল আপনা
মরজ্ যব জিন্দগী খুদ
হো তো ফির উস্‌কি
দবা কেয়া হ্যায়।

এবার আর আমি তারিফ করতে পারি না। শুনেই মনে মনে চুরি করে

দীর্ঘশ্বাস ফেলি। মৌলানা হেসে বলেন, ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করব, আমার অন্তরের যন্ত্রণার ওষুধ কী? আমার জীবনটাই যখন রোগ হয়ে দাঁড়িয়েছে, তখন তার কী কোন ওষুধ থাকতে পারে?

আমরা ওকে উৎসাহ দিই, উদ্দীপনা জোগাই। বলি, ভেলোরে গিয়ে আপনি নিশ্চয়ই ভাল হয়ে যাবেন।

মৌলানা বললেন, আজকাল প্রায়ই বাহাদুর শাহ জাফরের একটা শের মনে পড়ে।

আমি বললাম, কোন শেরটা?

উমরেদরাজ মাঙ্‌গকে
লায়ে থে চার দিন
দো আরজুমে কট গয়ে
দো ইন্তেজার মে।

আমি মৌলানার দিকে করুণ দৃষ্টিতে তাকাতেই মেয়েটি প্রশ্ন করল, মানে কী?

মৌলানা হেসে বললেন, ভগবানেব কাছ থেকে চারদিনের জীবন ভিক্ষা পেয়েছিলাম। তার দুদিন কেটে গেল আকাঙ্ক্ষায়, দুদিন কেটে গেল অপেক্ষায়।

মেয়েটি বলল, অপূর্ব। হানড্রেড পার্সেণ্ট কারেক্ট।

এবার মৌলানা বললেন, আমাব কথা বাদ দিন। এবাব আপনাদের পবিচয় শুনি।

আমি আমার পরিচয় দিলাম, খবরের কাগজের জন্য টাইপ রাইটার খট্ খট্ করি আব একটু-আধটু বাংলা গল্প উপন্যাস লিখি। পথে ঘাটে অপরিচিতদের কাছে কোনকালেই এত কিছু বলি না কিন্তু কেন জানি না মৌলানাকে বলে ফেললাম। তামিল ভদ্রলোকের নাম মিঃ স্বামীনাথন। ভারত সরকারের ডেপুটি সেক্রেটারী। ভাইপোর বিয়ের জন্য মাদ্রাজ যাচ্ছেন। মেয়েটির নাম অজন্তা সেন…

নাম শোনার সঙ্গে সঙ্গেই আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, আপনি বাঙ্গালী!

মেয়েটি হেসে বলল, হ্যাঁ; আপনার 'মেমসাহেব' যে কতবার পড়েছি, তার ঠিকঠিকানা নেই।

—ধন্যবাদ।

মিঃ স্বামীনাথন অজন্তাকে জিজ্ঞেস করলেন, বাংলায় কী বললেন?

অজন্তা বলে, ওর একটা বই আমি অনেকবার পড়েছি।

—ইজ ইট?

—ইয়েস।

মথুরা পার হতে না হতেই কামরার অধিকাংশ যাত্রী অন্যান্য আলো নিবিয়ে দিয়ে শুধু নাইট ল্যাম্প জালিয়ে রেখে শুয়ে পড়লেন। আমরা না ঘুমুলেও পর্দা টেনে আমাদের চার বার্থের খুপরিকে যথাসম্ভব স্বতন্ত্রতার মর্যাদা দিয়েছি। সাড়ে দশটায় আগ্রা পৌঁছতেই মিঃ স্বামীনাথন আর মৌলানা সাহেব আমাদের অনুমতি নিয়ে শোবার জন্য উপরের বার্থে উঠলেন। মিঃ স্বামীনাথন অজন্তার উপরের বার্থে উঠে চাদর বালিশ ঠিকঠাক করতে করতে হেসে আমাদের বললেন, এবার আপনারা প্রাণভরে বাংলায় কথা বলুন।

ওঁর কথায় আমরা দুজনেই হেসে উঠলাম।

অজন্তা বসে থাকলেও আমি পিঠে দুটো বালিশ দিয়ে অর্ধশায়িত হলাম। দশ-পনেরো মিনিট টুকটাক মামুলি কথাবার্তা বলার পর সিগারেট খাবার জন্য বাইরে গেলাম। ভিতরে সিগারেট খাওয়া যাবে না। তাই একটা সিগারেট শেষ করার কিছুক্ষণ পরে আবার একটা ধরালাম। সিগারেট খাওয়া শেষ করে কামরায় ফিরে এসে দেখি, শোবার উদ্যোগ আয়োজন সম্পূর্ণ করলেও অজন্তা তখনও বসে আছে।

অমি কিছু বলার আগেই অজন্তা আমাকে জিজ্ঞেস করল, সিগারেট নাকি চুরুট খেয়ে এলেন?

—চুরুট আমি খাই না……

-- এতক্ষণ ধরে সিগারেট?

- এখানে তো খেতে পারব না, তাই দুটো সিগারেট খেয়ে এলাম।

—পর পর দুটো?

—মাঝখানে পাঁচ মিনিটের ইণ্টারভ্যাল।

অজন্তা হেসে বলল, খুব ভাল করেছেন।

আমিও হাসি। বলি, কেন? আপনি বুঝি সিগারেট খাওয়া পছন্দ করেন না।

না, না, আমার পছন্দ-অপচ্ছন্দের কথা বলছি না; তবে বেশি সিগারেট খাওয়া তো ভাল না।

আমি অর্ধশায়িত অবস্থায় কাত হয়ে ওর দিকে ফিরে বলি, জানি।

—জানেন?

—নিশ্চয়ই জানি।

—তবুও কেন এত সিগারেট খান ?

—ভাল লাগে।

—ভাল লাগে বলেই নিজের শরীরের ক্ষতি করতে হবে ?

—না, তা নয়, তবে অনেক ভাল লাগাই তো করতে পারি নি, করতে পারব না, তাই এই ভাললাগাটুকুকে ছাড়তে পারি না, চাই না।

— শুধু আপনি কেন, সবাইকেই অনেক ভাল লাগা ছাড়তে হয়।

— সে তো বটেই।

ট্রেন ছুটছে। স্বামীনাথন আর মৌলানা সাহেব অঘোরে ঘুমোচ্ছেন। ওপাশ থেকে একটা বাচ্চার কান্না ভেসে এল।

এবার আমি অজন্তাকে প্রশ্ন করি, ঘুমুবেন না ?

—কেন ? আপনার ঘুম পাচ্ছে ?

আমি হেসে বললাম, হাসপাতালের ডাক্তার-নার্সদের মত আমাদেরও রাত জাগার অভ্যাস আছে।

—আপনি কী বরাবরই জার্নালিজম করছেন ? নাকি আগে অন্য কোন কাজ করতেন ?

—আমি খবরের কাগজের কাজ ছাড়া আর কোন কাজ করি নি। অন্য কোন কাজের কথা আমি ভাবতেও পারি না।

—আপনি সত্যি ব্যতিক্রম।

—কেন ?

—আমরা যা হতে চাই, তা কী হতে পারি ? অজন্তা একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, কখনই হতে পারি না।

আমার একটু খটকা লাগলেও কৌতূহল চাপা রাখি। কোন প্রশ্ন করি না। চুপ করে থাকি। অজন্তার দিকে তাকিয়েই দৃষ্টি নামিয়ে নিই। বুঝতে পারি, ও মনে মনে কি যেন বলছে।

বেশ কয়েক মিনিট এইভাবেই নীরবতার মধ্যে কেটে গেল। তারপর হঠাৎ অজন্তা প্রশ্ন করে, বলতে পারেন মানুষ কেন মানুষকে ঠকায় ? প্রতারিত করে ? বিশ্বাসঘাতকতা করে ? একজনকে দুঃখ দিয়ে কি সুখী হওয়া যায় ?

দমকা ঝড়ো বাতাসের মত ওর প্রশ্নগুলো শুনে আমি চমকে উঠি। অবাকও হই। স্পষ্ট বুঝতে পারি, অজন্তার মনের মধ্যে একটা অসহ্য ব্যথা-বেদনা, দুঃখের জ্বালা লুকিয়ে আছে। আমি জোর করে একটু হেসে বললাম, আমি তো দূরের

কথা, বোধহয় সক্রেটিসও আপনার সব প্রশ্নের জবাব দিতে পারতেন না।

— না, না, আপনি এড়িয়ে যাচ্ছেন।

—না ভাই, এড়িয়ে যাচ্ছি না। এসব প্রশ্নের সদুত্তর দেওয়া খুবই কঠিন।

তারপর বললাম, ওসব কথা মনে করে শুধু শুধু মনকে কষ্ট দিয়ে আরো দুঃখ পেতে হয়। ওসব ভুলে যাওয়াই ভাল।

— অনেক কিছু ভুলে গেলেও সব-কিছু তো ভুলে যাওয়া যায় না।

— তা ঠিক।

হঠাৎ গাড়ী থামল। সঙ্গে সঙ্গে নানা মানুষের কলকোলাহল। জানলার পর্দা সরিয়ে বাইরেব দিকে তাকাতেই বুঝলাম, ট্রেন ঝান্সি স্টেশনে দাঁড়িয়ে। ঘড়িতে দেখি পৌনে দুটো।

আমি বললাম, এবার শুয়ে পড়ুন। দুটো বাজে।

- তাই নাকি?

—হ্যাঁ।

— ছি, ছি, আপনাকে অনেক বাত পর্যন্ত জাগিয়ে বাখলাম।

— না, না, তাতে কিছু না।

অজন্তা শুয়ে পড়ে বলল গুড নাইট!

—গুড নাইট।

নানা লোকজনের কথাবার্তায ঘুম ভাঙ্গতেই দেখি, অজন্তা শুয়ে নেই। স্বামী-নাথন বসে আছেন নীচেব বার্থে। মৌলানা সাহেব শুয়েও নেই, কোথাও বসেও নেই। ট্রেন ভূপাল স্টেশনে দাঁড়িয়ে।

চা আর কফি এল তিনজনেব জন্য। অজন্তা বাথরুম থেকে ঘুবে এল। জানলা দিযে দেখলাম, মৌলানা সাহেব প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে কয়েকজনের সঙ্গে কথা বলছেন। আমি বাথরুম থেকে ঘুবে আসতে না আসতেই ট্রেন ছেড়ে দিল। মৌলানা সাহেবকে কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই উনি এক গাল হাসি হেসে বললেন, এই এখুনি আমার এক শালার কাছে খবর পেলাম, ভেলোর হাসপাতালেব ডাক্তাররা আমার সব রিপোর্ট দেখে বলেছেন, কোন অপারেশন করতে হবে না। মাস দুই ঔষধ খেলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

আমরা তিনজনেই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলি।

মৌলানা সাহেব বললেন, আমার ছোট ভাই নাগপুরে থাকে। ও নিজে সব রিপোর্ট নিয়ে ভেলোর গিয়েছিল। আজ আমি নাগপুরে নেমে যাব; তারপর

দু-তিন দিন পর ওর সঙ্গেই ভেলোর যাব।

আমরা আরো খুশি হই।

ইতিমধ্যে প্যান্ট্রিকারের বেয়ারা ব্রেকফাস্টের অর্ডার নিতে এল। আমরা কিছু বলার আগেই মৌলানা ওকে টিফিন কেরিয়ার দেখিয়ে বললেন, সবার ব্রেকফাস্ট এতে আছে। তুমি শুধু চা-কফি দিও।

মৌলানা সাহেবের কৃপায় কোথা দিয়ে যে সময়টা কেটে গেল, তা কেউই বুঝতে পারলাম না। একটা সওয়া একটা নাগাদ ট্রেন নাগপুর পৌঁছল। মৌলানা সাহেব নেমে গেলেন কিন্তু ওঁর জায়গায় কোন নতুন যাত্রী এলেন না।

আগেই সবার খাওয়া-দাওয়া হয়ে গিয়েছিল। তাই নাগপুর ছাড়তেই স্বামীনাথন শুয়ে পড়লেন। আমি শুয়ে শুয়ে পত্র-পত্রিকা পড়ছিলাম। অজন্তা আমার কাছ থেকে দু-একটা বাংলা পত্র-পত্রিকা নিয়ে পাতা ওল্টাচ্ছিল। আমি যে কখন ঘুমিয়ে পড়েছি, তা টের পাই নি।

ঘুম ভাঙ্গতে দেখি, সন্ধ্যে হয়ে গেছে। স্বামীনাথন নিজের বার্থে শুয়ে শুয়ে বই পড়ছেন। আমার ওপরের বার্থেও একজন শুয়ে আছেন। অজন্তা একটা পত্রিকা পড়তে পড়তে আমার দিকে তাকিয়ে একটু হাসল। বললাম, খুব ঘুমিয়েছি।

—ঘুমোবেনই তো! কাল রাত্রে তো বিশেষ ঘুম হয় নি।

—আপনি ঘুমোন নি?

—হ্যাঁ, ঘণ্টা দেড়েক ঘুমিয়েছি।

ট্রেন ছুটছে, থামছে, ছুটছে। কখনও আমি আর অজন্তা কথা বলছি, কখনও পত্র-পত্রিকা পড়ছি। মাঝে মাঝে বাইরে গিয়ে সিগারেট খেয়ে আসছি। এল কাজিপেট। রাত্রের খাওয়া-দাওয়া হয়ে গেল। দুজনেই প্ল্যাটফর্মে নেমে একটু ঘোরাঘুরি করলাম।

ঐ কাজিপেট স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে পায়চারি করতে করতেই অজন্তা একটু হেসে বলল, কোনদিন স্বপ্নেও ভাবি নি বীরভূমের বাইরে কোথাও যাব; আর আজ?

—আপনি বুঝি বীরভূমের মেয়ে?

—হ্যাঁ। অজন্তা একটু থমকে দাঁড়িয়ে বলল, আমি আগে এত ঘরকুনো ছিলাম যে, মার সঙ্গে মামাবাড়ি পর্যন্ত যেতে চাইতাম না।

আমি হেসে বললাম, হ্যাঁ, অনেকে এরকম হয়।

ওর ঠোঁটের কোণায় ব্যঙ্গের হাসি। বোধহয় নিজেকেই নিজে ব্যঙ্গ করে।

বলে, এককালে ঘরকুনো ছিলাম বলে এখন এমন ছিটকে পড়েছি যে, আবার কবে বীরভূম যাব, তা জানি নে।

—কেন ? এত ঘোরাঘুরি করছেন আর বীরভূম যেতে পারবেন না ?

—না ; আর বীরভূম যাবার ইচ্ছেও নেই।

—নিজের দেশে যেতেও ইচ্ছে করে না ?

—বীরভূম তো শুধু আমার দেশ না, আরো অনেকের।

আমি হেসে বললাম, আপনার মনের মধ্যে অনেক অভিমান জমে আছে, তাই না ?

অজন্তা আবার থমকে দাঁড়িয়ে আমার দিকে সোজাসুজি তাকিয়ে বলল, না দাদা, শুধু অভিমান নয়, অনেক দুঃখ, অনেক অপমান, অনেক জ্বালাও মনের মধ্যে জমা আছে।

সাড়ে নটা নাগাদ কাজিপেট থেকে ট্রেন ছাড়তেই অধিকাংশ যাত্রী শুয়ে পড়লেন। স্বামীনাথনও একটু কথাবার্তা বলেই শুয়ে পড়লেন। আমার ওপরের বার্থের যাত্রী কাজিপেটে নেমে গেছেন। নতুন যাত্রী যিনি এসেছেন তিনিও বিছানা বিছিয়ে শুয়েছেন।

ওদের নিদ্রার ব্যাঘাত না হয়, সেজন্য বড় আলো জ্বলছে না ; ছোট্ট নীল আলো জ্বলছে। আমি পিঠে বালিশ দিয়ে বসে আছি। ভাবছি নানা কথা। বোধহয় অজন্তার কথাও ভাবছি।

হঠাৎ অজন্তা বলল, শুনবেন দাদা, কেন বীরভূম যেতে চাই না ?

নিজের মনের মধ্যেই অনেক দুঃখের কথা জমা আছে। কাজকর্ম দায়িত্ব-কর্তব্যের মাঝখানে সামান্য একটু অবসর পেলেই সে দুঃখের ইতিহাস চোখের সামনে ভেসে ওঠে। লোকালয়ের দূরে, আত্মীয়-পরিজনদের আড়ালে নিঃসঙ্গ থাকলেই দুটো চোখের দৃষ্টিই ঝাপসা হয়ে ওঠে। বুকের মধ্যে জ্বালা করে। সারা রাত ঘুমুতে পারি না। মনে মনে ভাবি, নিজের দুঃখের কথা যখন নিজেই কাউকে বলতে পারি না, তখন অন্যের দুঃখের কথাই বা শুনি কেন ? কী প্রয়োজন ?

বললাম. আমাকে বলে কী লাভ ? আমি তো আপনার দুঃখ ঘোচাতে পারব না।

—লাভ নেই, তা আমি জানি ; তবে আপনাকে বলে হয়ত মনটা একটু হাল্কা হতো, হয়ত একটু ভাল লাগত।

—যদি আপনার ভাল লাগে তাহলে বলুন।

পাশাপাশি না হলেও খুবই কাছাকাছি দুটো বাড়ী। দুটি পরিবারের মধ্যে খুবই সদ্‌ভাব। বিশেষ করে কমলবাবুর সঙ্গে চণ্ডীবাবুর। খুবই বন্ধুত্ব। খেলাধূলা গল্পগুজব সবই একসঙ্গে। তবে আরো বেশি ভাব দুজনের স্ত্রীর। এমন বন্ধুত্ব প্রায় চোখেই পড়ে না।

কমলবাবুরা তিন ভাই। যৌথ পরিবার। কিছু জমিজমাও আছে গ্রামের দিকে। তবে যে বাড়িতে ওঁরা বাস করেন, সেটা পৈতৃক বাড়ী না, কমলবাবুর দাদার। ওকালতি করে প্রচুর আয় করেন। আয় দিয়ে বিরাট দোতলা বাড়ী, গ্রামের জমিজমা করা ছাড়াও সংসারের বারো আনা দারিদ্র বহন করেন। কমলবাবু বি-এ পাশ করে স্কুল মাস্টারী করেন, কিন্তু হাঁপানির জন্য মাঝে মাঝেই স্কুল যেতে পারেন না। ওঁদের ছোটভাই কলকাতায় রেলের অফিসে চাকরি করলেও তাঁর পরিবার এখানেই থাকেন। উনি মাঝে মাঝে আসা-যাওয়া করেন।

চণ্ডীবাবু গ্রাজুয়েট না হলেও পি-ডবলিউ-ডি'তে ভাল চাকরি করেন। মাস মাইনে ছাড়াও কিছু আয় আছে। বোন তিনজন থাকলেও আর কোন ভাই নেই। তাই বন্ধু ও প্রতিবেশী কমলবাবুকে উনি ভাইয়ের মতই ভালবাসেন।

দিনগুলো বেশ কেটে যায়। দেখতে দেখতে চণ্ডীবাবুর ছেলে খোকন চার বছরের হল। কমলবাবুর দুটিই মেয়ে। তাই এ বাড়িতে খোকনের বড় আদর। চণ্ডীবাবুর স্ত্রী পারুল মাঝে মাঝে কমলবাবুর স্ত্রীকে বলেন, এ ছেলেটাকে তুমিই নিয়ে নাও।

কমলবাবুর স্ত্রী ঊষা হেসে বলেন, মেয়ে দুটোই যে বড়! একটা মেয়ে যদি খোকনের চাইতে একদিনেরও ছোট হতো, তাহলে এ ছেলেকে সত্যি আমি রেখে দিতাম।

একটা বছর ঘুরতে না ঘুরতেই ঊষার আরো একটি মেয়ে হয়। স্বামী-স্ত্রী দুজনেই খুব আশা করেছিলেন ছেলে হবে। আশাহত হলেন দু'জনেই। তবে ঊষা চণ্ডীবাবুর স্ত্রীকে বললেন, পারুলদি, আর যাই হোক, খোকনকে আর তুমি পাচ্ছ না।

পারুল হেসে বললেন, তোমার ভাসুর কি বলেছেন জানো?

—কী?

—বলেছেন, তোমার এই মেয়েটার সঙ্গেই খোকনের বিয়ে দেবেন।

—সত্যি ?

—তবে কি আমি মিথ্যে বলব ?

অজন্তা একটু থামে, একটু হাসে। তারপর বলে, খোকনদাকে বরাবরই আমার ভাল লাগত কিন্তু একটু বড় হবার পর যখন জানতে পারলাম, ওর সঙ্গেই আমার বিয়ে হবে, তখন থেকে ওকে আরো অনেক বেশি ভাল লাগত।

রাত্রির অন্ধকার ভেদ করে ছুটছে আমাদের এয়ার-কণ্ডিসণ্ড এক্সপ্রেস ; পাড়ি দিচ্ছে দাক্ষিণাত্যের মধ্যপ্রদেশ অন্ধ্র। আমি চুপ করে অজন্তার কথা শুনি।

অজন্তা একবার আমার দিকে তাকিয়েই চোখ নামিয়ে নেয়। বলে, ভাল লাগার মতই ছেলে খোকনদা। যেমন দেখতে তেমন পড়াশুনায়।

ট্রেনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে অজন্তার কাহিনী এগিয়ে চলে। চণ্ডীবাবু পি-ডবলিউ-ডি'র চাকরি ছেড়ে কন্‌ট্রাক্টরী করার জন্য কলকাতা চলে গেলেন। এদিকে অজন্তার বছর তিনেক বয়সে যে ভাই হয়েছে, সেও বেশ বড় হয়েছে। কমলবাবুর বড় মেয়ের বিয়ে হল বেশ ভালভাবেই। বড় জ্যেঠুর বড় আদরের মেয়ে বলে কমলবাবুর বড ভাই দু'হাতে খরচ করলেন। অত খরচ করায় কোন ছেলেরই মত ছিল না কিন্তু বাধা দেবার সাহস কারুর হয় নি। দ্বিতীয় মেয়ের বিয়ের ঠিক ক'মাস আগেই কমলবাবুর দাদা মারা গেলেন। ভাইপোরা বলল, মা দু-এক ভরি গহনা আর আমার খাওয়া-দাওয়ার জন্য জমির চাল-ডাল দিতে পারি। এর বেশি কিছু সম্ভব নয়।

চণ্ডীবাবু স্বেচ্ছায় দু হাজার দিলেন কিন্তু তাতেও কি মেয়ের বিয়ে হয় ? স্কুলের সেক্রেটারী বললেন, স্কুলের আর্থিক অবস্থা এমন নয় যে, হাজার খানেকের বেশি লোন দিতে পারি।

কমলবাবু বললেন, তাতে তো আমার কিছুই হবে না।

সেক্রেটারী বললেন, একটা রাস্তা আছে।

—কী ?

উনি আমতা আমতা করে বললেন, আপনি আজকাল হাঁপানিতে এতই কষ্ট পান যে প্রায়ই কামাই করেন। এ রোগ তো চট করে সারার নয়। এদিকে ছেলেদের বড়ই ক্ষতি হচ্ছে।...

—আমাকে কী করতে বলছেন ?

—আপনি বরং চাকরিটা ছেড়ে দিন।......

— ছেড়ে দেব ?

—হ্যাঁ। একসঙ্গে বেশ কিছু টাকা পাবেন। ঐ টাকা দিয়ে মেয়ের বিয়ে দিন। তারপর আমাদের ওখানেই পার্টটাইম কাজ করুন।

অজন্তা আবার একটু থামে। বলে, মেজদির বিয়ে দেবার জন্য বাবাকে চাকরিটা ছাড়তে হল।

— তারপর ? এবার আমি প্রশ্ন করি।

অজন্তা হেসে বলল, তারপর আমাদের বাড়ীও ছাড়তে হল। বড় জ্যেঠুর বাড়ী ছেড়ে আমরা ভাড়া-বাড়ীতে উঠে গেলাম।

এরই মধ্যে স্কুলের ছুটি হলেই চণ্ডীবাবুর স্ত্রী অজন্তাকে কলকাতায় নিজের কাছে নিয়ে যান। সংসারের টুকটাক কাজকর্ম শেখান, গল্প-গুজব করেন, সঙ্গে নিয়ে বেড়াতে যান। আরো কত কি। অজন্তার সব জামা-কাপড়ই উনি কিনে দেন। ওরই মাঝে খোকনদার সঙ্গে গল্প-গুজব হাসি-ঠাট্টা হয়।

তারপর একদিন খোকন মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হল। অজন্তাও তখন শিশু নয়। শাড়ি পরে। দেহে অনাগত যৌবনের ইঙ্গিত সর্বত্র।

চণ্ডীবাবু নিজের বাড়ী তৈরীর তদারকি করতে গেছেন। ওঁর স্ত্রী পূজায় বসেছেন। এই অবসরে খোকন হঠাৎ অজন্তার হাত ধরে নিজের ঘরে টেনে নিয়ে জড়িয়ে ধরল।

—ছি, ছি, একি করছ ?

— কী আবার করব ? নিজের স্ত্রীকে একটু আদর করব না ?

অজন্তার দেহ-মনের মধ্যে একটা নতুন উন্মাদনার ঢেউ বয়ে যায়। মন ভরে যায় খোকনদার কথা শুনে। খুশিতে মুখে কোন কথা আসে না।

খোকন বলে, আমি মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হলাম, তুমি খুশি তো ?

লজ্জায় অজন্তা মুখ তুলে তাকাতে পারে না। শুধু মাথা নেড়ে বলে, হ্যাঁ।।

সময় এগিয়ে চলে। ঘুরে যায় বছর। কয়েকটি বছর।

তারপর অজন্তা হায়ার সেকেণ্ডারী পাশ করতেই চণ্ডীবাবু কমলবাবুকে লিখলেন, মা অজন্তাকে আমরা বেথুনে পড়াতে চাই। সব দায়িত্ব আমাদের। তোমার কোন চিন্তা নেই। শুধু তোমার সম্মতি চাই।

সংসারের অবস্থা এমনই সঙ্গীন যে, একটা মেয়ের খরচ কমবে ভেবে যেন কমলবাবু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন। ফেরত ডাকেই জবাব দিলেন, তোমাদের মেয়েকে তোমরা পড়াবে, তাতে আমাদের কী আপত্তি থাকবে ?

চণ্ডীবাবু সঙ্গে সঙ্গে আবার চিঠি লেখেন, মা অজন্তাকে এই ভাড়াটে বাড়ীতে

আনব না। যে বাড়ীতে মা সারাজীবন কাটাবে, সে বাড়ী তৈরী হতে আর দেরী নেই। আগামী সাতই গৃহ প্রবেশের দিন ঠিক করেছি। ঐদিনই মা অজন্তাকে আনবার ব্যবস্থা করছি।

ট্রেন বিজয়ওয়াদা এসে গেল।

অজন্তা হেসে বলল, বিশ্বাস করুন দাদা, ও বাড়ীর সবকিছুই আমার ইচ্ছা ও মত অনুযায়ী হতো। বাড়ীর ফার্ণিচার, জানলা-দরজার পর্দা, বেডকভার সবকিছু আমার পছন্দ মত কেনা হল। জ্যেঠু আর বড়মা সব সময় বলতেন, এ তোমার বাড়ী। তাই তোমার মত সাজিয়ে নাও।

একবার মনে হল প্ল্যাটফর্মে নেমে কফি খাই কিন্তু অজন্তা এমন আত্মমগ্ন হয়ে নিজের কথা বলছিল যে, আমি উঠতে পারলাম না। চুপ করে বসে রইলাম।

অজন্তা বলল, জ্যেঠু আর বড়মার মত খোকনদাও আমার মত না নিয়ে কোন কাজ করত না। ও যে আমাকে কি ভালবাসত তা আপনাকে বলে বোঝাতে পারব না।

সূর্য ওঠে, আবার ডুবে যায়। পৃথিবী আপন গতিতে ঘুরে চলে।

খোকন ডাক্তারী পাশ করল বেশ ভালভাবেই। তারপর বিলেত পাড়ি দিল এম-আর-সি-পি পড়তে। দেখতে দেখতে সময় কেটে যাবে। ফিরে এলেই বিয়ে। অজন্তা স্বপ্ন দেখে সেদিনের। দেখতে দেখতে সত্যি অনেকগুলো দিন কেটে গেল। তিলে তিলে গড়ে তোলে নিজেকে। খুব মন দিয়ে পড়াশুনা করে; সামনেই ইউনিভার্সিটির পরীক্ষা। তবুও মন বিক্ষিপ্ত হয় খবরের কাগজ পড়লেই। মারামারি কাটাকাটি। বীরভূমেও বেশ গণ্ডগোল। উতলা মনকে শান্ত করে আবার মন দিয়ে পড়াশুনা করে।

পরীক্ষা শেষ হবার দিন কয়েক পরে বীরভূম ফিরে গিয়েই অজন্তা চমকে ওঠে। বাবার হাঁপানির কষ্ট চোখে দেখা যায় না। সারা রাত পিঠে বালিশ দিয়ে বসে থাকেন। মার শরীরও খুব খারাপ। বাবার এক পয়সা আয় নেই। জমির ধানে বাড়ীর তিনটি প্রাণীর দুবেলা দুমুঠো হয়ে গেলেও বাকি সবকিছু সামলাতে হয় দুই দিদির দুটি মণি অর্ডারের পঞ্চাশ টাকা দিয়ে। ও টাকা দিয়ে ডাল-তেল-নুন কিনলে পরনের কাপড় বা বাবার ওষুধ হয় না। ছোট ভাই তপু যে কি করে, তা শুধু ভগবানই জানেন। বহুদিন স্কুল যাওয়া ছেড়ে দিয়েছে। সারাদিন কোথায় টো টো করে বেড়ায়। রোজ রাত্রে বাড়ীও ফেরে না; ফিরলেও অনেক রাত্রে ফিরে কাক ডাকার আগেই চলে যায়।

অজন্তা দু একদিন লুকিয়ে লুকিয়ে চোখের জল ফেলল। তারপর উঠে দাঁড়াল। দশ টাকার দুটো টিউশানি দিয়ে শুরু করল। মনে মনে ভাবে, খোকনদা ফিরে এলে বাবা-মাকে মাসে মাসে দু-তিনশো টাকা দেওয়া ওর পক্ষে একটুও কষ্টের হবে না। ঐ ছোট্ট বাচ্চাটাকে পড়াতে পড়াতেই খোকনদার কথা ভাবতে ভাবতে আনমনা হয়ে যায় অজন্তা। কয়েক মাস ঠিকমত চিঠিপত্র বিশেষ আসছে না। শরীর ভাল আছে তো? না, না, পড়াশুনা নিয়ে ব্যস্ত। এম-আর-সি-পি পড়া কী সহজ ব্যাপার?

দেখতে দেখতে বদলে গেল ঋতু; নির্মম রুক্ষতা গ্রাস করল সমস্ত সবুজ শ্যামল প্রান্তর। অজন্তা পাগলের মত কেঁদে উঠল, না, না, এ হতে পারে না। অসম্ভব। খোকনদা কিছুতেই আর কাউকে বিয়ে করতে পারে না। না, না, আমার খোকনদা আমাকে এভাবে দুঃখ দিতে পারে না।

দুঃসংবাদ কখনও মিথ্যা হয় না। অজন্তা ছুটে গেল কলকাতা। জ্যেঠু বোবা হয়ে বসে আছেন নিজের ঘরে। বড়মা পূজার ঘরে কাঁদতে কাঁদতে প্রায় বেহুঁশ হয়ে পড়ে আছেন।

— জানেন দাদা, এর পর আমি আর ও বাড়ীতে যাই নি, যেতে পারি নি।

আমি কী প্রশ্ন করব? শূন্য দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে থাকি।

গাড়ীর সমস্ত যাত্রীরা অকাতরে ঘুমুচ্ছেন। শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কামরার মধ্যে বসে বুঝতে পারছি না গাড়ীর গতি কিন্তু অনুমান করতে কষ্ট হচ্ছে না।

হঠাৎ অজন্তা একটু হেসে বলল, কী হলো দাদা। শুনলেন সব?

—হ্যাঁ।

—কিন্তু আমার কাহিনী শেষ হয় নি। দুঃখের কাহিনী কী এত তাড়াতাড়ি শেষ হয়?

আমি আবার চুপ।

অজন্তা আবার বলে যায়, বীরভূমের বাড়ীতে হঠাৎ একদিন শেষ রাত্তিরে দু-তিনটে ছেলে এসে খবর দিল, নকশাল-পুলিশের লড়াইয়ের সময় আমার ছোট ভাই দারুণভাবে আহত। দুদিন আগে পুলিশ ওকে কলকাতার মেডিক্যাল কলেজে নিয়ে গেছে।

শুনেই আমার মন খারাপ হয়।

অজন্তা ছুটল কলকাতায়। সম্বল একখানা দশ টাকার নোট আর সামান্য কিছু খুচরো পয়সা। এছাড়া বড়মার দেওয়া হাতের চারগাছা সোনার চুড়ি।

হাসপাতালে পৌঁছে দেখল, ছোট ভাই অজ্ঞান অচৈতন্য। শরীরের অর্ধেক ব্যাণ্ডেজে মোড়া। বিছানার দু-পাশে পুলিশ পাহারা। পরের দিন ডাক্তার বললেন, অপারেশন করতেই হবে। ওকে ডাঃ রায় কাল নিজে দেখে ঠিক করবেন, কাল না পরশু অপারেশন করবেন। ইতিমধ্যে আপনি রক্তের ব্যবস্থা করুন, অনেক রক্ত লাগবে।

রক্ত! কোথায় পাওয়া যায় রক্ত? রক্তের সন্ধান পেতে কষ্ট হল না কিন্তু টাকা চাই। অনেক টাকা। বোধহয় সাত-আটশো, হাজারও লাগতে পারে। কোথায় পাবে সে টাকা? না, এ পৃথিবীতে কেউ নেই যে ওকে এই বিপদের দিনে সাহায্য করতে পারে। তবে কী ওর ভাই বাঁচবে না? ওর একমাত্র ভাইকে ও বাঁচাতে পারবে না?

কাঁদতে কাঁদতে অজন্তা ফিরে আসে হাসপাতালে।

পরের দিন সকালে একদল ডাক্তার ঘরে ঢুকতে যাবার মুখেই একজন ডাক্তার অজন্তাকে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে আরেকজন ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করলেন, এই মেয়েটি এখানে এভাবে কাঁদছে কেন?

- স্যার, ঐ পেসান্টের বোন। আজ কদিন ধরেই মেয়েটি এখানে এইভাবে বসে বসে কাঁদছে।

এবার ঐ বড় ডাক্তার অজন্তার হাত ধরে দাঁড় করিয়ে বললেন, কাঁদছ কেন? কাঁদলে কী তোমার ভাই ভাল হয়ে যাবে?

অজন্তা আরো জোরে কেঁদে ওঠে। কাঁদতে কাঁদতে চিৎকার করে বলে, ডাক্তারবাবু, আমার যে টাকা নেই, আমি যে রক্ত কিনতে পারি নি, আমার ভাইকে কী আপনি বাঁচাবেন না? আমার তো আর কোন ভাই নেই ডাক্তারবাবু!

শুনতে শুনতে আমার চোখে জল এল। বোধহয় অজন্তারও। তবু ও হাসল। বলল, ঐ ডাক্তারবাবু আমাকে ওঁর বাড়ীতে নিয়ে গেলেন। স্নান করলাম, ওঁর মেয়ের শাড়ি-ব্লাউজ-সায়া পরতে দিলেন, খেলাম। খেয়েই ঘুম। ঐ ডাক্তার-বাবুই রক্তের ব্যবস্থা করলেন, অপারেশন করলেন। আমার ভাই বেঁচে উঠল।

এবার আমি প্রশ্ন করি, তারপর?

অজন্তা একটু জোরেই হাসে। বলে, তারপর আর কী? মনে মনে ঠিক করলাম টাকা আমার চাই। অনেক টাকা। হাজার হাজার টাকা। এখন

সেই হাজার হাজার টাকাই আয় করছি।

— চাকরি করেন ?

—না, না, চাকরি করে কেউ তিন-চার-পাঁচ হাজার আয় করে ? আমি মডেলিং করি।

—আপনি মডেল ?

—হ্যাঁ। অজন্তার ঠোঁটের কোণায় একটু হাসি। বলে, রূপ আছে, যৌবন আছে। এই পুঁজি সামান্য একটু খরচ করেই বেশ আয় হচ্ছে। এই পুঁজির সবটুকু তো খরচ করতে পারব না। ও তো শুধু খোকনদার জন্য রেখেছিলাম, এই পৃথিবীর আর কোন পুরুষকে আমি তা দিতে পারব না।

আমি বললাম, শবরীর প্রতীক্ষা ব্যর্থ হতে পারে না। আপনি আপনার খোকনদাকে নিশ্চয়ই পাবেন।

—পাব ?

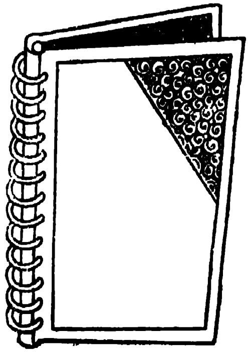
আমি শাহীর লুধিয়ানভীর একটা শের আবৃত্তি করি—

রাত যিতনী ভী সংগীন হোগী
সুবহ উৎনি হী রংগীন হোগী
গম্ না কর গর হ্যায় বাদল ঘনেরা
কিসকে রোকে রুকা হ্যায় সবেরা।

একটু থেমে বলি, রাত যত নির্মম, যত কঠিন হবে, প্রভাত তত রঙীন হবে। চারদিক থেকে ঘন কালো মেঘ এলেও ভয়ের কিছু নেই। সকালকে কেউ আটকে রাখতে পারে না। ভোর হবেই হবে।

অজন্তা আমার দুটি হাত জড়িয়ে ধরে বলল, আপনি বলছেন দাদা ?

—হ্যাঁ, বলছি, ভোর হবেই।



দিদি

এককালে কলকাতায় এমনই দুঃখ-দুর্দশার মধ্যে দিন কাটিয়েছি যে, শিবপুরের বোটানিক্যাল গার্ডেন বা বেলুড় মঠ-দক্ষিণেশ্বরে যাবারও সুযোগ পেতাম না। তখন আমার কাছে এ বিশ্ব সংসারের সীমারেখা ছিল টালা থেকে টালিগঞ্জ।

তখন এই সীমারেখার বাইরের দুনিয়া সম্পর্কে কত অজানা ভয়-ভীতি ও সংকোচ ছিল। দ্বিধা ছিল অপরিচিত মানুষ সম্পর্কে। তারপর? হঠাৎ যেন এক রাজকন্যা সোনার কাঠি ছোঁয়াতেই আমার নবজন্ম হলো। আর সেই নবজন্মের সঙ্গে সঙ্গে এই সীমাহীন বিশ্ব সংসারের কত বন্ধ দরজা খুলে গেল। অন্ধকারের বিভীষিকাময় জগৎ হঠাৎ সোনালী আলোয় ঝলমল করে উঠল আমার চোখের সামনে। কত অজানা অপরিচিত মানুষ আমার আপনজন হলেন।

কাজকর্ম, দায়-দায়িত্ব ও সমাজ সংসারের শত বন্ধনের মধ্যে দিন কাটালেও দূরের আকাশ আর অজানা পথ মাঝে মাঝেই আমাকে যেন হাতছানি দিয়ে ডাকে। আমি আর কিছুতেই ঘরের মধ্যে বন্দী থাকতে পারি না। কাছের মানুষ, পরিচিত পরিবেশ ঝাপসা হয়ে ওঠে। আমি বেরিয়ে পড়ি। কখনও কাছে, কখনও দূরে, কখনও কাজে, কখনও অকাজে। হয়ত বা অকারণেও। আমি উদাসী বাউলের মত আপন মনের একতারা বাজাতে বাজাতে ঘুরে বেড়াই এখানে-ওখানে।

ভেবেছিলাম, ডেরাডুন শহরের সীমান্তে রাজপুর রোডের ঐ ভাঙ্গা বাড়িটার বারান্দায় বসে দিন সাতেক শিবালিক পাহাড় দেখব, কিন্তু না, দু'দিন পরেই মনের একতারায় নতুন সুর বেজে উঠল। ভোর হতে না হতেই রওনা হলাম বাস স্ট্যাণ্ড। চড়লাম হরিদ্বারের বাসে।

দশভুজা ছেলেমেয়েদের নিয়ে ক'দিন বাপের বাড়ি কাটিয়ে আবার স্বামীর ঘরে ফিরে গেলেও, হরিদ্বারে তখনও পূজার মরশুম। মনে মনে ঠিক করেছিলাম, রোমে গিয়ে রোমান হবো। তাই অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ জেনেও হাজির হলাম ধর্মশালায়।

অফিস ঘরে ঢুকে কোন ভূমিকা না করেই একটা চেয়ার টেনে বসলাম। পকেট থেকে সিগারেট বের করে অফিস ঘরের অধিকর্তাকে একটা দিয়ে নিজেও একটা ধরালাম। দু'জনেই পর পর কয়েকটা টান দিলাম। তারপরও আমি কোন কথা বললাম না। ধর্মশালার ম্যানেজারবাবুই আমার মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন, একলা? নাকি সপরিবারে এসেছেন?

—একলা।

—তাহলে তো একটা কামরা হলেই আপনার হবে।

—হ্যাঁ।

ম্যানেজারবাবু সিগারেটে আরো একটা টান দিয়ে প্রশ্ন করলেন, কোথা থেকে আসছেন?

—এখন ডেরাডুন থেকে এলাম।

—কোথায় থাকেন?

—দিল্লী।

—সরকারী নোকরি করেন?

—না, খবরের কাগজের সংবাদদাতা।

ম্যানেজারবাবু সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করে উঠলেন, এ মুনেশ্বর! দুটো চা আন।

চা খেতে খেতে শুরু হলো দ্বিতীয় দৃশ্য। আমি আর আগন্তুক নই; আমি যেন ম্যানেজারবাবুর পরিচিত। হয়ত বা বন্ধু। উনি কথায় কথায় দুঃখ করে বললেন, এবার বাংলাদেশে বন্যা হওয়ায় বাঙালীবাবুরা খুব কম বেড়াতে বেরিয়েছেন। অন্যান্য বছর এ সময় এই ধর্মশালার বারান্দা-উঠানে পর্যন্ত বাঙালী-বাবুরা ফ্যামিলী নিয়ে থাকেন। আর এ বছর? এখনও তিন-চারটে ঘর খালি

পড়ে আছে।

এই কথাবার্তার মধ্যেই ম্যানেজারবাবু মুনেশ্বরকে ডেকে হুকুম দিলেন, চারতলার এক নম্বর ঘরটা খুব ভাল করে পরিষ্কার করে একটা ভাল চারপাই দিয়ে দাও।

আরো কিছুক্ষণ ম্যানেজারবাবুর সঙ্গে গল্পগুজব করার পর আমি মুনেশ্বরের অনুগামী হয়ে চারতলার এক নম্বর ঘরে এলাম। ঘরখানি সত্যি সুন্দর। পেছন দিকে বিরাট বারান্দা। বারান্দার সামনেই গঙ্গা। ঘরে শুয়ে-বসে গঙ্গাকে দেখা না গেলেও প্রতি মুহূর্তে অনুভব করা যায়, তিনি আমার প্রতিবেশিনী। তাঁর চরণপথের নূপুরধ্বনি সত্যি মনকে আনমনা করে। হিমালয়-দুহিতার স্পর্শধন্য বাতাসেও যেন বিচিত্র সৌরভ। শান্তি।

মুনেশ্বরের কৃপায় দোকানের খাবার ঘরে বসেই খেয়ে নিলাম। তারপর পত্রপত্রিকা পডতে পড়তে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি, তা নিজেও টের পাই নি। বিকেলবেলায় ঘুম থেকে উঠেও মুনেশ্বরের কৃপায় ঘরে বসেই চা জুটে গেল। তারপর আর ঘরের মধ্যে নিজেকে বন্দী রাখতে পারলাম না। মন্দিরগুলোর পাশ কাটিয়ে ঘুরে বেড়ালাম গঙ্গার পাড়ে। নতুন পুলটা পার হয়ে ওপারেও গেলাম। একটু আবছা আলোয় বসে রইলাম অনেকক্ষণ। তারপর হঠাৎ যেন ঐ রাতের অন্ধকারেও গঙ্গার জলে প্রতিচ্ছবি দেখি আমার অতীত, বর্তমানের। কত কী ভাবি। আকাশ-পাতাল। এলোপাথাড়ি হয়ে মনে পড়ল আমার অতীত জীবনের কত কাহিনী। কত ছোটখাট সুখ-দুঃখের অনুভূতির তরঙ্গ বয়ে গেল আমার সমস্ত শিরা উপশিরার মধ্যে।

তারপর হঠাৎ যেন সবকিছু বিবর্ণ-বিষণ্ন মনে হলো। সামনেই শরৎ পূর্ণিমা। তবু যেন সারা আকাশে মেঘের ঘনঘটা দেখে চমকে উঠলাম আমি। গঙ্গা-মন্দিরে আরতি চলছিল, কিন্তু আমার কানে কাঁসর-ঘন্টার আওয়াজ পৌঁছাল না। আমি ফিরে এলাম ধর্মশালায়।

ঘর থেকে একটা চেয়ার বের করে বারান্দায় বসে রইলাম। কিছুক্ষণ পরে অন্যান্য ঘরের লোকজনরাও বারান্দায় এসে বসলেন, কিন্তু সেদিন কারুর সঙ্গেই আমার কোন কথাবার্তা হলো না। পরের দিন সকালে দুটি গুজরাতি পরিবার চলে গেলেন, এলেন সাহারাণপুরের এক দম্পতি।

বেলা তখন ন'টা-সাড়ে ন'টা হবে। আমার ঘরে স্বয়ং ম্যানেজারবাবু এসে হাজির। ওঁর পেছন পেছন এক ভদ্রমহিলা এসে দরজার বাইরে দাঁড়ালেন।

আমি কিছু বলার আগেই ম্যানেজারবাবু পেছন ফিরে ভদ্রমহিলাকে বললেন, আসুন দিদি, ভেতরে আসুন। দাদা খুব ভাল মানুষ আছেন।

আমি তাড়াতাড়ি দুটো চেয়ার ওঁদের এগিয়ে দিতেই ভদ্রমহিলা হাতজোড় করে বাংলায় বললেন, নমস্কার।

আমি প্রতি নমস্কার করতে গিয়েই দেখলাম ওঁর ডান হাতে কাপড় জড়ানো।

ওঁরা কেউই বসলেন না। ম্যানেজারবাবু বললেন, দিদি হাতে চোট খেয়েছেন। তাই আপনি যদি ওঁর একটা মণি অর্ডার ফর্ম ভরতি করে দেন, তাহলে খুব ভাল হয়।

আমি হেসে বললাম, এ আর এমন কী কাজ। হাত বাড়িয়ে বললাম, দিন আপনার মণি অর্ডার ফর্ম।

ভদ্রমহিলা বললেন, আচ্ছা আমি ঘর থেকে নিয়ে আসছি।

ম্যানেজারবাবুর কাজ ছিল। উনি চলে গেলেন।

ঐ মণি অর্ডার ফর্ম লিখতে গিয়েই জানলাম, ভদ্রমহিলার নাম ইলা ঘোষ এবং আগ্রার এক হাসপাতালের নার্স। যাকে টাকা পাঠালেন, তিনি মুখার্জী। অর্থাৎ আত্মীয় না। মণি অর্ডার কুপনে লিখলাম, আমি হঠাৎ ছুটি পাওয়ায় কিছুদিনের জন্য হরিদ্বার এসেছি এবং সেজন্যই এ মাসে আপনাকে টাকা পাঠাতে ক'দিন দেরি হলো। আমার হাতে ব্যথা বলে অপর এক ভদ্রলোককে দিয়ে মণি অর্ডার ফর্ম লেখালাম। চিঠি দেবেন। প্রণাম নেবেন।

মণি অর্ডার ফর্ম লেখা শেষ হতেই মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল, ইনি কী আপনার মাস্টারমশাই?

ইলা ঘোষ একটু হেসে বললেন, না। ইনিই আমাকে প্রথম চাকরি দিয়েছিলেন।

এবার আমি হাসি। বলি, তার প্রতিদানে আপনি এখনও ওঁকে নিয়মিত টাকা পাঠাচ্ছেন!

উনি একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, হ্যাঁ, না পাঠালে হয়ত উনি অনাহারেই মারা যাবেন।

—কেন? ওঁর কী কেউ নেই?

—সবাই আছে, কিন্তু ওঁর স্বভাবের জন্য কেউই ওঁকে দেখে না।

ঐ বিষয়ে আমি আর কোন প্রশ্ন করি না। এবার আমরা কিছুক্ষণ এমনি কথাবার্তা বলি। কথায় কথায় উনি বললেন, আজ চার বছর রাণাঘাট যাই না।

ছুটি পেলেই এই হরিদ্বারে চলে আসি।

—রাণাঘাটেই বুঝি আপনাদের বাড়ি ?

—হ্যাঁ।

—বাবা-মা, ভাই-বোন সবাই তো ওখানে ?

—চার বছর আগে বাবা মারা যান। ছোট বোনের বিয়ে হয়ে গেছে। রাণাঘাটের বাড়িতে এখন মা আর দুই ভাই আছে।

—তবুও রাণাঘাট যান না ?

—না ; ভাল লাগে না। ইলা ঘোষ এবার খুব জোরেই একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন, চাকরি করার জন্য লোকজনের সঙ্গে মিশতেই হয় ; নয়ত লোকজনের সঙ্গে মেলামেশা করতে একটুও ইচ্ছা করে না।

— সে কী ?

—হ্যাঁ দাদা, সত্যি বলছি। এবার উনি একটু থেমে বলেন, আমি অত্যন্ত সাধারণ মেয়ে। আপনার মত বিদ্যা-বুদ্ধি বা অভিজ্ঞতা আমার নেই। কিন্তু তবু যেটুকু দেখেছি, তাতেই মানুষ সম্পর্কে আমার কেমন ভয় হয়ে গেছে।

—জীবনে বোধহয় খুব দুঃখ পেয়েছেন, তাই না ?

—শুধু দুঃগ না, আরো অনেক কিছু পেয়েছি।

সেদিন এইভাবে ইলাদির সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ। এর পর থেকে মাঝে মাঝেই উনি তিনতলা থেকে চারতলায় আমার ঘরে এসে বলতেন, কী দাদা, কী করছেন ?

—আসুন, আসুন। কিছু করার জন্য তো এখানে আসি নি। এমনি শুয়ে-বসেই দিন কাটিয়ে দিচ্ছি।

—খেয়েছেন।

—না ; একটু পরে খাব।

—এত বেলায়ও বলছেন, একটু পরে খাবেন।

—মুনেশ্বর একটু পরেই এসে কিছু এনে দেবে।

চেয়ার এগিয়ে দিলেও ইলাদি বসেন না। বলেন, না দাদা, আর একটুও দেরি না। এখুনি চলুন। আপনাকে খাইয়ে আনি।

আমি অনেক চেষ্টা করেও হেরে গেলাম। বাধ্য হয়ে ওঁর সঙ্গে গিয়ে এক হোটেলে ঢুকলাম। খেলাম কিন্তু হাত ধুয়ে এসে বেয়ারার কাছে বিল চাইতেই সে বললো, পয়সা পেয়ে গেছি।

—এ কী দিদি ? আপনি পেমেণ্ট করলেন কেন ?

ইলাদি হেসে বললেন, সে অপরাধের বিচার ধর্মশালায় গিয়ে হবে। এখন চলুন।

পথে যেতে যেতে ধর্মশালায় ফিরে গিয়ে অনেক অনুরোধ-উপরোধ করেও ওঁর হাতে ক'টা টাকা গুঁজে দিতে পারলাম না। শেষে উনি বললেন, আমি যেমন আপনার দিদি, আপনিও তো আমার দাদা। সুতরাং হিসেব-নিকেশ করার জন্য এত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন ?

—ব্যস্ত হবো না ?

—না।

—ঠিক আছে ; আর ব্যস্ত হবো না।

ইলাদি হাসেন।

এবার আমি বললাম, আজ রাত্রে আপনাকে আমি খাওয়াব।

—শুধু আজ রাত্রে কেন, কাল-পরশুও খাওয়াবেন, কিন্তু এভাবে হিসেব মেটাবার চেষ্টা করবেন না।

আমি হেসে বলি, দিদি, আপনি তো দারুণ মেয়ে।

—তা এতক্ষণে বুঝলেন ?

আমরা দুজনেই হাসি।

আমি সাংবাদিক, ইলা ঘোষ নার্স। অপরিচিত মানুষের সঙ্গে আলাপ করতে, পরিচিত হতে কারুরই কোন দ্বিধা নেই। তাই দু'-একদিনের মধ্যেই আমরা অনেক কাছের মানুষ হয়ে গেলাম। সকালে, বিকালে, সন্ধ্যায় আমি আর দিদি কত গল্প করি। ধর্মশালার বারান্দায় বসে গল্প করতে করতে কোন কোনদিন রাত গভীর হয়। কখনও কখনও আমাদের সঙ্গে যোগ দেন ম্যানেজারবাবু। মুনেশ্বর দোকান থেকে খাবার এনে দেয়। আমরা বারান্দায় বসে গল্প করতে করতেই খেয়ে নিই।

এপারে বড় ভিড়। তাই সেদিন আমি আর দিদি হাঁটতে হাঁটতে নতুন পুল পার হয়ে গঙ্গার ওপারে চলে গেলাম। এখানে মানুষের কলকোলাহল অনেক কম। গঙ্গা যেন এখানে অনেক কাছের, অনেক আপন। এপারে বসে মনে হয় ওপারে দীপান্বিতার উৎসব। আকাশে চাঁদের মেলা। এ যেন এক অন্য দুনিয়া।

—জানেন দাদা, এখানে এলে আমার আর ফিরে যেতে ইচ্ছা করে না।

—দিদি, ফিরে তো আমাদের যেতেই হবে তবে পরিচিত মানুষের কলকোলাহল থেকে দূরে পালিয়ে এসে শুধু নিজের সঙ্গে খেলা করতে বেশ লাগে।

—ঠিক বলেছেন দাদা। আমার তো মাঝে মাঝে মনে হয়, এ সংসারে কোন আত্মীয়, বন্ধু, পরিচিত মানুষ না থাকলেই বেশ সুখে থাকতাম।

আমি একটু হেসে বললাম, মানুষের উপর আপনার এত অভিমান কেন?

—অভিমান নয়, রাগ।

আমি আবার হাসি। বলি, সে তো আরো মারাত্মক ব্যাপার।

—দাদা, সব কথা শুনলে আপনি আর হাসবেন না। তখন বলবেন, দিদি, ঠিকই বলছেন।

আমি সঙ্গে সঙ্গে কোন মন্তব্য করি না। চুপ করে থাকি। তবে দিদি চুপ করে থাকেন না। বলেন, আজ নয়, আরেকদিন আপনাকে সব কথা বলব।

—কী দরকার আমাকে সব কথা বলার?

—আপনাকে বলতে পারলে নিজে অনেকটা হাল্কা হবো।

—কিন্তু দিদি, আমি যদি আপনার কোন ক্ষতি করি।

দিদি একটু জোরই হেসে ওঠেন। বলেন, দাদা, আমার বয়স বত্রিশ, কিন্তু এই বয়সেই অনেক মানুষ ঘাঁটাঘাঁটি করে মানুষ চিনতে আমার অসুবিধে হয় না।

আমি হেসে বলি, আমাকে কী খুব মহৎ মনে হচ্ছে?

—দাদা, শুধু শুধু তর্ক করলে এবার আপনি বকুনি খাবেন।

পরের দিন দিদি সত্যি আমাকে সব কথা বললেন।……

দেশটা দু'টুকরো হবার আগে মাদারিপুরে ঘোষেদের সত্যি ভাল ব্যবসা ছিল, কিন্তু পার্টিশান হবার সঙ্গে সঙ্গেই ভাইদের মধ্যে ঝগড়া লেগে গেল। কেউ কেউ বললেন, পাকিস্তান কখনই টিকতে পারে না। আমরা শুধু শুধু কেন চোদ্দ পুরুষের ভিটে ছেড়ে পালাব। অন্যেরা ঠিক উল্টো মত প্রকাশ করলেন, এখানে আর কিছুতেই হিন্দুদের থাকা নিরাপদ নয়। সুতরাং অযথা সময় নষ্ট না করে সব কিছু বিক্রি করে ওপারে গিয়ে আবার ব্যবসা শুরু করা যাক।

রোজ রোজ এই নিয়ে ভাইদের মধ্যে তর্ক-বিতর্কের সীমা ছিল না। তর্ক করতে করতে শেষ পর্যন্ত তুমুল ঝগড়া। কোন কোনদিন প্রায় হাতাহাতি হবার উপক্রম হতো। নগেন ঘোষ বরাবরই রগচটা। তাই একদিন তিনি স্ত্রী-পুত্র-কন্যাদের হাত ধরে বেরিয়ে পড়লেন মাদারিপুর থেকে। বর্ডার পার হবার সময় কিছু খরচ করতে হলেও, নগেনবাবু যখন হিন্দুস্তানে পৌঁছলেন তখনও ওঁর কাছে

প্রায় হাজার-কুড়ি টাকা আর বিশ-বাইশ ভরি সোনা ছিল।

প্রথমে কিছুদিন বনগাঁ, তারপর দমদম। দমদম থেকে মুর্শিদাবাদ। নগেনবাবু স্ত্রীকে বোঝালেন, ঘোষবাড়ির ছেলেরা যে ব্যবসা বোঝে, তা হলো চাল, ডাল তেলের পাইকারী ব্যবসা। পাঁচুমামা মুর্শিদাবাদে ভালই ব্যবসা করছেন। পাঁচুমামার ওখানে গেলে নিশ্চয়ই উনি কিছু সাহায্য করবেন।

নগেনবাবুর স্ত্রী ব্যবসা-বাণিজ্য বোঝেন না; তবে বোঝেন মেজ ভাসুরের জন্যই মাদারিপুরে ব্যবসা চলত। মেজ ভাসুরের এক আনা বুদ্ধিও অন্য কোন ভাসুর-দেওরের নেই। স্বামীরও নেই। তাছাড়া এই দেড় বছরে বেশ কিছু টাকা ব্যয় হয়ে গেছে। নতুন করে ব্যবসা শুরু করতে হলে কী এই টাকায় হবে? এসব কোন কথাই উনি স্বামীকে বললেন না; শুধু বললেন, পাঁচুমামার সঙ্গে তো তোমাদের বহুকাল ছাড়াছাড়ি। উনি যদি তোমাকে সাহায্য করতে না চান তাহলে………।

নগেনবাবু হো-হো করে হেসে ওঠেন। বলেন, আরে পাঁচুমামা কী আমাদের পর? উনি মেজ কাকিমার আপন ভাই। ওঁর বিয়েতে পর্যন্ত আমি বরযাত্রী গেছি। তাছাড়া পাঁচুমামা যখনই আমাদের ওখানে এসেছেন তখনই…।

ওঁর স্ত্রী সেমিজ সেলাই করতে করতেই বলেন, সবই বুঝলাম, কিন্তু গত বিশ-বাইশ বছর তো কোন যোগাযোগ নেই।

—তাতে কী হলো? তাই বলে কী উনি আমার মামা নেই?

মুর্শিদাবাদে গিয়ে প্রথমে পাঁচুমামার ওখানেই আশ্রয়, কিন্তু দিন দশেক পরেই সে আশ্রয় ত্যাগ করতে হলো। ব্যবসা? পাঁচুমামা বললেন, এখন তো আমি ব্যবসার কিছু করি না; সবকিছু ছেলেরাই চালায়। আমার মনে হয় না ওরা তোমাকে বিশেষ সাহায্য করতে পারবে। শেষে পাঁচুমামা একটা সদুপদেশও দিলেন, তুমি নিজেই একটা ছোট-খাট দোকান করো। মনে হয় তাতেই তোমাদের চলে যাবে।

শেষ পর্যন্ত নগেনবাবু দোকান করেছিলেন, কিন্তু পৈতৃক চাল-ডালের পাইকারী ব্যবসা নয়, সামান্য পানবিড়ির দোকান। মুদিখানার দোকান করার জন্য যে মূলধন দরকার, তার সংস্থান করাও ওঁর পক্ষে সম্ভব হলো না।

রোজ রাত্রে খেতে বসে নগেন ঘোষ ওঁর স্ত্রীকে বলেন, মাদারিপুরের ঘোষবাড়ির ছেলে হয়ে শেষ পর্যন্ত পানবিড়ির দোকান করলাম। এর চাইতে মৃত্যুও

ভাল ছিল।

ওঁর স্ত্রী বলেন, অত মন খারাপ করে কী লাভ ? বরং আমরা সবাই আবার মাদারিপুর ফিরে যাই।

—না-না, তা হয় না। এ জীবনে আর মাদারিপুর ফিরে যেতে পারব না। নগেন ঘোষ একটু থেমে বলেন, তাছাড়া মেয়েটা বড় হয়ে উঠেছে। এখানে খাওয়া পরার কষ্ট থাকলেও ইজ্জত তো কেউ কেড়ে নিতে পারবে না।

ইলা ঘোষ খুব জোরে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, জানেন দাদা, অদৃষ্টের এমনই পরিহাস যে, পরবর্তীকালে আমাকে সেই ইজ্জত খোয়াতেই হলো।

আমি অবাক হয়ে বললাম, তার মানে ?

দিদি একটু ম্লান হেসে বললেন, সেকি দাদা, এই সহজ কথাটার মানে বুঝতে পারছেন না।

—না।

—ক'টা বছর অত্যন্ত দুঃখ কষ্টের মধ্যে কাটাবার পর আমি ঐ মুখার্জী মশায়ের কৃপায় একটা প্রাইমারী হেলথ সেণ্টারে চাকরি পেলাম।

—মুখার্জী মশাই কি করতেন ?

—উনি হেলথ ডিপার্টমেণ্টে চাকরি করতেন।

—ওঁর সঙ্গে আগেই পরিচয় ছিল ?

—না। চাকরির জন্য হেলথ ডিপার্টমেণ্টে যাতায়াত করতে করতে ওঁর সঙ্গে আলাপ। দিদি একটু থেমে বললেন, পরবর্তীকালে উনি আমার প্রতি অনেক অন্যায় করলেও একথা নিশ্চয়ই স্বীকার করব, সে সময় ওঁর সাহায্যে চাকরি না পেলে সত্যি আমাদের অনাহারে মরতে হতো।

—পরবর্তীকালে উনি কী অন্যায় করেছেন ?

দিদি আবার একটু ম্লান হাসি হেসে বলেন, আস্তে আস্তে সব বলছি।

সদর থেকে বাসে ঘণ্টা তিনেকের পথ। তারপর পায়ে হেঁটে আরো দু-মাইল। সরকারী পরিভাষায় পি. এইচ. সি.। পুরো কথা প্রাইমারী হেলথ সেণ্টার। চলতি কথায় হেলথ সেণ্টার। প্রথম পাঁচশালা পরিকল্পনার দান। প্রায় মাঠের মাঝখানেই খান-তিনেক পাকা ঘর। উপরে টিন। আশেপাশের গোটাকতক গ্রামের শিশু ও মাতৃমঙ্গলের দায়িত্ব এই কেন্দ্রের। যুগ যুগ উপেক্ষিত গ্রামে আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থার প্রথম পদক্ষেপ। গ্রামের লোকজন ভারী খুশি।

অতি সামান্য মাইনে। তবে হেলথ সেণ্টারেই কোয়ার্টার আছে। ব্যবস্থাও

বেশ ভাল। হেলথ ভিজিটর সেণ্টারেও থাকেন, গ্রামেও ঘুরে বেড়ান। শিশু ও মাতৃমঙ্গলের কাজে আসেন বলে গ্রামে-গঞ্জে হেলথ ভিজিটর উপেক্ষিতা নয়। ওরা সবারই দিদি। গ্রামের লোক খুশি হয়ে দিদির কোয়ার্টারে শাক-সব্জী থেকে মাছ-মুরগী-ডিমও পৌঁছে দেন। হেলথ ভিজিটর ইলা ঘোষের দিনও বেশ কেটে যায়।

গ্রামে ঘোরাঘুরি করার টি. এ. বিলের ফর্ম সদরে সিভিল সার্জেনের অফিসে থাকে। তাই মাসে-দু'মাসে হেলথ ভিজিটরদের যেতেই হয়। সামান্য বিশ-পঁচিশটা টাকা কিন্তু ওদের কাছে ওর দাম অনেক।

ইলা ঘোষ যোগীন মোড়লকে দিয়ে বাসের ড্রাইভারকে খবর পাঠায়, পরশু সদর যাব। ড্রাইভার যেন নন্দনপুর পি. এইচ. সি-র পারুলকে খবরটা জানিয়ে দেয়। পারুল যথারীতি বাসষ্টপে এসে ইলার সঙ্গে দেখা করে। একথা সে কথার পর বলে, তুই আমার জন্যও একটা ফর্ম আনিস। আমারও টি. এ. বিল জমা দিতে হবে।

মুখার্জী মশাই এখন সিভিল সার্জেনের অফিসের বড়বাবু। অফিস ঘরের মধ্যে ইলা ওঁকে প্রণাম করতে পারে না। তবু ওঁর কাছেই প্রথম যায়। মুখার্জীবাবু মাঝখানের আঙ্গুলে থুথু লাগিয়ে ফাইলের কাগজ ও টাতে ও টাতেই ওর দিকে একবার তাকিয়েই হাসেন। তারপর মুখ না তুলেই বলেন, কেমন আছ?

—ভাল।

এবার মুখার্জী মশাই মুখ তুলে ওকে আরেকবার দেখে বলেন, দেখেও তাই মনে হচ্ছে।

ইলা জানায় টি. এ. বিলের ফর্ম ভর্তি করে জমা দেবার জন্য সদরে এসেছে। মুখার্জী মশাই বলেন, বিদ্যুৎ বা পাঠকের কাছেই ফর্ম পেয়ে যাবে।

বিদ্যুৎবাবুর টেবিলের সামনে যেতেই উনি প্রশ্ন করেন, বলুন কি চাই?

—টি. এ. বিলের জন্য ফর্ম চাইছিলাম।

ফর্ম! বোধহয় ফুরিয়ে গেছে। তবে সামনের সপ্তাহেই আবার ফর্ম এসে যাবে।

—একটু দেখুন না, যদি গোটা দুয়েক ফর্ম পড়ে থাকে। এত দূর থেকে এসেছি!······

—কী করে জানব আজকেই আপনি ফর্ম নিতে আসবেন?

···যখন-তখন তো আমরা আসতে পারি না, তাই······

ইলা ঘোষ কথাটা শেষ করার আগেই পাঠকবাবু নিজের সীট ছেড়ে বিদ্যুতের টেবিলের পাশে এসে দাঁড়ান। বলেন, জানিস বিদ্যুৎ, এদের শাক-সব্জী, মাছ-ডিম-মুরগী কিছুই কিনতে হয় না।

— যা, যা, বাজে বকিস না।

—সত্যি বলছি। চাষীরা এসব এদের দিয়ে যায়।

বিদ্যুৎ মুখ তুলে ইলাকে জিজ্ঞাসা করে, সত্যি নাকি ?

—মাঝে মাঝে গ্রামের লোকজন কিছু দিয়ে যায়।

পাঠকবাবু বললেন, দেখলি তো ? আমি আজেবাজে কথা বলি না।

বিদ্যুৎ বলে, না খাওয়ালে জানব কী করে ?

ইলা ঘোষ হেসে বলে, আপনারা এলে নিশ্চয়ই খাওযাব।

হরিদ্বারের গঙ্গাতীরে বসে আমি দিদির কাহিনী শুনতে শুনতে বলি, সরকারী অফিসের মানুষগুলো সত্যি অদ্ভুত !

দিদি গম্ভীর হযে বললেন, দাদা, আমরা যেসব মেয়েরা পি. এইচ. সি-তে কাজ করতাম, সবাই পেটের দায়ে ঘরবাড়ি ছেড়ে এতদূরে অজানা গ্রামে থাকতাম। তাছাড়া কারুর বয়সই বাইশ-চব্বিশের বেশী ছিল না। আমাদের ঐ ক'টা টাকার উপরেই আমাদের সবার বাবা-মা, ভাইবোন বেঁচে থাকত।

—তা তো বটেই।

—টি. এ. বিলের পনের-বিশ টাকা, ডিয়ারনেস এলাউন্সের বকেয়া কিছু পাওনা, বাড়তি মাইনের কয়েকটা টাকা দিয়েই বাড়ির সবার জামা-কাপড, ভাই-বোনেদের লেখাপড়ার খরচ চলত। দিদি একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে উদাস শূন্য দৃষ্টিতে স্বচ্ছ পবিত্র নিত্য প্রবহমান গঙ্গার দিকে তাকিয়ে বলেন, কিন্তু দাদা, ঐ ক'টা টাকা পাবার জন্য সিভিল সার্জেনের অফিসের বাবুদের কিভাবে খুশি করতে হতো, শুনলে আপনি অবাক হবেন।

—ওরা বুঝি ঘুষ নিতেন ?

—ঘুষ চাইলে তো আমরা বেঁচে যেতাম।

—ত. হলে কী দিতেন ?

দিদির মুখে আবার একটু ম্লান হাসি। এক মুহূর্তের জন্য কী যেন ভাবেন। তারপর বলেন, জানেন দাদা দু-চার মাস পর পরই আমাদের ওখানে কোন না কোন বিদ্যুৎবাবু বা পাঠকবাবু দু-একদিনের জন্য বেড়াতে আসতেন।

— তাই নাকি ?

—হ্যাঁ দাদা। ওদের প্রাণভরে মাছ-মুরগী খাওয়াতে হতো।...

—বলেন কী ?

দিদি আবার হাসেন। বলেন, এখনই চমকে উঠবেন না। পিসতুতো মাসতুতো ভাই বলে আমাদের ঘরেই ওদের ঠাঁই দিতে হতো এবং নির্বিবাদে আমাদের অনেককেই ; তবে কেউ স্বেচ্ছায়, কেউ অনিচ্ছায় এই দুর্ভোগ সহ্য করতো।

—কোন কোন মেয়ে স্বেচ্ছায় একাজ করত ?

— হ্যাঁ দাদা, সব মেয়ে তো সমান হয় না।

আমি অবাক হয়ে ভাবি। অনেকক্ষণ। দিদিও চুপ করে থাকেন। তারপর হঠাৎ আমি প্রশ্ন করি, মুখার্জী মশাই কেমন লোক ছিলেন ?

দিদি হেসে বললেন, মেডিক্যাল টেস্টের জন্য যারা আসত, তাদের টাকাতেই উনি খুশি থাকতেন।...

— কাদের মেডিক্যাল টেস্ট ?

— সরকারী চাকরিতে সিলেকশনের পর মেডিক্যাল টেস্ট হয়।...

— তা জানি।

এই মেডিক্যাল টেস্টে পাশ না হলে তো কেউ চাকরি পায় না। তাই সবাইকেই দশ-পনের টাকা দিতে হতো। ঐ টাকার যে ভাগ মুখার্জী পেতেন তাতেই ওঁর পেট ভরে যেতো বলে উনি আমাদের দিকে নজর দিতেন না। তবে...

দিদি হঠাৎ থামেন। আমি বলি, তবে কী ?

—নিজের পছন্দ মত জায়গায় বদলী হতে হলে ওঁকে পিসেমশাই মেসোমশাই বলে ক'দিন কাছে রাখতে হতো।

—উনি কী বিদ্যুৎ-পাঠকবাবুর মত ছিলেন ?

দিদি হেসে বলেন, গরীব ও অসহায় যুবতীকে কাছে পেলে ক'জন নিজেকে সংযত রাখতে পারে ?

দিদি আরো কত কী বললেন। সব শেষে বললেন, জানেন দাদা, জীবনে মানুষের এত দৈন্য, এত নোংরামী দেখেছি যে এখন ভাল মানুষকেও ভাল ভাবতে দ্বিধা হয়, ভয় হয়।

পর পর আঘাত পেলে সব মানুষই বিশ্বাস হারিয়ে ফেলে।

দেখতে দেখতে বেশ ক'টা দিন কেটে গেল। সেদিন সকালে ঘুম থেকে

উঠেই মনে হলো, এবার দিল্লী ফেরা দরকার। একটু পরে দিদি চা নিয়ে ঘরে ঢুকতেই বললাম, কালকেও আপনাকে চা খাওয়াতে হবে।

—তার মানে ?

—ভাবছি, কাল দুপুরেই দিল্লী ফিরে যাব।

—কেন ?

—কাল তো দেওয়ালী।

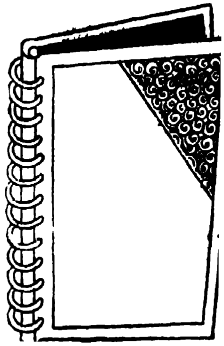
—তাতে কিছু হবে না।

—না, আপনাকে শুক্রবার পর্যন্ত থাকতেই হবে।

—কেন ?

—কেন আবার ? আপনি আমার ভাইফোঁটা নেবেন না ?

আমি মুগ্ধ বিস্ময়ে দিদির দিকে তাকিয়ে রইলাম।



পাতারহাট

এমন অপ্রত্যাশিতভাবে ওর সঙ্গে আলাপ হবে, তা ভাবতে পারি নি। নাম শুনতেইচমকে উঠলাম। আমি কোনকালেই রাজনীতি করিনি, বিপ্লবী আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত ছিলাম না। তবে বিয়াল্লিশের আন্দোলনের সময় দাদা ও দাদার বন্ধুদের প্রয়োজনে ও নির্দেশে রেশন ব্যাগের মধ্যে লুকিয়ে রিভলবার পৌঁছে দিয়েছি এখানে ওখানে। আর কংগ্রেস অফিসের কোণায় মণিমেলা কেন্দ্র চালাবার সময় কিছু সর্বত্যাগী কর্মীর সান্নিধ্যে এসেশুনেছি নানা কাহিনী, পড়েছি কিছু বই, জেনেছি বিপ্লবীদের ইতিহাস। তাইতো চমকে উঠেই প্রশ্ন করলাম, আপনিই কী সেই অনাদি ঘোষ যিনি ড্রুরাণ্ড সাহেবকে……

কথাটা শেষ করার আগেই উনি হেসে ফেললেন। বললেন, তুমিও সে কাহিনী জানো?

—জানব না?

উনি মাথা নেড়ে বললেন, সেসব কাহিনী আজকাল কেউ মনে রাখে না। মনে রাখার দরকারও নেই।

ডেরাডুন বাস স্ট্যাণ্ডে দাঁড়িয়ে কথা হচ্ছিল কিন্তু বেশীক্ষণ কথা বলার সুযোগ হল না। কণ্ডাক্টর এসে হুইসেল বাজাতেই উনি হরিদ্বারের বাসে উঠলেন। তবে ঠিকানা বিনিময় হল বাস ছাড়ার আগেই। দু'একটা চিঠির আদান-প্রদানও হল কিন্তু তারপর দু'-পক্ষই নীরব।

বছর দশেক পার হয়ে গেল।

পাটনা।

জয়প্রকাশ সর্বোদয় বর্জন করে কদমকুঁয়ার বাড়িতে ফিরে এলেও আবার সংবাদ-পত্রের শিরোনামা। চম্পারণ সত্যাগ্রহ আর বহুকাল আগের বিধ্বংসী ভূমিকম্পের পর বিহার আবার সর্বভারতীয় সংবাদ। সম্পাদকের নির্দেশে বিহার সফরের আগে গেছি কদমকুঁয়া। জয়প্রকাশের সঙ্গে দেখা করে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামার সময় ওঁব সঙ্গে মুখোমুখি দেখা।

—আপনি! আমি বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করি।

উনি হেসে বললেন, আমি তো মাঝে মাঝেই আসি।- তুমি কবে এলে?

—কাল এসেছি।

—ক'দিন থাকবে?

—এখানে দু-তিন দিন আছি। • তারপর কয়েকটা জেলা ঘুরব।

—এখানে কোথায় উঠেছ?

—হোটেল পাটলিপুত্রে।

ঠিক আছে যোগাযোগ করব।

আর কথা হল না। অনাদিবাবু উপরে উঠে গেলেন। আমি বেরিয়ে এলাম।

বিহার সরকারের দু'-চারজন মন্ত্রী ও পদস্থ অফিসারের সঙ্গে কথাবার্তা বলে মধ্যাহ্ন ভোজনের জন্য যখন হোটেলে ফিরলাম, তখন দুটো বেজে গেছে। রিসেপসন কাউণ্টারে ঘরের চাবি নিতে গিয়েই একটা চিরকুট পেলাম—তোমার সঙ্গে গল্প করার জন্য সন্ধ্যার পর আসব। তুমি সাতটা সাড়ে-সাতটার মধ্যে ফিরে এলে ভাল হয়।—অনাদিদা।

রিসেপসনের সামনে দাঁড়িয়ে দাড়িয়েই দু-তিনবার পড়লাম। লিফট্-এর মধ্যে, ঘরে বসে লাঞ্চ খেতে খেতে মনে পড়ল, এই পাটনা শহরেই এই রকম একটা ছোট্ট চিরকুটের জন্যই অনাদিদা ধরা পড়েছিলেন।

গ্রামের অন্যান্য সবার মত অনাদিও লেখাপড়া শুরু করল ন্যায়রত্নের পাঠ-শালায়। পাঠশালার গুরুমশাই ন্যায়রত্ন না; ওর বাবা ছিলেন ন্যায়রত্ন। গুরুমশায়ের বিদ্যার দৌড় ব্যকরণের মধ্যে। তা হোক। গ্রামের সবাই বলত, ন্যায়রত্নের পাঠশালা। ন্যায়রত্নের পাঠশালা শেষ করে কেউ চলে যেত সদর শহরে; কেউ বা আত্মীয়-স্বজনের আশ্রয়ে অন্যত্র কোথাও। বরিশালের গ্রামের

ছেলে অনাদি পিসীমার সঙ্গে চলে এল যশোর। ভর্তি হল সম্মিলনী স্কুলে। বছর ঘুরতে না ঘুরতেই অনাদির নাম ছড়িয়ে পড়ল স্কুলের সব শিক্ষক ও ছাত্রদের মধ্যে। কারণ ছিল। অনাদি শুধু ভাল ছাত্র না, ভাল আবৃত্তি করে। সর্বোপবি কারণ ছিল, ওর মুখের হাসি আর মধুর স্বভাব।

ক্লাশ এইট-নাইনে যখন পড়ে তখন অনাদির জনপ্রিয়তা তুঙ্গে। অংকে তত ভাল না হলেও আর সব বিষয়ে অনাদির সঙ্গে কেউ পেরে ওঠে না। বাংলা লিখত চমৎকার। স্কুলের ম্যাগাজিনে যে ছাত্রের লেখা প্রতিবার ছাপা হত তার নাম অনাদি ঘোষ। ঐ অল্প বয়সেই ওর বক্তৃতা শুনে মুগ্ধ হতেন সবাই। চারিত্রিক মাধুর্যের জন্য সব ছাত্র ভিড় করত আশেপাশে।

স্কুলের জনপ্রিয়তার ঢেউ পৌঁছেছে শহরের পাড়ায়-পাড়ায়, ঘরে-ঘরে। শহরের বহুজনের সঙ্গেই অনাদির পরিচয়, ঘনিষ্ঠতা।

গরমের ছুটির দিন দশেক আগে হঠাৎ একদিন স্কুলে আসার পথে লোন অফিসের সামনে অজয়দার সঙ্গে দেখা।

—কিরে অনাদি, কেমন আছিস ?

—ভাল। অনাদি হেসে জবাব দেয়। জিজ্ঞেস করে, আপনি কেমন আছেন অজয়দা ?

অজয়দা হেসে বলেন, শারীরিক ভালই আছি কিন্তু মানসিক অবস্থা ভাল না।

উৎকণ্ঠিত অনাদি জানতে চায়, কেন ? বাড়িতে কেউ অসুস্থ নাকি ?

অজয়দা আবার হাসেন। বলেন, এ দেশে যার বুদ্ধি-বিবেচনা আছে, সে কী সুখে থাকতে পারে ?

কথাটা কেমন বেসুরো লাগল অনাদির। একটু অবাক হয়ে ওর দিকে তাকায়।

অজয়দা আর হাসেন না। হঠাৎ ওঁর উজ্জ্বল সুন্দর মুখখানা কেমন ম্লান হয়ে যায়। দুঃশ্চিন্তার রেখাগুলো স্পষ্ট হয়ে ওঠে কপালে। বলেন, কাল রাত্তিরে পুলিশ নিত্যদাকে কোতোয়ালীতে নিয়ে গেলে ডুরাণ্ড সাহেব গুণে গুণে ওকে একশোবার লাথি মেরেছে।

শুনেই অনাদির খারাপ লাগে। বলে, তাই নাকি ?

—হ্যাঁ।

—কিন্তু কারুর কাছে তো শুনলাম না।

—শুনতে চাইলেই শুনতে পাবি।

ওখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই স্কুলের ফার্স্ট বেল শোনা যায়। অজয়দা বললেন, স্কুলে যা। একদিন আসিস।

—নিশ্চয়ই আসব।

স্কুলে বসেও অনাদি সারাদিন ঐ কথাই ভাবে। ইস! নিত্যদার মত সবজনশ্রদ্ধেয় মানুষকে ডুরাণ্ড সাহেব একশোবার লাথি মেরেছে।

গত বছরই ডুরাণ্ড সাহেব স্কুলের পুরস্কার বিতরণী সভায় এসেছিল। অনাদি ওকে ঐ একবারই দেখেছে। দেখলেই বোঝা যায়, লোকটা কত দাম্ভিক আর বদমেজাজী। অনাদি ওর ইংরেজি বক্তৃতা ঠিক বুঝতে পারে নি কিন্তু হেড মাষ্টারমশাইয়ের তর্জমা শুনেই বুঝেছে, লোকটা ভারতবর্ষের মানুষকে কত ঘেন্না, কত তুচ্ছজ্ঞান করে।

সেদিন বিকেলেই অনাদি অজয়দার ক্লাবে হাজির। পরদিনই দু'আনা দিয়ে জগজ্জননী ক্লাবের সদস্য। গরমের ছুটিতে পড়াশুনার অছিলায় বরিশাল যাওয়া বাতিল করে ব্যায়াম চর্চার আড়ালে অনাদি আরো কত কি চর্চা করে। কত কি পড়ে, শোনে। জানতে পারে কত অজানা কাহিনী। বছর খানেক পরে অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা। নবজন্ম হল অনাদির।

তারপরের বছর খানেক অন্ধকার। অনাদি স্কুলে যায়। পড়াশুনাও করে, কিন্তু আর কি করে সে খবর বাইরের দুনিয়ার কেউ জানতে পারে না।

সেকেণ্ড ডিভিশনে ম্যাট্রিক পাশ করল অনাদি। নিত্যদার নির্দেশে অনাদি যশোর ছেড়ে চলে গেল বরিশাল। ভর্তি হল ব্রজমোহন কলেজে।

পুজোর ছুটির ঠিক দুদিন আগে হঠাৎ এক দূত মারফত স্বয়ং ত্রৈলোক্য মহারাজ খবর পাঠালেন, ছুটি হবার সঙ্গে সঙ্গে যশোরে পিসীমার বাড়ি বেড়াতে যাও। ইঙ্গিত বোঝে অনাদি।

ছুটি হবার পরদিনই স্টীমারে ওঠে অনাদি। প্রথমে খুলনা। তারপর যশোর। পিসীমা খুশি, পিসেমশাই খুশি। খুশি ভাই-বোনেরাও।

গল্পগুজব করে শুতে শুতে অনেক রাত হল। মশারি ঠিক করতে এসে জয়া বলল, রাঙাদা, ঘুমিও না। একটা থেকে সওয়া একটার মধ্যে সুনীলদা আসবে। আমি চলে গেলে দরজায় খিল দিও না। আমিও ঘুমোব না। দরকার হলে জানলা দিয়ে হাত বাড়িয়ে আমার মাথায় হাত দিলেই উঠে পড়ব।

হ্যাঁ, ঠিক সওয়া একটায় সুনীল এল। মশারির মধ্যে বসে অনেকক্ষণ অনেক

কথা বলল ফিসফিস.করে।

তারপর ?

তারপর যেমন চুপি চুপি এসেছিল, ঠিক তেমনি চুপি চুপি চলে গেল সুনীল। রেখে গেল ছোট একটা বালিশ।

বিছানা ছেড়ে উঠল অনাদিও। ঘর থেকে বেরুল পা টিপে টিপে। বারান্দা পার হয়ে পিছন দিক দিয়ে ঘুরে বোনেদের ঘরের জানলার সামনে এসে একটু দাঁড়াল। একবার ভাল করে এদিক-ওদিক দেখে জানলা দিয়ে হাত বাড়িয়ে জয়ার মাথায় একটা টোকা দিতেই ও উঠে বসল। অনাদির মতই পা টিপে টিপে বেরিয়ে এল বাইরে। তারপর কোন কথা না বলে ঐ অন্ধকার রাত্রে অনাদির হাত ধরে নিয়ে এল উত্তর দিকের বাগানে। চাঁপা গাছের নীচে গর্ত করাই ছিল। অনাদির হাত থেকে ছোট্ট বালিশটা নিয়ে ফেলে দিল ঐ গর্তের মধ্যে। সঙ্গে সঙ্গে দুজনে মিলে মাটি চাপা দিয়ে কিছু ঘাস-পাতা ছড়িয়ে দিল। ওরা দুজনে ফিরে গেল নিজের নিজের ঘরে।

ভোরবেলায় দুজনেরই ঘুম ভাঙ্গল হৈ-চৈ শুনে। পুলিশ। অনাদির পিশেমশাই, এ বাড়ির গৃহকর্তা চন্দ্রবাবু শহরের নামকরা উকিল। দারোগাবাবু তাঁর সঙ্গে কোন খারাপ ব্যবহার করলেন না। বললেন, আই বি'র রিপোর্ট এই বাড়িতে সুনীল সরকার লুকিয়ে আছে। তাই আপনাদের একটু কষ্ট দেব।

চন্দ্রবাবু বললেন, কাল আমার শালার ছেলে অনাদি এসেছে। তাছাড়া আর কেউ তো···

পুণ্য কাজে দারোগাবাবুর সহযাত্রী আই বি'র কালাচরণবাবু বললেন, সে তো পাড়ার সবাই জানে।

যাই হোক সারা বাড়ি খানাতল্লাসী করে ওঁরা শুধু সুনীলকেই খুঁজলেন না, আরো কিছু খুঁজলেন তন্ন তন্ন করে। বাড়ির মেয়ে-পুরুষ ঝি-চাকর সবাইকে জেরা করলেন, কেউ কিছু রাখতে দিয়েছে কিনা।

সবাই বলল, না, কেউ কিছু রেখে যায় নি। জয়া বলল, শুধু মিত্তির কাকার মেয়ে ছায়া এসে এক কৌটো নাড়ু দিয়ে গেছে রাঙ্গাদার জন্য।

দারোগাবাবু আর কালাচরণবাবু প্রায় একসঙ্গেই চিৎকার করে উঠলেন, কোথায় সে কৌটা ?

জয়া না, জয়ার মা না, ঝি এনে দিল সে কৌটো। হুমড়ি খেয়ে পড়লেন ওঁরা দুজনেই। দুজনেই হতাশ।

জয়া হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করল, আপনারা কী খুঁজছেন ?

কালাচরণবাবু রেগে বললেন, তাতে তোমার কী দরকার ?

ঘণ্টা তিনেক ধরে খানাতল্লাসী করেও হঁরা কিছুই পেলেন না। যাবার সময় দারোগাবাবু বলে গেলেন, ডুরাণ্ড সাহেবের হুকুম মত এসেছিলাম। কিছু মনে করবেন না।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে অনাদি আর জয়া।

কিছুক্ষণ পরেই অনাদি সাইকেলে চক্কর দিয়ে আসে সারা লোন অফিস পাড়া। ক্রীং ক্রীং ঘণ্টা বাজিয়ে অজয়দাকে জানিয়ে দেয়, সব ঠিক আছে।

জলখাবার দিতে এসে জয়া অনাদিকে বলল, রাঙ্গাদা, খুব সাবধান। সুনীলদা যে আসবে, তা পর্যন্ত ওরা জেনে গেছে।

— হ্যাঁ, তাইতো দেখছি।

—তোমাদের মধ্যে কেউ কিছু···।

—উচিত নয় তবে···। কথাটা শেষ না করেই অনাদি বলে, একটা কাজ করবি ?

—বল, কী করতে হবে ?

—একটা চিঠি দিচ্ছি। ওটা সুভাষের ঠাকুমাকে দিয়ে বলবি, কালীবাড়ির আরতির সময় জবাব নিবি।

সন্ধ্যার পর কালীবাড়ির আরতির সময় সুভাষের ঠাকুমার পাশে হাত জোড করে বসল জয়া। প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরে আরতি চলল। আরতি শেষ। এবার চোখ বুজে প্রণামের সময়। ব্যস। ঐ সময় ছোট্ট একটা কাগজ এসে গেল জয়ার হাতে।

সকালবেলায় জয়াদের বাড়ি খানাতল্লাসী হবার খবর পাবার সঙ্গে সঙ্গেই নিত্যদা সমস্ত পরিকল্পনাটা অদল-বদল করে জানিয়ে দেন অজয়দাকে। নতুন পরিকল্পনার সব কিছু খবর জয়া এনে দিল অনাদিকে।

দুর্গাপূজা শুরু হয়েছে। সারা শহরে আনন্দের বন্যা। ঢাক-ঢোল বাজছে চারদিকে। নতুন জামাকাপড় পরে ছেলেমেয়েরা যাচ্ছে পূজা দেখতে। ছুটির আনন্দ উপভোগ করতে অফিস-আদালতের অনেকেই গ্রামের বাড়ি গেছেন। ছুটি ডুরাণ্ড সাহেবেরও। অফিস না গেলেও বাংলোয় বসে কাজ করেন। পুলিশ অফিসাররা আসেন নানা খবর নিয়ে। ফিরে যান সাহেবের নির্দেশ নিয়ে। তবে সবাই জানে ছুটির দিনে সাহেব-মেমসাহেব ঘুমিয়ে থাকেন অনেক বেলা পর্যন্ত।

খুব জরুরী কারণ না হলে সাহেব কখনই ভোরে ওঠেন না।

সেদিন মহাষ্টমী।

তখনও অন্ধকার কাটে নি। উষার আলো দেখা দেবে কিছুক্ষণ পরে। সূর্য উঠবে আরো পরে। ডুরাণ্ড সাহেবের বাংলোর গেটের সামনে কিছু কাগজপত্র নিয়ে দুই দারোগাবাবু হাজির। পাহারাদার কনষ্টেবল হেসে বলল, এত ভোরে?

একজন দারোগাবাবু হেসে বললেন, কী করব? বড়কর্তারা যেমন হুকুম দেবেন, আমাদের তো তাই করতে হবে।

কনষ্টেবল বলল, আজ তো ছুটি। সাহেব তো উঠবেন অনেক বেলায়।

আমরা বসে থাকব। সাহেব উঠলেই কাগজ সই করিয়ে ছুটব এস পি সাহেবের কাছে।

দারোগাবাবুরা ভিতরে ঢোকেন। কনষ্টেবল গেট বন্ধ করে দেয়।

বিরাট এলাকার মাঝখানে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের দোতলা বাংলো। চারদিকের লনেই ফুটবল খেলা যায়। গাছপালা দিয়ে ঘেরা সমস্ত এলাকা। সামনের লন পেরিয়ে বাংলোর বারান্দায় পৌঁছতেই দারোগাবাবুদের মিনিট পাঁচেক লাগল। সেখানে খান কয়েক চেয়ার। দারোগাবাবুরা সেখানেই বসলেন। ভাল করে দেখেন চারদিক। না, কেউ নেই। ছুটির দিনে এত ভোরে কোন অর্ডালী-বেয়ারা আসবে না। চাকর-বাকর, খানসামারাও তাদের কোয়ার্টারে।

দারোগাবাবুদের হাতে বেশী সময় নেই। ওঁরা দুজনেই উঠে দাঁড়ালেন। পায়চারি করার অছিলায় একবার ঘুরে দেখে নিলেন চারদিকের বারান্দা, সিঁড়ি। একজন সতর্ক পদক্ষেপ ফেলে উপরে উঠলেন। দেখলেন উপরের বারান্দা। না, কেউ নেই। ইসারা করলেন সহকর্মীকে। তিনিও তর তর করে উপরে উঠলেন। ডানদিকে এগিয়ে দেখলেন, ড্রইংরুমের মেঝেয় একজন ঘুমুচ্ছে। দরজা বন্ধই ছিল। একজন আলতো করে সামনের দিকে শিকল তুলে দিলেন! আর একটু এগিয়েই সাহেবের শোবার ঘর। হ্যাঁ, পশ্চিমের জানালা খোলা আছে। মেমসাহেবও নেই। কলকাতায় গেছেন গতকালই। সাহেব বিভোর হয়ে ঘুমুচ্ছেন প্রায় অর্ধউলঙ্গ হয়ে।

ইসারা বিনিময় হয় দুই দারোগার মধ্যে। একজন রইলেন সিঁড়িতে, অন্যজন সাহেবের শোবার ঘরের খোলা পশ্চিমের জানলার পাশে। দুজনের হাতেই রিভলবার। রেডি! সিঁড়ির দারোগাবাবু বাঁ হাত তুলে ইসারা করতেই—

দুম! দুম! দুম!

ডুরাণ্ড সাহেবের একটা বিকট আর্তনাদ! তুই দারোগাবাবুর চিৎকার, কে ?' কে? ছুটে আসে গেটের কনষ্টেবল। ঘুম ভেঙ্গে যায় দু-একজন অর্ডালী-বেয়ারার। দারোগাবাবু রিভলবার হাতে নিয়ে দৌড়তে দৌড়তে বলেন, ধরো, ধরো, ধরো। কনষ্টেবল আর অর্ডালী-বেয়ারাদের উদ্দেশ্যে চিৎকার করে বলেন, তোমরা পিছন দিকে দেখো, ধরো শালাদের।

বিভ্রান্ত কর্মচারীরা এদিকে-ওদিকে দৌড়দৌড়ি করে। ছুটে যান দারোগা-বাবুরাও। ছুটতে ছুটতে কত দূরে চলে যান ওঁরা।

ডুরাণ্ড সাহেবের বাংলোয় পুলিশের কর্তারা পৌঁছবার আগেই অজয়দা আর অনাদিদা জগজ্জননী ক্লাবে ব্যায়ামচর্চা শুরু করে দেন। ওদিকে কনষ্টেবল আর অর্ডালী-বেয়ারাদের বক্তব্য শুনেই পুলিশবাহিনী ছুটে যায় ঝিনেদার রাস্তায়।

পরবর্তী চব্বিশ ঘণ্টায় যশোর আর ঝিনেদার পুলিশ জন পঞ্চাশেককে গ্রেপ্তার করল। অজয়দাকে ধরল দুদিন পর কিন্তু সারাদিন জেরা করে ছেড়ে দিল। বিজয়া দশমীর দুদিন পর অনাদিদা যশোর ছাড়লেন। এলেন কলকাতা। পূজার ছুটি শেষ হবার ঠিক মুখোমুখি ওঁকে বলা হল, চলে যাও বরিশালের পাতারহাট। ওখানকার হিন্দু একাডেমীর হেডমাস্টারমশাইকে বলা আছে। কোন চিন্তা নেই। তবে হ্যাঁ, ওখানে তুমি অনাদি ঘোষ থাকবে না; হবে বিমল চৌধুরী।

বরিশাল জেলার ঘোলা মহকুমায় মেঘনা নদীর পাড়ে পাতারহাট। সুপারী আর লংকার এত বড় গঞ্জ বোধহয় আর কোথাও নেই। বিমল চৌধুরী পৌঁছতেই হেডমাষ্টারমশাই বললেন, হ্যাঁ, সব ঠিক আছে। তুমি এইট, নাইন, টেন-এ বাংলা পড়াবে। লাইব্রেরির পাশের ঘরেই তুমি থাকবে। কোন অসুবিধা হবে না।

না, বিমল চৌধুরীর কোন অসুবিধে হয় নি। বরং আনন্দেই কেটেছে দিন-গুলো। কো-এডুকেশন্যাল স্কুল। হাজার হোক গ্রামের স্কুল। ছাত্র-ছাত্রীদের বয়স একটু বেশী। নতুন মাষ্টারমশাইকে ওরা সবাই ভালবাসে। প্রায়ই ছাত্র-ছাত্রীদের বাড়ি নেমন্তন্ন জুটে যায়। যেদিন জোটে না, সেদিনও নিজেকে রান্না করতে হয় না। কোন না কোন ছাত্রী খুশি হয়েই রান্না করে দেয় ঝোল-ভাত।

মাস চারেক পরেই একদিন হেডমাষ্টারমশাই বললেন, পালাও। আজই রাত্রে পালাও।

প্রথমে কলকাতা, সেখান থেকে হাজারিবাগ। তারপর পাটনা। এই পাটনায় আসার দিন তিনেক পরেই অনাদিদা হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন। একটা

বাচ্চা ছেলের হাতে একটা চিরকুট দিয়ে পাঠান যতীন ডাক্তারের ডিসপেন-সারীতে। উনি তখন রুগী দেখতে গিয়েছিলেন বলে টেবিলের উপর চিরকুটটা রেখে চলে আসে ছেলেটি। ওখানেই বসে ছিলেন বিহার পুলিশের এক বাঙ্গালী দারোগাবাবু। ব্যস। পরের দিন ভোরেই অনাদিদাকে ধরল।

সন্ধ্যের পর অনাদিদা হোটেলে এলে বললাম, আপনার চিরকুটটা পেয়েই সব-কিছু মনে পড়ল।

অনাদিদা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি এত সব জানলে কেমন করে?

ঐ পাতারহাট হিন্দু একাডেমীর হেডমাষ্টারমশায়ের ছেলে আমার বন্ধু। ওদের বাড়িতে সবকিছু শুনেছি।

পাতারহাটের নাম শুনেই উনি একটু আনমনা হয়ে গেলেন। একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে একটু ম্লান হাসি হেসে বললেন পাতারহাটের দিনগুলো সত্যি আনন্দে কেটেছে।

পাটনায় রোজ আমাদের দেখা হয়, গল্প হয়। ঐ দু-তিন দিনের মধ্যেই আমরা এত ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠলাম যে অনাদিদাও আমার সঙ্গে বিহার ঘুরতে বেরিয়ে পড়লেন। প্রথমে হাজারিবাগ, রাঁচি, জামসেদপুর ঘুরে আবার পাটনা। তারপর সমস্তিপুর আর দ্বারভাঙ্গা। সব শেষে গয়া এসে আবিষ্কার করলাম, আমরা বন্ধু হয়ে গেছি।

—আচ্ছা অনাদিদা, একটা কথা বলবে?

অনাদিদা হেসে বললেন, তুই যা জানতে চাস, আমি তাই বলব। যেসব কথা কোনদিন কাউকে বলি নি সেসব কথাও তো তোকে বলেছি।

—দেখো অনাদিদা, তুমি বিখ্যাত বিপ্লবী। তোমার ত্যাগ, তোমার মহত্ত্বের তুলনা হয় না। দেশ স্বাধীন করার জন্য কত ত্যাগ স্বীকার করেছ।...

—ওসব কটা ছেড়ে দে। তুই কী জানতে চাস, তাই বল।

আমি হেসে বললাম, অনাদিদা তুমি তো রক্ত-মাংসের মানুষ! তুমি কী কোনদিন কাউকে ভালবাস নি? কোন মেয়ে কি তোমার জীবনে আসে নি?

সর্বত্যাগী বিপ্লবী অনাদিদা খুব জোরে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে জানলার সামনে দাঁড়িয়ে বুদ্ধগয়ার মন্দিরের দিকে তাকিয়ে বললেন, হ্যাঁ, ভালবেসেছি বৈকি।

—কাকে?

—অশ্রুকে। অনাদিদা একটু থামেন। বুদ্ধগয়ার মন্দিরের চূড়া ছাড়িয়ে তাঁর দৃষ্টি চলে যায় বহুদূরের নীল আকাশের কোলে। বোধহয় রোমন্থন করেন ফেলে

আসা স্মৃতি। স্বপ্নভরা দিনগুলির টুকরো টুকরো ঘটনা, কাহিনী।

অনাদিদা পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে থাকেন জানলার ধারে। অনেকক্ষণ। আমি একটু অপ্রস্তুত হই। লজ্জা পাই। আস্তে আস্তে উঠে যাই। ওর পাশে দাঁড়াই। ওর পিঠে হাত দিয়ে বলি, চলুন, একটু ঘুরে আসি।

অনাদিদা ঘুরে দাঁড়িয়ে একটু হাসেন। চোখে জল নেই কিন্তু ছল-ছল করছে। আষাঢ়-শ্রাবণের ঘন কালো মেঘ। যে কোন মুহূর্তে শুরু হতে পারে বর্ষণ। উনি আমার কাঁধে হাত রেখে বললেন, না, না, বেরুব না। আয়, তোকে অশ্রুর কথা বলি।...

ঘণ্টা বাজতেই অনাদিদা ক্লাশ নাইন থেকে বেরিয়ে আসেন। সঙ্গে সঙ্গে দু-চারজন অনুরাগী ছাত্র। ওদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে বারান্দা দিয়ে এগুতে গিয়ে থমকে দাড়ান। ক্লাশ টেনের দরজায় দাঁড়িয়ে অশ্রু কাঁদছে। অনাদিদা তাড়াতাড়ি এগিয়ে যান। জিজ্ঞেস করেন, কী হল অশ্রু, কাঁদছ কেন?

অশ্রু জবাব দিতে পারে না। জবাব দেয় ওরই এক বান্ধবী। অংক পারে নি বলে সীতানাথ স্যার ওকে খুব বকেছেন।

অনাদিদা হেসে বলেন, আচ্ছা পাগল মেয়ে! এর জন্য কেউ কাঁদে? তুমি স্কুলের পর আমার কাছে এসো; আমি তোমাকে অংক বুঝিয়ে দেব।

অংক কোনকালেই অনাদিদার প্রিয় বিষয় নয়। তবে ছাত্র তো ভাল। তার উপর আছে নিষ্ঠা। চেষ্টা করলে শুধু অংক কেন, ক্লাশ নাইন-টেনের ছাত্রদের ফিজিক্স-কেমিস্ট্রীও পড়াতে পারেন। প্রথমে একটু অসুবিধে হলেও শেষ পর্যন্ত অশ্রুকে অংক বুঝিয়ে দিতে পারলেন অনাদিদা। তারপর বললেন, তুমি রোজ ছুটির পর আমার কাছে চলে এসো। আমি তোমাকে অংক বুঝিয়ে দেব। অংকের জন্য তোমাকে আর কোনদিন চোখের জল ফেলতে হবে না।

অশ্রু মহা খুশি। হাসতে হাসতে বাড়ি যায়।

পরের দিন স্কুল ছুটির পর আবার অশ্রু আসে কিন্তু অনাদিদার ঘরে ঢুকতে বোধহয় লজ্জা পায়। দরজার পাশে দাঁড়িয়ে থাকে। দেখে, অনাদিদা সঞ্চয়িতার পাতা ওল্টাচ্ছেন। তারপর হঠাৎ আপন মনে আবৃত্তি করেন—

সহস্র দিনের মাঝে
আজিকার এই দিনখানি
হয়েছে স্বতন্ত্র চিরন্তন।
তুচ্ছতার বেড়া হতে

মুক্তি তারে কে দিয়েছে আনি,
প্রত্যহের ছিঁড়েছে বন্ধন।
প্রাণ-দেবতার হাতে
জয়টিকা পরেছে সে ভালে,
সূর্যতারকার সাথে
স্থান সে পেয়েছে সমকালে—
সৃষ্টির প্রথম বাণী
যে প্রত্যাশা আকাশে জাগালে
তাই এল করিয়া বহন।

শুনে মুগ্ধ হয় অশ্রু। হঠাৎ অনাদিদার চোখ পড়ে—আরে! তুমি দাঁড়িয়ে কেন? এসো, এসো।

সারাদিন স্কুল করেও ক্লান্তি অবসাদের ছাপ থাকলেও ঢাকা পডে গেছে তার খুশির স্পর্শে। অনাদিদা এক মুহূর্ত সময় নষ্ট করেন না। পড়াতে শুরু করেন সঙ্গে সঙ্গে। পড়াব শেষে বলেন, আমি তো স্কুলের মধ্যেই সারাদিন থাকি। যখনই দরকার হবে চলে এসো। তাছাড়া ইচ্ছে করলে তুমি সব বিষয়ই আমার কাছে পডতে পারো।

অশ্রু লজ্জায় খুশিতে কথা বলতে পাবে না। মুখ নীচু করে চলে যায়।

ক'টা দিন কেটে গেল।

সেদিন স্কুল ছুটির পর অনাদিদা ঘরে ঢুকেই থমকে দাঁড়ান। এত পরিপাটি করে কে গোছাল সারা ঘর? মাসখানেক ধরে বিছানায় যে চাদর পাতা ছিল, তা নেই; বিছানায় ধবধবে কাচা চাদর। ঘরের মেঝেয় একটাও সিগারেটের টুকরো নেই; নেই ছেঁড়া কাগজপত্র। বইপত্রর সুন্দর করে সাজান। ঘরের কোণার অস্থায়ী রান্না-ঘরটিও সুন্দর করে গোছান। কে গোছাল? লাইব্রেরীর বিনোদ? কিন্তু……

অশ্রু এল। সঙ্গে শুধু বইখাতা না; একটা এ্যাসট্রেও। এ্যাসট্রে টেবিলের ওপর রেখে বলল, স্যার এবার থেকে সিগারেটের ছাই-টাই এব মধ্যেই ফেলবেন। অনাদিদা অবাক। প্রশ্ন করেন, তুমিই কি আমার ঘরদোর গুছিয়েছ?

—কেন স্যার? কিন্তু ভুল করেছি?

অনাদিদা হেসে ওঠেন। বলেন, কিছু ভুল করো নি কিন্তু কি দরকার ছিল এত পরিশ্রম করার?

—এতে আবার পরিশ্রম কী ? অশ্রু একটু থেমে বলে, আপনি ভাবভোলা মানুষ। সারাদিন পড়াশুনা নিয়েই থাকেন। আপনার ঘরদোর তো আমাদেরই ঠিকঠাক করে রাখা উচিত।

ওর কথায় উনি খুশি হন। কিন্তু বলেন, হাতের কাছে কাগজ-কলম আর খানকতক বইপত্তর থাকলে আমি শ্মশানঘাটেও মহানন্দে থাকতে পারি।

আরো ক'টা দিন কেটে গেল। ইতিমধ্যে অশ্রুর বাবা নিজে এসে অনাদিদাকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন, বাড়িতে নেমন্তন্ন করেও খাইয়েছেন দু-দিন। স্কুলের মাষ্টার-মশাইরা, গ্রামের অন্যান্যরাও মাঝে মাঝে ওঁকে বাড়িতে নিয়ে খাওয়ান কিন্তু যেদিন ওঁকে নিজে রান্না করতে হয়, সেদিনই উনি চোখে সরষে ফুল দেখেন। অশ্রু তা বুঝতে পেরেছে। তাই সে মাঝে মাঝে নিজেই এগিয়ে আসে। অনাদিদার ওজর আপত্তি অগ্রাহ্য করেই ঝোল-ভাত রেঁধে দেয়।

দিন এগিয়ে চলে। মেঘনার পাড়ে পাতারহাটের গঞ্জে এসে ভীড় করে কত দূর দেশের পালতোলা নৌকা। সওদা বোঝাই করে চলে যায় মেঘনা-পদ্মা পেরিয়ে জানা-অজানা, শহরে-নগরে, গ্রামে-গঞ্জে। শরৎ ফুরিয়ে যায়। হৈমন্তিকের গন্ধ আকাশে-বাতাসে। মাঠের আমন ধানে দোলা দেয়।

—শোনো অশ্রু, শুধু স্কুলের পড়াশুনা করলেই হবে না। আরো অনেককিছু পড়তে হবে।

কনুই-এ ভর দিয়ে হাতের ওপর মুখ রেখে অশ্রু মুগ্ধ হয়ে অনাদিদার কথা শোনে।

অনাদিদা বলেন, দেশে কত কি ঘটছে কিন্তু তোমরা জানতে পারো না, সেসব তোমাকে জানতে হবে।

অনাদিদা ওকে কত বই দেন। অশ্রু পড়ে। রোজ। নিয়মিত।

আর একটা কথা অশ্রু।......

—বলুন স্যার।

—রবীন্দ্রনাথকে খুব ভাল করে পড়তে হবে। পড়তে পড়তে মুখস্থ করতে হবে ওর কবিতা লেখা।

এই মাস দেড়েকের মধ্যেই অশ্রু কত বদলে যায়। ওর বাবা-মা খুশি, খুশি শিক্ষকরাও।

সেদিন কি কারণে যেন ফার্ষ্ট পিরিয়ডের পরই স্কুল ছুটি হয়ে গেল। এক মিনিটে সারা স্কুলবাড়ি ফাঁকা। টিচার্স কমনরুমে অনাদিদা কয়েকজন শিক্ষকদের

সঙ্গে কথাবার্তা বলছিলেন। একটু পরে ওরাও চলে গেলেন। অনাদিদা আস্তে আস্তে ওঁর ঘরে এলেন।

ঘরের মধ্যে ঢুকেই উনি অবাক। কে? অশ্রু? তুমি কাঁদছ? কী হয়েছে তোমার?

অশ্রু কোন প্রশ্নের জবাব দিতে পারে না। দু'চোখ দিয়ে আরো জল গড়িয়ে পড়ে।

অনাদিদা একটু এগিয়ে যান। ওর মাথায় হাত দিয়ে বলেন, বলো অশ্রু কী হয়েছে তোমার? কেউ বকেছে? কেউ কিছু বলেছে?

অশ্রু তখনও কাঁদে।

এবার অনাদিদার অভিমান হয়, আমাকে বলবে না? আমাকে তুমি বিশ্বাস কর না?

অশ্রু কাঁদতে কাঁদতেই বলে, স্যার, ওরা সব……

আর বলতে পারে না।

অনাদিদা আবার ওর মাথায় হাত দিয়ে বলেন, বলো, বলো। লজ্জা কি আমার কাছে?

অশ্রু আর বুকের মধ্যে চেপে রাখতে পারে না। কিছুতেই না। অবোধ শিশুর মত অশ্রু দু-হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে অনাদিদাকে। বলে, স্যার, ওরা সবাই আমাকে ঠাট্টা করে।

—কেন?

হাউ হাউ করে কাঁদতে কাঁদতেই ও বলে, আমি নাকি আপনাকে ভালবাসি। তাই……

অনাদিদাও দু-হাত দিয়ে ওকে জড়িয়ে ধরেন। ওর মাথার উপর নিজের মুখখানা রেখে অনাদিদা বলেন, তার জন্য কাঁদছ কেন? তুমি কি আমাকে ভালোবাসো না?

অশ্রু ওর বুকের মধ্যে মুখখানা লুকিয়ে রেখে কাঁদতে কাঁদতে বলে, হ্যাঁ স্যার, ভালবাসি; খুব ভালবাসি।

—আমি জানি। তাই তো তোমাকেও আমি ভালবাসি।

— সত্যি স্যার?

— হ্যাঁ অশ্রু, সত্যি তোমাকে ভালবাসি।

— শুধু আমাকেই ভালবাসেন স্যার?

—হ্যাঁ, শুধু তোমাকেই ভালোবাসি।

অশ্রু আনন্দে, খুশিতে, উত্তেজনায় পাগলের মত অনাদিদাকে জড়িয়ে ধরে। অনাদিদার লোমশ বুকের উপর মুখ ঘষতে ঘষতে বলে, আপনি খুব ভাল। আপনার মত মানুষ হয় না। আপনাকে আমি আরো, আরো অনেক ভালবাসব।······

গয়ার রেস্ট হাউসে বিছানার ওপর মুখোমুখি বসে অনাদিদার ভালোবাসার কাহিনী শুনছিলাম আর মনে মনে আমি চলে গেছি বহুদূরে। পূর্ব বাংলার বরিশাল জেলার ঘোলা মহকুমার পাতারহাট। কোনদিন যাইনি, হয়ত ভবিষ্যতেও কোনদিন যাব না। কিন্তু চোখের সামনে দেখছিলাম, সেই উদ্দাম, উত্তাল, অনন্তযৌবনা মেঘনাকে। পাতারহাটের গঞ্জ। এঁকে-বেঁকে আলোছায়ায় সবুজ শ্যামল ক্যানভাসের ওপর দিয়ে চলে গেছে যে পথ, সেটাই ডাইনে গিয়ে পৌঁছে যায় হিন্দু একাডেমীতে। স্কুল বাড়িটাও স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। লম্বা বারান্দার মাঝামাঝি হেডমাষ্টার মশায়ের ঘর, টিচার্স কমনরুম, লাইব্রেরী। তারপরই অনাদিদার ঘর।

ভাবতে গিয়েও একটু হাসি। সর্বত্যাগী বিপ্লবী অনাদিদার ঘর। ভাবভোলা অনাদিদার ঘর। কিন্তু ঘরের দিকে তাকিয়েই বুঝতে পারছি, এই ভাবভোলা বাউণ্ডুলের জীবনেও নিশ্চয়ই কোন অভয়া বা রাজলক্ষ্মীর আবির্ভাব হয়েছে।

হ্যাঁ, যা ভেবেছিলাম, ঠিক তাই। এই ভাঙ্গাচোরা অন্ধকার ঘরের এক কোণায় এক টুকরো জ্যোৎস্নার আলো। টুপ-টুপ করে গলে পড়ছে। ছড়িয়ে যাচ্ছে সারা ঘর। অনাদিদার মুখে। বুকে। প্রাণে। পাতারহাট গঞ্জের পাশের যমুনার মতই টল টল ঢল ঢল করছে তার যৌবন। রূপসী বাংলার নক্সী কাঁথার মাঠ সোজন বাদিয়ার ঘাটে তাকে দেখেছি বার বার বহুবার। দেখেছি আম, জাম, কাঁঠাল, অশ্বত্থ, হিজলের বনে, দেখেছি কাশ বনে, ভোরের কুয়াশায়, জোনাকির আলোয়। এরই নাম অশ্রু? আমাকে দেখে এত লজ্জা?

খুব জোরে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে অনাদিদা বললেন, তখন আমার ফাঁসির হুকুম হয়ে গেছে। আছি আলিপুর জেলে। হঠাৎ একদিন অশ্রু তার স্বামীকে নিয়ে হাজির। ভেবেছিলাম, খুব কাঁদবে কিন্তু না, এক ফোঁটাও চোখের জল ফেলল না।

অনাদিদা একটু থামেন। একবার বুক ভরে নিশ্বাস নিয়ে বলেন, অশ্রু কি বলল জানিস?

—কী ?

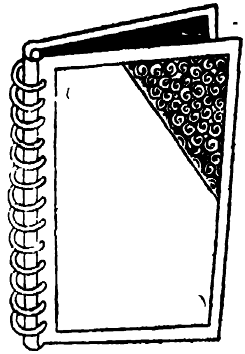
—বলল, না, অনাদিদা, তোমার ফাঁসি হতে পারে না। তুমি মরলে যে আমি বিধবা হবো। না, না, তা হতে পারে না। কিছুতেই না।

অনাদিদা থামলেন। আমিও কোন প্রশ্ন করি না। দুজনেই চুপ করে বসে থাকি। মনের মধ্যে এত কথা, এত স্মৃতি আনাগোনা করে যে কেউই কথা বলতে পারি না।

হঠাৎ বেয়ারা এসে ডাকল, সাব খানা তৈয়ার।

স্বপ্ন ভঙ্গ হল অনাদিদার। বোধহয় আমারও। ওঁর মুখে একটু ম্লান হাসির আভা। বললেন, শুনলি আমার অশ্রুর কথা ?

মুখে কিছু বললাম না ; শুধু মাথা নেড়ে বললাম, হ্যাঁ।



দ্বন্দ্ব ? না ব্যাধি ?

কথায় বলে, কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরোয়। নেহাতই কথার কথা কিন্তু সত্যি সত্যি কেঁচো খুঁড়তে খুঁড়তে গিয়ে যদি সাপ বেরোয় ? তাহলে ?

বছরের পর বছর দিল্লীতে থাকার পরও জানতে পারিনি, ছাত্রজীবনের বন্ধু অনিলও বহুকাল দিল্লীবাসী। তারপর একদিন বিজ্ঞান ভবনের এক অনুষ্ঠানে হঠাৎ আমাদের দেখা। যুগপৎ বিস্ময় ও আনন্দ। কোন মতে কাজকর্ম সেরে সেদিন সন্ধ্যার পরই হাজির হলাম ওর বাড়ি।

গাড়ি থেকে নামতেই কানে এল বাংলা গান। গেট খুলে লন পার হয়েই দেখি, বারান্দায় একটা ইজি চেয়ার, চেয়ারে একজন মহিলা বসে আছেন। মনে হল, এই বোধহয় অনিলের স্ত্রী। বারান্দায় পা দিয়েই জিজ্ঞাসা করলাম, অনিল আছে ?

আশ্চর্য। উনি কোন জবাব দিলেন না।

এবার একটু জোরেই জিজ্ঞেস করি, অনিল আছে ?

উনি তখনও নিরুত্তর, নির্বিকার। আর আমি ? শুধু বিস্মিত না, স্তম্ভিতও। বোধহয় একটু বিরক্তও।

হঠাৎ এক ভদ্রলোক বাড়ির ভিতর থেকে বেরুতেই আমি বললাম, অনিল আছে ?

উনি হেসে বললেন, উনি উপরে থাকেন।

—সরি ! আপনার ঘরে বাংলা গানের রেকর্ড চলছে ভেবে মনে হল অনিল এই ফ্ল্যাটেই……

ওঁর আবার হাসি। বললেন, না, না, তাতে কি হয়েছে। আমি ওকে ডেকে দিচ্ছি।

উনি ডাকতেই অনিল প্রায় লাফিয়ে লাফিয়ে নীচে নামল। আমাদের পরিচয় করিয়ে দিল। মিঃ চৌধুরীকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি দোতলায় অনিলের ফ্ল্যাটে গেলাম। পরিচয় হল সুচিত্রার সঙ্গে।

যেমন অনিল, তেমন সুচিত্রা। দুজনেই প্রাণ খুলে হাসতে পারে। খুব ভাল লাগল। সঙ্গে সঙ্গে সংশয়ের অবসান। অনিল আমার বন্ধু হলেও ম্যাঞ্চেস্টার থেকে ইঞ্জিনীয়ারিং পাশ করে দেশে-বিদেশে কয়েকটি বিখ্যাত প্রতিষ্ঠানে চাকরি করার পর এখন একটা আধা বিলেতি প্রতিষ্ঠানের আঞ্চলিক অধিকর্তা। সুতরাং ওর স্ত্রী শুধু সুন্দরী ও শিক্ষিতাই নয়, অহংকারী ও আত্মকেন্দ্রিক হলেও বিস্মিত হবার কোন কারণ ছিল না। আমি হাসতে হাসতেই অনিল আর সুচিত্রাকে এই আশংকার কথা বললাম।

সুচিত্রা মুখ টিপে হাসতে হাসতে বলল, এত যখন আশা, তখন আমি আপনার সঙ্গে অহংকারী-আত্মকেন্দ্রিকের মতই ব্যবহার করব।

অনিল সঙ্গে সঙ্গে বলল, যে মেয়ে দু-মিনিট পর পরই হো হো করে হেসে ওঠে, সে আবার……

আমি সুচিত্রাকে বললাম, আপনাব এই প্রাণখোলা হাসিটুকু যেন কোনদিন হারিয়ে না যায়।

অনিল বলল, আবে। তুই ওকে আপনি বলছিস কেন ?

—কেন ? বলব না ?

—একদম না। ওকে মাথায় তুললে তোকে পাগল করে দেবে।

—কেন ? তুই কী ওকে মাথায় তুলে পাগল হয়েছিস ?

অনিল হাসতে হাসতে বলল, তুই তা এখনও বুঝতে পারিস নি ?

সুচিত্রা হাসতে হাসতে বলে, আমাকে দেখেই তো ও পাগল হয়ে গেল। মাথায় চড়ার সুযোগ দিল কোথায় ?

দিল্লীতে আমার অনেক আকর্ষণ কিন্তু এদের দুজনকে পাবার পর আমার অন্য সব আকর্ষণ অনেকটা ম্লান হয়ে গেল। রোজ সম্ভব হয় না কিন্তু প্রায়ই যাই। সময় পেলেই যাই। যখন-তখন যাই। ওদের কাছে যাতায়াত করতে করতে

একতলার মিঃ চৌধুরীর সঙ্গেও আলাপ হয়েছে বেশ ভালভাবে। মিঃ চৌধুরীও গুণী লোক। ভাল ছাত্র হিসেবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে খ্যাতি ছিল। এখন একটা বিখ্যাত ব্যাংকের রিজিওন্যাল ম্যানেজার। দোতলায় ওঠা-নামার সময় মিঃ চৌধুরীর সঙ্গে কথাবার্তা গল্পগুজব হয় কিন্তু কোনদিন ওর স্ত্রীর সঙ্গে কথা হয়নি। উনি যেন সব সময় আপন মনে কত কি ভাবছেন। তবে ওদের একমাত্র মেয়ে রিনির সঙ্গে আমার খুব ভাব। সুচিত্রার খুব অনুরক্ত।

সুচিত্রা একদিন কথায় কথায় বলল, আপনি আর রিনি না থাকলে আমি বোধহয় সত্যি পাগল হয়ে যেতাম।

—কেন ?

—দেখুন দাদা, নিজের ছেলেমেয়ে হল না। তারপর আপনার বন্ধুকে তো দেখছেন। প্রত্যেক মাসে অন্তত দিন দশেক বাইরে বাইরে কাটায়। দিল্লীতে থাকলেও দশ-বারো ঘণ্টা বাড়ির বাইরে কাটায়।......

—হ্যাঁ, তাইতো দেখছি।

সুচিত্রা আবার বলে, পাড়ায় বাড়ি বাড়ি ঘুরে আড্ডা দিতে বিশেষ ভাল লাগে না। তাছাড়া এ পাড়ায় ক'জনই বা বাঙ্গালী ?

—কিন্তু তোমার নীচেই তো বাঙ্গালী।

চৌধুরীদা সত্যি খুব ভাল লোক। তাছাড়া প্রচুর পড়াশুনা। কথা বলে সত্যি আনন্দ পাই কিন্তু উনিও তো ব্যস্ত। বাড়িতে যেটুকু সময় থাকেন তা রিনিকে দেখাশুনা করতেই লেগে যায়।

—আচ্ছা ওঁর স্ত্রী......

—রেখাদিকে দেখে সত্যি অবাক হয়ে যাই। ওঁর মত সুন্দরী আজকাল প্রায় চোখেই পড়ে না।

—সত্যি, ওঁকে দেখতে খুব ভাল।

সুচিত্রা একটু হেসে বলে, চৌধুরীদার কাছেই শুনেছি, উনি ইউনিভার্সিটিতে পড়ার সময় কত অধ্যাপক আর ছাত্র যে ওঁর প্রেমে হাবুডুবু খেতো তার ঠিক-ঠিকানা নেই।

—তাই নাকি ?

—হ্যাঁ দাদা। চৌধুরীদাও তো ওঁর সমসাময়িক, তাছাড়া উনি আজেবাজে কথা বলার মানুষ না।

—মিসেস চৌধুরী কি এম-এ পাশ ?

—শুধু পাশ? ফার্স্ট ক্লাশ ফার্স্ট!

—আচ্ছা!

—তবে কী? উনি কলকাতার কোন একটা কলেজে লেকচারারও ছিলেন।

—আচ্ছা স্থচিত্রা, উনি সব সময় অমন চুপ করে বসে থাকেন কেন? ওঁর কি শরীর খারাপ? নাকি কারুর সঙ্গে কথাবার্তা বলা পছন্দ করেন না?

—ওঁর কোন শারীরিক অসুস্থতা নেই, তবে উনি স্বাভাবিকও না।

—হ্যাঁ, তাই মনে হয়।

—আপনি শুনলে অবাক হবেন যে, আজ তিন বছর আমরা এই বাড়িতে আছি। এই তিন বছরের মধ্যে উনি একদিনও আমাদের ফ্ল্যাটে আসেন নি।

আমি অবাক হলাম না। প্রশ্ন করলাম, তোমার সঙ্গে কথাবার্তা বলেন?

—কদাচিৎ কখনও দু-একটা কথা। তাও শুধু রিনির ব্যাপারে। রিনি আছে কিনা, রিনি কী করছে বা ওকে পাঠিয়ে দিন—এই ধরনের দু-একটা কথার বেশি কিছু বলেন না।

—ওঁদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কোন······

স্থচিত্রা মাথা নেড়ে বলল, কোন সম্পর্ক নেই। কতকাল যে ওরা কথাবার্তা বলেন না, তাও ঠিক নেই। তাছাড়া চৌধুরীদাকে দেখে মনে হয় না, উনি স্ত্রীকে কোন দুঃখ দিয়েছেন বা দিতে পারেন।

আমি একটু হেসে বললাম, স্থচিত্রা, এ সংসারে কোন মানুষের মনে কি রাগ, দুঃখ, অভিমান জমা আছে, তা বাইরে থেকে বোঝার কোন উপায় নেই।

মাস ছয়েক পরের কথা। দিন পনের বাইরে কাটিয়ে সেদিন সকালেই দিল্লী ফিরেছি। অনিলকে ফোন করলাম। বলল, আমিও কাল মাদ্রাজ থেকে ফিরেছি। আজ অফিসে বিশেষ কাজ করার ইচ্ছে নেই। তাড়াতাড়ি চলে আসব। তুইও চলে আয়।

স্থচিত্রা বলল, আস্থন, আস্থন। আড্ডা না দিয়ে হাঁপিয়ে উঠেছি।

—আমিও হাঁপিয়ে উঠেছি। পার্লামেণ্টে এক চক্কর মেরেই আসছি।

যত তাড়াতাড়ি পার্লামেণ্ট থেকে বেরুব বলে আশা করেছিলাম, তা হল না। অনিলের বাড়িতে যখন পৌঁছলাম তখন প্রায় সওয়া চারটে। গাড়ি থেকে নামতেই দেখি, মিসেস চৌধুরী বারান্দায় যথারীতি ইজি চেয়ারে বসে আছেন।

গেট খুলে লনে পা দিতেই মিসেস চৌধুরী বললেন, দাদা, শুনুন।

আমি প্রায় চমকে উঠলাম। কোন মতে সামলে নিয়ে বারান্দায় আসতেই উনি ইজি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, আসুন।

আমি নিঃশব্দে ওকে অনুসরণ করে ড্রইংরুমে ঢুকতেই উনি আমার মুখোমুখি দাঁড়িয়েই গলার হার খুলে আমার দিকে এগিয়ে দিযে বললেন, এটা বিক্রী করে দিতে হবে কিন্তু কেউ না জানে।

— কিন্তু আমি তো জানি না দিল্লীতে কোথায় পুরনো গহনা বিক্রী হয়।

— তা জানি না। আপনাকে এ উপকার করতেই হবে। আমার টাকার খুব দরকার। টাকা না হলে আমি না খেয়ে মরব।

আমি হেসে বললাম, আপনি এসব কী বলছেন ?

—ঠিকই বলছি। চৌধুবী আমাকে খেতে দেয় না। ও আমাকে মেরে ফেলতে চায়।

—তাই কী কখনও সম্ভব ?

—আপনি ওকে চেনেন না দাদা। যাই হোক, আপনি এই হার নিন। আমার টাকা চাই।

অনেক বুঝিয়েও লাভ হল না। শেষ পর্যন্ত আমি পার্স থেকে দুশো টাকা বের করে ওর হাতে দিয়ে বললাম, এটা রেখে দিন। পবে আমাকে দিয়ে দেবেন।

মিসেস চৌধুরী টাকা নিয়ে বললেন, ঠিক আছে। এ টাকা নিচ্ছি কিন্তু কেউ না জানে। আপনার বন্ধু বা তার স্ত্রীকেও বলবেন না।

—না, না, কাউকে বলব না।

দশ-পনের দিন পরই মিসেস চৌধুরী আমাকে টাকাটা ফেরৎ দিলেন কিন্তু চালু হল নিয়মিত লেনদেন। আগে সন্দেহ কবতাম, ওর মাথায় বোধহয় কোন গণ্ডগোল আছে কিন্তু এই লেনদেনের সময় কথাবার্তা বলে বুঝলাম, ওর মনে নানা রকমের দ্বন্দ্ব থাকলেও কোন মানসিক ব্যাধি নেই। আবার সন্দেহ হয়, এই দ্বন্দ্বই কোন ব্যাধি নয তো ?

আরো কয়েক মাস পার হল।

লনে ঢুকতেই মিসেস চৌধুরী আমাকে ইসারায় ডাক দিলেন। ড্রইংরুমে ঢুকেই দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে বললেন, দাদা, আপনি সাধারণ অফিসার না, একে সাংবাদিক, তার উপর লেখক। আপনি বুঝবেন, তাই বলছি।

আমি অবাক বিস্ময়ে ওর দিকে তাকিয়ে আছি।

উনি বললেন, জানেন দাদা, রিনি আমার মেয়ে না।

—কী বলছেন আপনি ?

—হ্যাঁ দাদা, ঠিকই বলছি। সন্তান……

—রিনি আপনার গর্ভে হয়নি ?

—হ্যাঁ, আমার গর্ভেই হয়েছে কিন্তু সন্তান জন্ম দেবার ক্ষমতা চৌধুরীর নেই।

—অসম্ভব। রিনিকে দেখতে ঠিক ওর বাবার মত।

—তা হতে পারে কিন্তু……

—না, না, এ অসম্ভব। যে কোন অন্ধও বলবে, রিনি চৌধুরী সাহেবের মেয়ে।

বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের মত মিসেস চৌধুরী আমাকে চমকে দিয়ে হঠাৎ দু-হাত দিয়ে দু-দিক থেকে ব্লাউজটা টেনে ছিঁড়ে ফেলে বললেন, দেখুন, দেখুন, দাদা, আমাকে দেখে কেউ বলবে না আমি বিবাহিতা, আমি স্বামীর সহবাস করি। বিশ্বাস করুন, আমি আজও কুমারী আছি।

আমি মুহূর্তের জন্য বিস্মিত হতবাক হয়ে গেলাম। তারপর মুহূর্তেই ঘর থেকে ছিটকে বেরিয়ে আসতে আসতেই কথাগুলো শুনলাম।

এরপর অনিলের ওখানে গেলেও মিসেস চৌধুরীর সঙ্গে আমার আর কোন কথা হয়নি। মাস দুই পরেই চৌধুরীসাহেব বদলি হলেন বোম্বে।

দিন পনের পরেই সুচিত্রা আমায় একটা খাম দিয়ে বলল, দাদা, আপনার এই চিঠিটা আমাদের ঠিকানায় এসেছে।

খুলে দেখি, মিসেস চৌধুরীর চিঠি।……

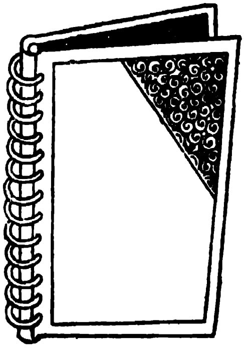
দাদা, এ চিঠি পেয়ে অবাক হবেন জানি। হয়তো এ চিঠি লেখা অন্যায় না হলেও অনুচিত, কিন্তু তবু না লিখে পারছি না। আমার মনের মধ্যে অনেক দ্বন্দ্ব, অনেক জিজ্ঞাসা। হয়ত অনেক দুঃখ, অভিমানও জমে আছে মনের মধ্যে। এসব কাউকে বলার না, লেখার না। মেয়েদের কাছে মা অনেক কাছের মানুষ, বিবাহিতার সব চাইতে ঘনিষ্ঠ হয় স্বামী কিন্তু দুঃখের বিষয় আমার মা বা স্বামী আমার আপনজন হলেও কাছের মানুষ না, ঘনিষ্ঠও না। এ সংসারে মানুষ তার চরমতম গোপন কথাটিও সবার কাছ থেকে লুকিয়ে রাখতে পারে না, চায় না। কাউকে না কাউকে মনের কথা বলতেই হয়। মনের কথা না বলার অস্বস্তি কী কম ?

দাদা, আপনি সাংবাদিক-সাহিত্যিক। শিক্ষা জগতের সঙ্গে হয়ত আপনার

বিশেষ যোগাযোগ নেই; তবু আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন অর্থনীতিবিদ্ ডক্টর নিরোদরঞ্জন চৌধুরীর নাম নিশ্চয়ই শুনেছেন। আমার স্বামী তাঁর ভ্রাতৃবধূর সন্তান কিন্তু ভ্রাতুষ্পুত্র নয়; আমার স্বামী ডক্টর চৌধুরীরই সন্তান। আমার তথাকথিত শ্বশুরমশায়ের সঙ্গে আমার স্বামীর কোন মিল নেই; না চেহারায়, না স্বভাব-চরিত্রে। আর আমি? আমি কে? যে নপুংশককে সমাজ আমার পিতৃদেব বলে জানে তিনি হাইকোর্টে প্র্যাকটিশ করলেও ডক্টর চৌধুরীর বন্ধু। আমার মাতৃদেবী ডক্টর চৌধুরীর অধীনে গবেষণা করেন এবং সে সময়ই ঐ আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন অর্থনীতিবিদের অশেষ কৃপায় আমার মাতৃদেবীর গর্ভ ধন্য করে আমার জন্ম হয়।

বিয়ের আগে আমার জন্মরহস্য আমি জানতাম কিন্তু জানতাম না চৌধুরী পরিবারের কাহিনী। বিয়ের কয়েক দিন পরই মৃতা শাশুড়ির বাক্সপত্তর ঠিকঠাক করতে গিয়ে এক বাণ্ডিল চিঠি হাতে পড়ে। সে চিঠিগুলি পড়ে আমার প্রায় মাথা খারাপ হবার উপক্রম। কিছুকাল পরে ডাক্তার বললেন, আমি অন্তঃসত্ত্বা। বলুন দাদা, চৌধুরী কী আমার ভাই না? ওর সঙ্গে কী সহবাস করা যায়? প্রণাম নেবেন।

—রেখা



নটবর মালাকার

সব সময় সব কথা মনে পড়ে না। কারুরই মনে পড়ে না। অতীত দিনের অনেক সুখের কথা, দুঃখের কথা চাপা পড়ে নতুন স্মৃতির পলিমাটির তলায়। অনেক কথা, অনেক কাহিনী হারিয়ে যায়। মুছে যায় মন থেকে। একদিন যে কথা, যে সুখ দুঃখের অনুভূতি সমস্ত মন আচ্ছন্ন করেছিল, তাও হারিয়ে যায়।

তবে ব্যতিক্রম আছে। ঘটনা এবং ব্যক্তি—দুয়েরই ব্যতিক্রম আছে। কিছু ঘটনা, কিছু আনন্দ-বেদনার স্মৃতি কিছুতেই ভুলতে পারা যায় না। অনেক সময় একটা ঘটনার সঙ্গে জড়িত পাঁচজনের চারজনই তা ভুলে যান ; ভুলতে পারেন না একজন। ঐ একটা ঘটনার স্মৃতির জ্বালা নিয়েই তিনি বাকি জীবন কাটান।

মধ্য কলকাতার অলি-গলির জট ছাড়িয়ে বড় রাস্তায় পড়লেই ডানদিকে মদন দার ষ্টেশনারী দোকান। তার পাশেই লালজীর মুদি আর পীতাম্বরের পান-বিড়ি-সিগারেটের দোকান। তারপর কবিরাজ মশায়ের ঘর। আরো কত কি! বাঁদিকে প্রথমেই নাড়ুবাবুর সোনা-রূপার দোকান আর চাঁদসীর ওষুধের দোকান। এর পরই নটবরের ফুলের দোকান। তার পাশে এক হোমিওপ্যাথ ডাক্তারের চেম্বার। তারপর তিন-চারটে ফুলের দোকান।

এ পাড়ার অধিকাংশ লোকই মদনদার ষ্টেশনারী দোকানের খদ্দের। ছেলে-মেয়ে, যুবক-যুবতী, বুড়ো-বুড়ি সবার কাছেই মদনদা খুব জনপ্রিয়। কারণ আছে। ওকে দেখতেও যেমন সুন্দর, ব্যবহারও সেই রকম ভাল। দোকানে কোন জিনিস

না থাকলেও মদনদা তা আনিয়ে খদ্দেরদের বাড়ি পাঠিয়ে দেবেন। সব সময়। কোন সময় ভুল হবে না। লালাজীর মুদির দোকানও খুব জনপ্রিয়। এ পাড়ার বারো আনা বাসিন্দাই ওর খদ্দের। বহুদিনের দোকান। সবার সঙ্গেই ওর পরিচয়। নগেনবাবু স্কুলের নীচু ক্লাশে পড়ান। সামান্য মাইনে। বড্ড টানা-টানির সংসার। বড় মেয়ের বিয়ে কোনমতে দিতে পারলেও মেজ মেয়ের বিয়ের সময় খুবই বিপদে পড়লেন। বিপদ উদ্ধার হল শুধু নাতুবাবু আর লালাজীর জন্য। পান-বিড়ি-সিগারেট বিক্রী করেও পিতাম্বর যে এত জনপ্রিয় কী করে হল, তার কারণ আছে। এ পাড়ার সব ছেলেছোকরাই পীতাম্বরের সক্রিয় সাহায্যে ও সহযোগিতায় বিড়ি-সিগারেট খাওয়া শিখেছে। এক-কালের ছেলেছোকরারাই এখন বাপ-জ্যাঠা। এদের ছেলেরাও পীতাম্বরের কাছ থেকে সমান সাহায্য ও সহযোগিতা পাচ্ছে। চাঁদসীর ওষুধের দোকানে এ পাড়ার দু-চারজন বৃদ্ধ নিয়মিত আড্ডা দিলেও হোমিওপ্যাথ ডাক্তারের সঙ্গে এখানকার কারুর সদ্ভাব নেই।

মদনদার ষ্টেশনারী, লালাজীর মুদি বা পীতাম্বরের পান-বিড়ি-সিগারেটের দোকানের মত নাতুবাবুর সোনার দোকানে বা নটবরের ফুলের দোকানে কেউই নিয়মিত যায় না। যাবার কারণ নেই, প্রয়োজনও নেব কিন্তু অন্নপ্রাশন-বিয়ে-পৈতের সময় এ পাড়ার সবাই ওদের কাছে যাবেনই। আমাদের গলির ঠিক মুখেই বোসদের তিনতলা বাড়ি। বেশ বনেদী বড়লোক। ছোট কর্তার ছোট ছেলে শ্যামলদা সৌখীন মানুষ। পনের-কুড়ি জোড়া জুতা ব্যবহার করেন। করবেন না কেন? আয়ও করেন যথেষ্ট। শ্যামলদার স্ত্রী মীরাবৌদির রূপ-গুণের খ্যাতি আছে এ পাড়ায়। শ্যামলদা প্রত্যেক বছর বিবাহ-বার্ষিকীতে মীরাবৌদিকে বিশেষ কিছু দেবেনই। আমরা শ্যামলদার বিয়ে-বৌভাতের নেমন্তন্ন খেয়েও ভুলে গেছি, তেসরা ফেব্রুয়ারী ওর বিয়ের তারিখ কিন্তু নাতুবাবু কখনই ভোলেন না। ডিসেম্বরের শেষে বা জানুয়ারীর গোড়াতেই উনি শ্যামলদাকে দেখেই বলবেন, শ্যামল, তেসরা ফেব্রুয়ারী তো এসে গেল। গত দু-বছর তো বৌমাকে অন্য জিনিস দিয়েছ; এবার কি আমি কিছু তৈরী করব?

শ্যামলদা হেসে বলেন, করুন কিন্তু বেশি দামী না হয়।

—এ তো বিয়ের গহনা নয়। বেশী দামী হবে কেন?

—নতুন ধরনের ডিজাইনের কিছু বানাবেন।

নাতুবাবু হেসে বলেন, সে তোমার চিন্তা করতে হবে না। বৌমার কোন ডিজাইনের কি কি গহনা আছে, সব আমি জানি।

শ্যামলদা শুধু বলেন, ঠিক আছে যা ভাল বোঝেন তাই করবেন ; তবে আগে থেকে কেউ না জানে।

নাড়ুবাবু দাঁত দিয়ে জিভ কামড়ে বলেন, মাথা খারাপ !

নাড়ুবাবুর সোনার দোকানের মত নটবরের ফুলের দোকান। এ পাড়ায় যখন যার ফুলের দরকার, তা শুধু নটবরের দোকান থেকেই আসবে। সাত নম্বর বাড়ির প্রমথ উকিল এ পাড়ার শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি। পাড়ার লোকদের সাহায্য করতে সব সময় এগিয়ে আসেন। ওঁরা স্বামী-স্ত্রী দুজনেই রামকৃষ্ণ ভক্ত। প্রমথ উকিলের স্ত্রীকে আমরা সবাই বড়মা বলি। সেই বড়মা নিজে দোকানে গিয়ে বলবেন, নটবর, সামনের সোমবার ঠাকুরের জন্মতিথি।

বড়মা আর কিছু বলার আগেই নটবর এক গাল হাসি হেসে বলেন, বড়মা, সেকথা কী আমাকে মনে করিয়ে দেবেন ? জ্ঞান হবার পর থেকেই তো দেখে আসছি, ঠাকুরের জন্মদিনে বাবা নিজে মাথায় করে ফুল পৌঁছে দিতেন। বাবা মারা যাবার পর থেকে আমি নিজে নিয়ে যাই। তারপর পেট পুরে পেসাদও খেয়ে আসি। কোনদিন কী আপনাদের বলতে হয়েছে ?

বড়মা হেসে বলেন, সবই জানি। তবু যদি ভুলে যাও, তাই ‥ ‥

—না বড়মা, এমন ভুল কোনদিন হবে না।

সত্যি, নটবরের এমন ভুল হয় না।

সরকার বাড়ির অন্নপূর্ণা পূজার কথা, উকিল বাড়ির ঠাকুরের জন্মদিনের কথা বা নাড়ুবাবুর বাড়ির লক্ষ্মীপূজার কথা নটবরকে বলে দিতে হবে না। উনি ঠিক সময় ফুল পৌঁছে দেবেই।

ছোটবেলা থেকেই এইসব দোকানদারদের সঙ্গে আমার পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা। এঁদের হয়ত ভক্তি-শ্রদ্ধা করি না কিন্তু ভালবাসি। পাড়ার লোকজনের সুখ-দুঃখের সঙ্গে এঁরা সবাই এমন করে জড়িয়ে পড়েছেন যে সবাই এঁদের ভালবাসেন।

নটবর সামান্য একটা ফুলের দোকানের মালিক হলেও আমি ওঁকে দাদা বলে ডাকি। নটবরদা। বরাবর। সেই ছোটবেলা থেকে। তখন নটবরদার বাবাও বেঁচে। তবে বুড়ো হয়েছেন। স্কুল থেকে ফেরার পথে মাঝে মাঝেই ওঁদের দোকানের সামনে দাঁড়াই। অবাক হয়ে দেখি, মালা তৈরী, তোড়া বানান। বিয়ের মরশুমে ফুলের গহনা বানান দেখতে খুব মজা লাগত। মনে মনে ভাবতাম, আমার বিয়ের সময়ও .....

কখনও নটবরদা, কখনও ওঁর বাবা কাজ করতে করতেই আমাকে দু-একটা ফুল

দিতেন। আমি আর দেরী করতাম না। প্রায় নাচতে নাচতে বাড়ি ফিরতাম।

আমি একটু বড় হবার পর নটবরদার বাবা মারা গেলেন। তারপর থেকে নটবরদা একলাই দোকান চালান। স্কুল-কলেজে মাতব্বর হবার পর আমি সব সময় সব অনুষ্ঠানের জন্যই নটবরদার কাছে গেছি। ফুলের ব্যাপারে আমি আর কারুর কথা ভাবতে পারতাম না।

মানুষ হিসেবেও নটবরদাকে সব সময় একটু স্বতন্ত্র মনে হতো। মাঝে মাঝেই সন্ধ্যের পর ওঁকে কিছু ফুল-মালা নিয়ে আমাদের গলিতে ঢুকতে দেখতাম। জিজ্ঞেস করি, কোথায় চললেন নটবরদা ?

– এই ভাই যাচ্ছি বড়মার কাছে।

—কেন ? আজ আবার কোন উৎসব আছে নাকি ?

—না, কোন উৎসব নেই। নটবরদা আমার সামনে দাঁড়িয়ে মাথা নেড়ে বলেন, জানো তো ফুল কখনও নষ্ঠ করতে নেই। কিছু ফুল বেঁচে গেছে। তাই ভাবলাম, নষ্ট না করে বড়মাকে দিয়ে আসি ঠাকুরকে দেবার জন্য।

রোজ রোজ কী সব ফুল বিক্রী হয় ? না, হয় না। অন্য দোকানদারের মত তাজা ফুলের সঙ্গে বাসী ফুল মিশিয়ে তোড়া বা মালা তৈরী করে বিক্রী করেন না নটবরদা। কোনদিনই না। উনি বলেন, কত লোকে কত কারণে ফুল নিয়ে যাচ্ছে। হয়ত পূজা করবে। বাসী ফুল দিয়ে কী পূজা হয় ? নটবরদা হেসে বলেন, বাসী ফুল দিয়ে পূজা হয় না। হলেও ফল দেয় না। খদ্দেরকে ফাঁকি দিয়ে বিক্রী করতে পারি কিন্তু পাপের বোঝা তো আমাকেই বইতে হবে।

আমি ওঁর কথা শুনে অবাক হই।

নটবরদা মুহূর্তের জন্য চোখ বন্ধ করেন। হয়ত স্মরণ করেন কোন দেবতাকে বা মন্ত্রদাতা গুরুদেবকে। তারপর বলেন, অজ্ঞানে কত পাপ করছি, তার ঠিক নেই। সজ্ঞানে আর পাপ করতে চাই না।

পূজা আর বিয়ে-বৌভাতের ফুলমালা দিতে নটবরদার খুব উৎসাহ। বিয়ের দিন দশেক আগেই দুলাল ওঁর দোকানে গিয়ে বললো, নটবরদা, সামনের এগারই দাদার বিয়ে।

নটবরদা সঙ্গে সঙ্গে মুখ তুলে ক্যালেণ্ডারের দিকে তাকিয়ে বলেন, এগারই মার্চ নাকি।......

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, এগারই মার্চ।

—বিয়ে কি কলকাতায় হবে ? নাকি দূরে যেতে হবে ?

নটবরদা সব সময় এসব খবর জেনে নেন। কারণ আছে। যে ফুলের মালা গলায় দিয়ে কলেজ স্ট্রীট থেকে শ্যামবাজার-বাগবাজর গিয়ে বিয়ে করা যায়, সে মালায় বর্ধমানে গিয়ে বিয়ে করা যায় না। ফুল আলাদা হবে।

দুলাল বলে, না, না, দূরে যেতে হবে না। এই শ্যামবাজারের পাশে কাঁটা-পুকুরেই বিয়ে হবে।

—ভালই হল।

বৌভাত কিন্তু শুক্রবার হচ্ছে না, শনিবার হবে।

নটবরদা এক গাল হাসি হেসে বলেন, ঠিক আছে ; কোন চিন্তা নেই। এ তো যার তার বিয়ে নয়, এ আমাদের বিজয়ের বিয়ে। কিছু একটা ইস্‌পেশ্যাল না করলে ও আমার মাথা খেয়ে ফেলবে না !

দুলাল ওঁর কথা শুনে হাসে।

—হাসছিস কেন ? আমি ঠিক কথাই বলেছি। আর পাঁচজনে যা পেলে খুশি হবে, বিজয়কে তা দিয়ে খুশি করা যাবে না।

দুলাল হেসে বলে, তা ঠিক।

হঠাৎ নটবরদা উঠে দাঁড়িয়ে আলমারির মাথার উপর থেকে একটা খাতা নিয়ে বলেন, দুলাল, তোর বৌদির কি নাম বলতো। লিখে রাখি।

—মঞ্জু।

নটবরদা খাতায় বিজয়ের স্ত্রীর নাম লিখতে লিখতে বলেন, বৌভাতের দিন কিছু একটা ইস্‌পেশ্যাল করতেই হবে।

দাদার বিয়ে। দুলালের অনেক কাজ। আর দাঁড়াতে পারে না। বলে, নটবরদা আমি যাচ্ছি।

—আচ্ছা যা।

দুলাল দু-এক পা এগুতেই নটবরদা একটু গলা চড়িয়ে বলেন, বিজয়কে বলে দিস, বৌভাতের দিন আমি কিন্তু শুধু মাছ আর দই মিষ্টি খাব।

দুলাল থমকে দাঁড়িয়ে পিছন ফিরে তাকিয়ে হাত নেড়ে জানায় নিশ্চয়ই বলব।

সত্যি বিজয়ের বৌভাতের দিন নতুন বউয়ের বসার জায়গা নটবরদা এমন সুন্দর সাজাবার ব্যবস্থা করেছিলেন যে সবাই মুগ্ধ। বিজয় মহা খুশি। নটবরদা বললেন, ইচ্ছে ছিল আরো কিছু করার কিন্তু সময় পেলাম না। তাছাড়া হাতের কাজ দিন দিন খারাপ হয়ে যাচ্ছে।

কে একজন প্রশ্ন করল, কেন ?

—খারাপ হয়ে যাবে না ? আমরা সবাই ব্যবসাদার হয়ে গেছি—কারিগর আর নেই। সত্যিকারের কারিগর টাকা পয়সার চাইতে ভাল হাতের কাজ করে অনেক বেশি আনন্দ পায়। তাছাড়া আজকাল খদ্দেররাও রুচি হারিয়ে ফেলছে।

নটবর মালাকার ফুলের দোকানের মালিক ছিল ; কারিগর ছিল। ফুল বিক্রী করেই তার সংসার চলত। তা হোক। নটবরদাকে কখনই ব্যবসাদার ভাবতে পারতাম না।

পূজা-পার্বন, বিয়ে-বৌভাতের কাজে যেমন উৎসাহ ছিল, তার দ্বিগুণ নিরুৎসাহ ছিলেন মৃতদেহ সাজাবার জন্য ফুল মালা বিক্রী করতে। অজানা অপরিচিত খদ্দেরদের কথা আলাদা। তারা ফুল মালা কেন কিনছে, একথা জানার অধিকার নেই কোন দোকানদারের। নটবরদাও কোন প্রশ্ন না করেই তাদের কাছে ফুল-মালা বিক্রী করতেন কিন্তু জানাশোনা কেউ মৃতদেহ সাজাবার জন্য ফুল কিনতে গেলেই ওঁর মুখখানা কালো হয়ে যেত। বলতেন, তোমরা বরং অন্য 'দোকানে যাও। যে ছেলেটার সঙ্গে রোজ আমার দেখা হতো, যে আমাকে দাদা বলে ডাকত তার মৃতদেহ সাজাবার ফুল আমাকে দিতে বলো না।

পাড়ার তিন চারজন ছেলে নটবরের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে। নটবরের কথা শুনে ওরা মুখ নীচু করে কি যেন ভাবে। সঙ্গে সঙ্গে কিছু বলতে পারে না। একটু পরে ওদের একজন বলে, কিন্তু নটবরদা, ও আপনার হাতের মালা পরে যত শান্তি পাবে, তা কী অন্য কোন······

ছেলেটিকে কথা শেষ করতে দেয় না নটবর। বলে, কিন্তু ভাই তোমরা আমার হাতের মালা নিলে যে আমি সারা রাত ঘুমোতে পারব না।

এই হচ্ছে নটবরদা। সাধে কী ওঁকে ভালবাসি ?

আবার মনে পড়ে প্রমথ উকিলের স্ত্রী আমাদের পাড়ার বড়মার মৃত্যুর কথা। নিত্যকার মত সেদিনও ভোরবেলায় উঠেছেন। স্নান করে পূজার ঘরে পরমপুরুষ রামকৃষ্ণের পূজা করেছেন। পূজার প্রসাদ স্বামী-পুত্র-পুত্রবধূ ও নাতি-নাতনীদের দেবার পর নিজেও সামান্য একটু প্রসাদ গ্রহণ করলেন। মিনিট দশেক পর সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামতে গিয়েই হঠাৎ মাথা ঘুরে পড়ে গেলেন। পাঁচ মিনিটের মধ্যে ডাঃ জগবন্ধু দে ছুটে এলেন। দেখলেন। বললেন, বড়মা আমাকে কিছু করার সুযোগটুকুও দিলেন না।

আগুনের মত খবর ছড়িয়ে পড়ল সারা পাড়ায়। মেয়ে-পুরুষ, কচি-কাঁচা,

বুড়ো-বুড়ী সবাই এলেন বড়মাকে দেখতে। সবার মুখেই এক কথা, এমন সতী-সাধ্বী আর হয় না! সত্যিকারের পুণ্যবতী না হলে ঠাকুর এমন করে কোলে তুলে নেন ?

খবর গেল নটবরদার কাছে। খবর শুনেই অবাক, বড়মা নেই? আহা-হা এমন স্নেহময়ী মা আর হয় না। সব বৃত্তান্ত শোনার পর বললেন, জন্ম জন্ম সাধনা না করলে কী এমন করে ঠাকুর টেনে নেন? তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, তোমবা যাও। আমি ঘণ্টা খানেকের মধ্যে সব ফুলটুল নিয়ে আসছি। বড়মাকে শেষবারের মত প্রণাম করে আশীর্বাদ নিতে হবে তো।

নটবরদার কথা ভাবতে গেলে কত কি মনে পড়ে। কলকাতা ছেড়ে দিল্লী যাবার পরও বছরে দু-একবার ওঁর সঙ্গে দেখা হতো। কলকাতায় এসে কোন কারণে শ্যামল বা বিজয়ের সঙ্গে দেখা করতে গেলেই নটবরদার কাছে গেছি। কত খুশি হতেন আমাকে দেখে। বারবার বলতেন, তোদের দেখলেও ভাল লাগে। তাছাড়া এত দূরে গিয়েও যে এই মুখ্যু নটবর মালাকারকে ভুলতে পারিস নি, সেকথা মনে করেও গর্ব হয়।

তারপর নানা কাজকর্মে, ব্যক্তিগত জীবনের ঘাত-সংঘাতে এত ব্যস্ত, এত বিব্রত হয়ে পড়লাম যে বহুদিন আর নটবরদার সঙ্গে দেখা করতে পারি নি। বছরে সাত-আটবার দিল্লী থেকে ছুটে এসেছি কলকাতা। কখনও সকালে এসে সন্ধ্যায় ফিরে গেছি, কখনও দু' তিনদিন থেকেছি। শ্যামল বা বিজয়ের সঙ্গে দেখা হয়েছে। কখনও আমার হোটেলে, কখনও অন্য কোন হোটেল-রেস্তরাঁয়। এইভাবেই বোধহয় বছর দশেক কেটে গেল।

সেবার নববর্ষের দিন কলকাতায় এসেছি। পরের দিন আমাদের পুরনো পাড়ায় আমার এক বাল্যবন্ধুর বিয়ে। বন্ধু ও তার বাবা-মা আমাকে দু-তিনটে চিঠি লিখেছেন। তাই ঠিক কবেছিলাম, ওর বিয়েতে বরযাত্রী যাব এবং বৌভাতের নেমন্তন্নও খাব। বহুকাল পর বরযাত্রী যাব বলে হোটেল থেকে জামাই সেজে বেরুলাম। মনে মনে ঠিক করলাম, নটবরদার দোকান থেকে কিছু ফুলটুল কিনব। তাই মোড়ের মাথাতেই ট্যাক্সি থেকে নেমে পড়লাম।

দু'পা এগিয়ে নটবরদার দোকানের সামনে হাজির হতেই আমি অবাক। স্তম্ভিত। নটবরদা ফল বিক্রী করছেন? ফুলের দোকান তুলে দিলেন? ফুলের ব্যবসায় কি সংসার চলছিল না? ফলের ব্যবসায় কী আয় বেশি? এক মুহূর্তের মধ্যে আমার মনে কত কি প্রশ্ন জাগল। কেন জানি না, নটবরদার কাছে যেতেও

আমার কেমন দ্বিধা হল, ভয় হল। তবু আস্তে আস্তে এগিয়ে গেলাম।

—নটবরদা, চিনতে পারছেন ?

আমার মুখের দিকে একবার ভাল করে তাকিয়েই একটু ম্লান হেসে বললেন, দিল্লী থেকে কবে এলি ?

—কাল।

—ক'দিন থাকবি তো ? নাকি ফুড়ুৎ করে উড়ে যাবি ?

—এবার দু-তিনদিন থাকব।

নটবরদা আর কোন প্রশ্ন করেন না। কেমন যেন শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে অন্যদিকে।

আমি প্রশ্ন করি, আপনি ফুলের ব্যবসা ছাড়লেন কেন ? ফুলের দোকান চালিয়ে কী সংসার চালান যাচ্ছিল না ?

নটবরদা খুব জোরে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, না ভাই ফুলের ব্যবসা বন্ধ করে দিলাম।

—কিন্তু কেন ?

—অনেক দুঃখে।

—কিসের দুঃখ ? ফুলের ব্যবসায় আবার দুঃখ কী ?

—আছে ভাই, আছে। মাঝে মাঝে এমন আঘাত আসে যা সবাই সহ্য করতে পারে না।

—তাছাড়া আপনার চেহারা কি হয়েছে ? হঠাৎ দেখলে আপনাকে অনেকে চিনতেই পারবে না।

নটবরদা একটু শুকনো হেসে বললেন, যে' নটবরদাকে তোরা চিনতিস, সে মরে গেছে।

আমি বাল্যবন্ধুর বিয়ের বরযাত্রী যাব বলে বেরিয়েছি কিন্তু কিছুতেই নটবরদাকে ছেড়ে যেতে পারছি না। বললাম, আপনার কি হয়েছে বলুন তো!

উনি এবার আমার দিকে সোজাসুজি তাকিয়ে বললেন, সত্যি শুনতে চাস ?

—হ্যাঁ।

—তাহলে শোন।

* * * *

গিরীন্দ্র ভবন এ পাড়ার সবাই চেনে। লোকের মুখে শোনা যায়, গিরীন্দ্রবাবুর বাবা বর্ধমান স্টেশনের পার্শেল অফিসের কুলি ছিলেন। গিরিনবাবু পার্শেল

অফিসের কোণায়, প্ল্যাটফর্মের ধারে রেল কোম্পানীর আলোয় পড়াশুনা করেই স্কলারশিপ নিয়ে এনট্রান্স পাশ করেন। তারপর এফ এ, বি এ, বি এল। তারপর আইন ব্যবসায় অসামান্য সাফল্য লাভ করেন।

এই গিরিনবাবুদের পাশের গ্রামের ছেলে নরহরি। প্রায় অনাহারে দিন কাটে। গিরিনবাবু ওকে নিয়ে এলেন কলকাতা। নরহরির দিন বেশ কেটে যায়। খাওয়া পরার দুঃখ নেই। দেশেও নিয়মিত কিছু পাঠায়। নরহরি মহা খুশি।

দেখতে দেখতে অনেকগুলো বছর কেটে গেল। গিরিনবাবু বেশ বৃদ্ধ। রোজ কোর্টে যান না। নরহরিরও বেশ বয়স হয়েছে। একদিন গিরিনবাবু নরহরিকে বললেন, হ্যাঁরে, আমার সঙ্গে সঙ্গে তো তোরও কোর্টে যাওয়া বন্ধ। আমি মরে গেলে করবি কী ?

—ওকথা মুখে আনবেন না বাবু।

গিরিনবাবু হেসে বলেন, ওরে আমি উকিল। ভেবেচিন্তে কাজ করা পছন্দ করি। তাই বলছিলাম, জাত ব্যবসাটা শুরু করে দে। হাজার হোক এটা কলকাতা শহর। একটা দোকান করে বসলে সংসারে খাওয়া পরার অভাব হবে না।

যা কথা, সেই কাজ। গিরিনবাবু নিজে মুহুরীবাবুকে বলে বড় রাস্তার উপর ঘর ঠিক করে দিলেন। নরহরি দেশ থেকে ছেলে হরিহরকে নিয়ে এল। তারপর এক শুভদিনে শুরু হল ফুলের ব্যবসা।

নটবরদা একটু থেমে বলেন, ঐ সরকার বাড়ির কৃপায় আমরা তিন পুরুষ বেঁচে আছি। এই কলকাতা শহরে আমরা তিন পুরুষ কোনদিন এক পয়সা বাড়ি ভাড়া দিলাম না। ইলেকট্রিকের খরচ কাকে বলে তাও জানলাম না।

আমি বললাম, হ্যাঁ, আপনারা তো ওদের বাড়িতেই থাকেন।

—আগে তো আমরা ঐ গিরিন ভবনেই থাকতাম। তারপর ওদের সংসার বড় হল, আমাদের সংসারও বড় হল, তাই পিছনের দোতলা বাড়িতে চলে গেলাম।

—হ্যাঁ, সেইরকমই শুনেছি।

নটবরদা একটু হেসে বলেন, যাক্‌গে সেসব। ও বাড়ির মেজবাবু আমার ছোটবেলার বন্ধু, তা জানো ?

—মেজবাবু মানে বসন্ত কাকা ?

—হ্যাঁ। আমরা দুজনে ছেলেবেলায় একসঙ্গে খেলাধূলা করেছি। আরো

মজার কথা শুনবে ?

—কী ?

—আমার বিয়ে হয় দশই বোশেখ, ওর বিয়েও দশই বোশেখ।......

—তাই নাকি ?

—হ্যাঁ, তবে ঠিক দু-বছর পর।

—আমার প্রথম দুটো মেয়ের পর যেদিন বড় ছেলে জন্মায়, মেজবাবুর বড় ছেলেও সেদিন জন্মায়।......

—আপনি গোপালের কথা বলছেন ?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, গোপাল আর আমার বড় ছেলে একই দিনে জন্মায়। নটবরদার মুখখানা হঠাৎ মলিন হয়ে যায়। বলে, বছর ঘুরতে না ঘুরতেই আমার ছেলেটা মারা গেল কিন্তু গোপালকে দেখে সে দুঃখ ভুলে যেতাম।

হঠাৎ নটবরদা একটু উত্তেজিত হয়ে বলেন, আজকাল তো আগের মত ফুলও পাওয়া যায় না।

—কেন ?

—কেন আবাব ? আজকাল যে ওষুধপত্র দিয়ে ফুলের চাষ করে। ফুল বেশি হয় কিন্তু গন্ধ কোথায় ?

মনে হল নটবরদা ঠিকই বলছেন। তাই বললাম, ঠিক বলেছেন নটবরদা, এখনকার ফুলে আর তেমন গন্ধ পাই না।

—কিন্তু ভাই, গোপালের বিয়েতে যেমন ভাল ফুল এনেছিলাম, সেইরকম ভাল মালা বানিয়েছিলাম। সবাই বলেছিল, হ্যাঁ, নটবর মালাকার কাজ জানে।

—তাই নাকি ?

—হ্যাঁ ভাই। রোজ যেমন ভাল ফুল পাই না, সেইরকম ভাল কাজও হয় না। হাতে ভাল ফুল পড়লে কাজ ও ভাল হয়।

—তা তো বটেই।

নটবরদা আবার হাসেন। বলেন, এমনই কপাল যে, যেদিনই মনের মতো মালা বানাতাম, সেদিনই গোপাল বা ওর বউ দোকানে আসত। মালাটা ওদের দিয়ে যে কী খুশি হতাম, তা বলতে পারব না।

আমি নটবরদার মনের অবস্থা বুঝতে পারি। বলি, সে তো খুবই স্বাভাবিক।

নটবরদা একটু থেমে বলেন, সেদিন বিয়ের লগ্ন ছিল। অনেকগুলো মালা

বানিয়েছিলাম কিন্তু দুটো মালা সত্যি খুব সুন্দর হল। অনেক খদ্দের এল কিন্তু ইচ্ছে করেই এমন দাম চাইলাম যে কেউ নিল না। মনে মনে ভাবলাম, যদি গোপাল বা ওর বউ আসে, তবে ওদের দেব। আর ওরা না এলে একটু বেশি রাত্তিরের দিকে বেচে দেব।

— ওরা এলো ?

নটবরদা খুব জোরে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, হ্যাঁ, গোপাল নিজেই এল। ও কিছু.বলার আগেই বললাম, তোদের জন্যই মালা দুটো বানিয়েছি।

— গোপাল কিছু বলল ?

—না। ও মালা দুটো নিয়েই চলে গেল। শুধু বলল, খুব ভাল করেছ।

—তারপর ?

—তারপর আর কি ভাই ? একটু পরেই দেখলাম, আমার তৈরি মালা গলায় দিয়েই গোপালের বউ নতুন বউ-এর মতো সেজে-গুজে ঘুমিয়ে রয়েছে।

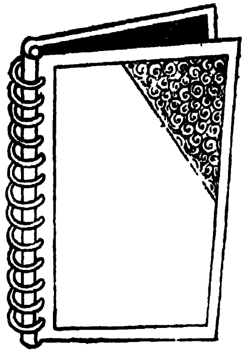
—অ্যাঁ !

- হ্যাঁ ভাই, আমার ঐ মালা গলায় দিয়েই উনি চলে গেলেন।

--ইস্ !

--সেদিন গোপালের বউ-এর মৃতদেহের সামনে দাঁড়িয়েই প্রতিজ্ঞা করলাম, না, আর ফুলের ব্যবসা করব না।

আমি সেদিন নটবরদার ওখান থেকেই ফিরে এলাম। বরযাত্রী গেলাম না। ইচ্ছা করল না।



ষ্টপওভার ঃ করাচি

ভারতীয় সাংবাদিকদের তখন পাকিস্তান যাবার ভিসা দেওয়া হতো না। তাই চাণক্যপুরীর পাকিস্তান হাই-কমিশনের দরজায় কোন আবেদনপত্র নিয়ে হাজির হইনি কিন্তু সব সময়ই পাকিস্তান যাবার একটা অদম্য ইচ্ছা মনের মধ্যে জমা ছিল। মনে হতো অমৃতসর থেকে মাত্র আধ ঘণ্টার পথ যে লাহোর তাকেও কী দেখতে পাব না? করাচীকে পাশে রেখে মধ্যপ্রাচ্যের কত দেশ ঘুরে চলে যাচ্ছি ইউরোপ। দেশে ফেরার পথেও করাচীর সঙ্গে লুকোচুরি খেলছি। তখনও সে বোরখা পরে নিজেকে ঢেকে রেখেছে।

সেবার কমনওয়েলথ প্রাইম মিনিষ্টার্স কনফারেন্স কভার করতে লণ্ডন গেছি। বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট বোধহয় ইচ্ছা করেই ভারতের প্রধানমন্ত্রী আর পাকিস্তানের প্রেসিডেণ্টকে ক্লারিজেস-এ রেখেছেন। তাই আমাকেও বার বার যেতে হয় ব্রুক স্ট্রীটের এই বিখ্যাত হোটেলে। ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর নানা কাজকর্মে সাহায্য করার জন্য আমাদের হাই-কমিশনের বেশ কয়েকজন কর্মী ও অফিসারকে দিনরাত ওখানে থাকতে হয়। পাকিস্তান প্রেসিডেণ্টকে সাহায্য করার জন্য পাকিস্তান হাই-কমিশনেরও অনেকে ওখানে। ভাগ্যক্রমে পাকিস্তান ফরেন সার্ভিস-এর কয়েকজন বাঙ্গালী অফিসারের সঙ্গে ক্লারিজেস-এ আমার বেশ আলাপ হলো। প্রথমে নেহাতই সৌজন্যমূলক কথাবার্তা; হয়ত সামান্য হাসিঠাট্টা। তারপর একটু ঘনিষ্ঠতা। সপ্তাহের শেষে প্রাইম মিনিষ্টার্স কনফারেন্স শেষ হতে না হতেই ওঁরা

আমার বন্ধুস্থানীয় হয়ে গেলেন। আয়ুব খান লণ্ডন ত্যাগ করার পরের দিনই নটিংহিল-এ হক সাহেবের বাড়িতে আমার নৈশভোজন।

ঐ নৈশভোজনে পাকিস্তান হাই-কমিশনের চার-পাঁচজন কূটনীতিবিদ সস্ত্রীক উপস্থিত ছিলেন। এ ছাড়াও বি বি সি-র দু-চারজন বাঙ্গালীও সস্ত্রীক আমন্ত্রিত ছিলেন। এক রাউণ্ড শেরী-শ্যাম্পেন-কনিয়াক-ভডকার পর শুরু হল গান। সবার আগে মাহমুদা বেগম গাইলেন অতুলপ্রসাদের 'মিছে তুই ভাবিস মন। তাই গান গেয়ে যা, গান গেয়ে যা আজীবন!' তারপর আরো কতজনের কত গান! ঐ গান-বাজনার মাঝে মাঝেই হাসিঠাট্টা-গল্পগুজব। হঠাৎ কি প্রসঙ্গে যেন করাচীর কথা উঠতেই আমি বললাম, দিল্লী ফেরাব পথে কটা দিন করাচীতে কাটাতে পারি না?

আমিন সাহেব বললেন, আপনাকে ভিসা দেওয়া যাবে না কিন্তু ভিসা ছাড়াও তো আটচল্লিশ ঘণ্টা আপনি থাকতে পারেন।

—তা তো জানি কিন্তু……

হকসাহেব বললেন, ওসব কিন্তু-টিন্তু ছাড়ুন; আপনি যান। আমরা সব ব্যবস্থা করে দেব।

আমি সোজাসুজি জিজ্ঞাসা করলাম, কোন বিপদে পড়ব না তো?

ওরাও সোজাসুজি উত্তর দিলেন, না, বিপদে কিছু পড়বেন না, তবে টিকটিকি লেগে থাকবে।

আমি হেসে বললাম, পাকিস্তানে গেলে যে টিকটিকি পিছনে লেগে থাকবে, তা তো খুবই স্বাভাবিক।

পরের দিনই আমি রিটার্ণ জার্নির প্ল্যান ঠিক করে ফেললাম। লণ্ডন, প্যারিস, ফ্রাঙ্কফার্ট, মিউনিক, ভিয়েনা, রোম, বেইরুট, কায়রো, করাচী, দিল্লী। হক-সাহেবকে জানিয়েদিলাম, চার তারিখে লণ্ডন ছাড়ছি; একুশে ভোর চারটে ত্রিশে বি ও এ সি ফ্লাইট ফাইভ জিরো ওয়ান-এ করাচী পৌঁছব। থাকব কে এল এল-এম হোটেলে। হকসাহেব বললেন, সব ঠিক হোগা; কই চিন্তা নেই করনা।

আমি লণ্ডন ছাড়ার আগে হকসাহেবকে আমার রোম আর কায়রোর হোটেলের নাম ঠিকানাও জানিয়ে দিলাম।

ঘুরে ফিরে এলাম রোম কিন্তু না, হকসাহেব কোন কিছু খবর দিলেন না। কায়রোতেও তিনদিন কাটালাম। না, ওখানেও কোন চিঠিপত্র পেলাম না। উনি প্রতিশ্রুতি না দিলেও বলেছিলেন, দরকার হলে যোগাযোগ করবেন। আমি

আশা করেছিলাম, রোম বা কায়রোতে ওর কাছ থেকে একটা চিঠি বা টেলিগ্রাম পাব। তাই বেশ দুশ্চিন্তা নিয়েই কুড়ি তারিখ রাত্রে কায়রো থেকে করাচী রওনা হলাম।

প্লেন ঠিক সময়ই করাচী পৌঁছল। অবিভক্ত ভারতের বৃহত্তম এয়ারপোর্ট আমাকে মুগ্ধ করল না, বরং সূর্যোদয়ের প্রাক্কালেও এর বাতাসে প্রাণহীন রুক্ষতার স্পর্শে চমকে উঠলাম। করাচী এয়ারপোর্টে নামলেই বোঝা যায়, বেলুচিস্থানের মরুপ্রান্তর দূরে নয়।

এলাম টার্মিন্যাল বিল্ডিং। ইমিগ্রেশন কাউন্টারের পুলিশ কর্মচারী আমার পাশপোর্ট একটু বেশি যত্ন নিয়ে দেখে একবার ভাল করে আমার মুখখানা দেখলেন। বোধহয় একটু হাসলেন। তারপর পাশপোর্টে ষ্ট্যাম্প লাগালেন, এ্যারাইভাল করাচী ইণ্টারন্যাশনাল। ঐ ষ্ট্যাম্পের উপরেই সই করে তারিখ দিলেন।

একটু পরে কাষ্টমস্। একজন অফিসার আমার স্যুটকেশের উপরেই কমন-ওয়েলথ প্রাইম মিনিষ্টার্স কনফারেন্সের ফোলিও ব্যাগটি দেখে প্রশ্ন করলেন, আর ইউ এ ডিপ্লোম্যাট?

—না, আমি সাংবাদিক।

—পাশপোর্ট দেখান।

ওঁকে পাশপোর্ট দেবার পর উনি আমার পরিচয়পত্রের পাতাটি ভাল করে দেখে নিয়েই একবার আমাকে দেখলেন। তারপর হঠাৎ বাঘের মত হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন, এনি ক্যামেরা? ওয়াচ? ইলেকট্রনিক···

—না, ওসব কিছুই নেই।

অসভ্যের মত চিৎকার করে জিজ্ঞাসা করলেন, সোনার গহনা? ফরেন কারেন্সী?

—না, তাও নেই; তবে ট্রাভেলার্স চেক আছে।

আবার সেই অসভ্য চিৎকার, তবে কী আছে আপনার স্যুটকেশে?

– জামা-কাপড় আর কাগজপত্র।

যে ভদ্রলোক এতক্ষণ অসভ্যের মত চিৎকার করছিলেন, তিনিই হঠাৎ অত্যন্ত চাপা গলায় আমার দিকে না তাকিয়েই বাংলায় প্রশ্ন করলেন, আপনি হকসাহেবের বন্ধু?

সতর্কভাবে এদিক-ওদিক দেখে নিয়ে বললাম, হ্যাঁ।

উনিও অত্যন্ত সতর্কভাবে একবার চারপাশে দৃষ্টিটা ঘুরিয়ে নিয়ে প্রায়

আপন-মনে বললেন, কে এল এম-এর হোটেলেই থাকবেন তো?

মুখে না, মাথা নেড়ে বললাম, হ্যাঁ।

—চলে যান। কোন চিন্তা নেই।

মনে মনে হকসাহেবকে ধন্যবাদ না জানিয়ে পারলাম না।

এরপর পাশপোর্ট জমা রেখে রসিদ নিয়ে বি ও এ সি-র গাড়ীতে চলে এলাম কে এল এম-এর ইণ্টার কণ্টিনেণ্টাল হোটেলে। তখন ছ'টা বাজে। রাত্রে বিশেষ ঘুম হয় নি। তাই জামা-কাপড় বদলে একটু শুয়ে পড়লাম।

দরজায় নক্ করার আওয়াজ হতেই ঘুম ভাঙ্গল। ঘড়িতে দেখলাম, প্রায় সাড়ে ৯টা বাজে। দরজা খুলতেই এক বৃদ্ধ রুম বেয়ারা আমার ঘরের ভিতর ঢুকেই ডান হাত কপালের কাছে তুলে বললো, আদাব।

সেলাম আলেকুম না বলে আদাব বলতেই বুঝলাম উনি বাঙ্গালী। একটু হেসে বললাম, আপনি বাঙ্গালী?

—হ্যাঁ কর্তা, আমি বাঙ্গালী। প্যাটের দায়ে এই বিদেশে পইড়্যা আছি।

—করাচী বিদেশ হবে কেন?

বৃদ্ধ রুম বেয়ারা একটু ম্লান হেসে বললেন, যে দেশের ভাষা, খাবার-দাবার, পোশাক-পরিচ্ছদ, আবহাওয়া আলাদা সে বিদেশ ছাড়া আবার কী?

বৃদ্ধের কথা শুনে আমি বিস্মিত হই না; বরং খুশি হই।

আমি কিছু বলার আগেই উনি বললেন, আপনার ঘরে বেশীক্ষণ থাকা ঠিক না। আমি সরষের তেল এনে দিচ্ছি, ভালভাবে স্নান করুন। এ শালাদের এক গাদা মশলা দেওয়া খাবার-দাবার খাওয়ার দরকার নেই। আমি মাছের ঝোল-ভাত এনে দেব। তাই খেয়ে বেরিয়ে পড়ুন।

বুঝলাম, পরিকল্পনা মতই কাজ এগুচ্ছে। বৃদ্ধের কথা উপেক্ষা করলাম না, সরষের তেল মেখেই স্নান করলাম। বেশ পরিতৃপ্তির সঙ্গেই মাছের ঝোল,ভাত খেলাম।

—তারপর?

ঐ বৃদ্ধের নির্দেশমত প্রিডি স্ট্রীটের কটেজ ইণ্ডাস্ট্রীজ সেলস এ্যাণ্ড ডিসপ্লে সেণ্টারের সামনে গিয়ে ট্যাক্সি ছেড়ে দিলাম। দশ-পনের মিনিট এদিক-ওদিক ঘোরাঘুরির পর ডানদিকে কিছুদূর যেতেই বৃদ্ধের দেওয়া নম্বরের অষ্টিন দেখতে পেলাম। গাড়ীতে কেউ ছিলেন না কিন্তু দরজা খোলা ছিল। আমি গাড়ীতে বসার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই এক ভদ্রলোক হাসতে হাসতে গাড়ীতে উঠলেন। হাসতে

হাসতেই বললেন, আমি সিরাজুল ইসলাম। গাড়ি খুঁজতে কোন অসুবিধে হয়নি তো?

—না।

উনি সঙ্গে সঙ্গে গাড়ী ষ্টার্ট করলেন। একটু ফাঁকা রাস্তায় পেঁাছেই উনি বললেন, আপনি খুব ভাল দিনে এসেছেন।

কেন?

—আজ আমাদের চিত্রাঙ্গদার ফাইন্যাল রিহার্সাল।

—তাই নাকি?

—হ্যাঁ। একসঙ্গে অনেক বাঙ্গালীর সঙ্গে আপনার আলাপ হবে।

—তাহলে তো সত্যিই ভাল দিনে এসেছি।

গাড়ীতে যেতে যেতেই অনেক গল্প হলো। সিরাজুল ইসলাম জন্মেছেন কলকাতায়। পড়াশুনা কলকাতারই রিপন কলেজে; তবে এম এ পড়েছেন ঢাকায়। চাকরি করেন পাকিস্তান রেডিও-র বাংলা বিভাগে। আমার কথাও উনি শুনলেন।

দু' পাঁচ মিনিট পর সিরাজুল ইসলাম লুকিয়ে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললো, কলকাতার কথা মনে পড়লে আর কিছু ভাল লাগে না।

আমি বললাম, যেখানে জন্মেছেন, যেখানে লেখাপড়া শিখেছেন, সেখানকার স্মৃতি কখনই ভোলা যায় না।

সিরাজুল হঠাৎ ডান দিকে ষ্টিয়ারিং ঘুরিয়ে নতুন রাস্তায় পড়েই বলেন, কাজকর্মের ঝামেলায় দিনগুলো কেটে যায় ঠিকই কিন্তু কদাচিৎ কখনও কলকাতার লোকজনের সঙ্গে দেখা হলে শুধু কলকাতার কথাই মনে হয়। উনি আপন মনে একটু ম্লান হেসে বললেন, কোনদিন স্বপ্নেও ভাবি নি, আমি করাচীতে এসে রেডিও পাকিস্তানের সেবা করব।

—কেন? পূর্ব পাকিস্তানের লোক হয়ে করাচীতে এসে চাকরি করা কী স্বাভাবিক ব্যাপার নয়?

সিরাজুল আমার দিকে তাকিয়ে একটু হেসে বললেন, আমাদের দেশ বসিরহাট; পূর্ব পাকিস্তান না।

—তাই নাকি?

হ্যাঁ।

—তাহলে কী দাঙ্গার পরই বসিরহাট ছেড়ে পূর্ব পাকিস্তানে চলে যান?

উনি আবার একটু হাসেন। বলেন, দাঙ্গা হয়েছিল কলকাতায়, ঢাকায়, নোয়াখালিতে, বসিরহাটে না।

—তাহলে বসিরহাট ছাড়লেন কেন ?

উনি একটা আঙ্গুল দিয়ে কপাল দেখিয়ে বললেন, সবই কিসমতের খেল। ঢাকায় ব্যবসা করতে গিয়ে বাবা মারা গেলেন ; আর সেই ব্যবসা সামলাতে আমি গেলাম ঢাকায়। ব্যস ! এমন জড়িয়ে পড়লাম যে আর ফিরতে পারলাম না।

রহমান সাহেবের বাড়িতে ঢুকেই আমি স্তম্ভিত। চিত্রাঙ্গদা নাচছে আর গান হচ্ছে—আমার অঙ্গে অঙ্গে কে বাজায়, বাজায় বাঁশি। আমি ঘরে পা দিতেই মণিপুর রাজকন্যা চিত্রাঙ্গদার নাচ থেমে গেল, গান বন্ধ হল। চিত্রাঙ্গদা মুহূর্তের জন্য একটু হেসে আমার দিকে তাকালেন। আমাকে অভ্যর্থনা করলেন ঘরের সবাই। আমি হাসতে হাসতে বললাম, আপনারা এমন করে অভ্যর্থনা করছেন যেন ঘরে অর্জুন ঢুকলেন।

আমার কথায় ঘরের মেয়ে-পুরুষ সবাই হাসেন। চিত্রাঙ্গদা বললেন, কোন দ্বিধা-সঙ্কোচ না করে প্রায় অর্জুনের মতই তো এলেন।

আমি হাসতে হাসতে বলি, তাহলে কী বলব—কাহারে হেরিলাম !' আহা !

সে কি সত্য, সে কি মায়া।

ঘর ভর্তি সবাই হাসিতে লুটিয়ে পড়লেন। হাসি থামতেই সিরাজুল ইসলাম একটি মেয়েকে বললেন, লায়লা, তুই সবার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দে। লায়লা আমাকে সবার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার পর আমাকে পাশে নিয়েই বসলেন। তারপর একটু চাপা গলায় বললেন, আমি লায়লা ইসলাম, সিরাজুল ইসলামের বোন।

এ ঘরের অর্ধেকের বেশিই তো রেডিও টি-ভি-তে আছেন। আপনিও কী রেডিও বা টি-ভি-তে আছেন ?

—না, না, আমি পড়াশুনা করছি।

—কী পড়ছেন ? এম এ ?

লায়লা একটু হেসে জবাব দিলেন, বছর দুই আগে এম এ পাশ করেছি।

—তাহলে রিসার্চ করছেন ?

—হ্যাঁ, তা বলতে পারেন।

ঐ সামান্য বিরতির মধ্যেই চা আর চিড়ের পোলাও এলো। মিসেস রহমান

নিজে আমাকে চা দিলেন। লায়লা এগিয়ে দিলেন এক প্লেট চিড়ের পোলাও। একটু হাসিঠাট্টা গল্প-গুজবের পর আবার রিহার্সাল শুরু হল।

নাচ-গানের মধ্যে যেন নিমেষেই সময়টা কেটে গেল। রিহার্সাল শেষ হবার পর আবার চা-কফি আর হিংয়ের কচুরি। নানাজনের সঙ্গে আরো কিছুক্ষণ গল্প-গুজব। এবার আস্তে আস্তে সবাই বিদায় নিতে শুরু করলেন। হঠাৎ হুদাসাহেব আমার কাছে এসে বললেন, হাজার হোক আপনি ইণ্ডিয়ান জার্ণালিষ্ট। পুলিশ নিশ্চয়ই একটু খেয়াল রাখছে কিন্তু যদি কোথাও কোন অসুবিধে হয় তাহলে আমাকে ফোন করবেন।

আমি মিঃ হুদার টেলিফোন নম্বরের কাগজটা হাতে নিয়ে বললাম, কোন অঘটন ঘটার সম্ভাবনা আছে নাকি?

উনি হেসে বললেন, না, না, কিচ্ছু ঘটবে না। আমি ঘণ্টাখানেক আগেই টেলিফোন করেছি।

সিরাজুল ইসলাম পাশেই ছিলেন। উনি আমাকে বললেন, হুদা সাহেব আমাদের গোয়েন্দা বিভাগের ডেপুটি ডিরেক্টর। তার চাইতেও বড কথা উনি কলকাতায় থাকার সময় পঙ্কজ মল্লিকের কাছে রবীন্দ্রসঙ্গীত শিখেছেন।

আমি হুদা সাহেবকে অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জানাই। তারপর সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমি সিরাজুল আর লায়লার সঙ্গে ওঁদের বাড়ি রওনা হলাম।

বাড়ি ফেরার পথে সিরাজুল আমাকে প্রায় সারা শহরটা ঘুরিয়ে দেখাবার পর বললেন, আপনার মত লোকের কাছে এ শহরে দেখার কিছু নেই; তবে কাল যদি আপনাকে ক্লিফটন বীচ্ দেখাতে পারি, তাহলে নিশ্চয়ই আপনার ভাল লাগবে।

—হ্যাঁ, ক্লিফটন বীচের কথা অনেকের কাছেই শুনেছি।

—কাল যদি ছুটি নিতে পারি তাহলে আমিই নিয়ে যাব; নয়ত লায়লা আপনাকে ঘুরিয়ে আনবে।

আমি বললাম, কাজকর্মে ক্ষতি করে আমাকে বেড়াতে নিয়ে যাবার দরকার নেই।

লায়লা বললেন, আপনাকে একটু ঘুরিয়ে আনলে আমাদের কারুরই কোন কাজের ক্ষতি হবে না। দাদা ছুটি না পেলে আমিই আপনাকে ঘুরিয়ে আনব।

ঘুরে-ফিরে সিরাজুলের বাড়িতে পৌঁছতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। ওদের মা দরজা খুলে দিয়েই বললেন, একটু আগেই রহমান সাহেবের কুঠী থেকে ফোন এসেছিল।

তার আগে তোর অফিস থেকে দুবার ফোন এসেছে।

সিরাজুল প্রথমেই ওঁর অফিসে ফোন করলেন। সহকর্মী মুকুল হাসানের খুব জ্বর। সুতরাং একটু পরেই ওঁকে রেডিওতে ছুটতে হবে।

এরপর রহমান সাহেবের বাড়িতে ফোন করে জানলেন, আমার আপত্তি না থাকলে আগামীকাল দুপুরে আমাকে ওরা খাওয়াতে চান। মিসেস রহমান আমার সঙ্গেও কথা বললেন, আজ তো আপনার সঙ্গে ভাল করে কথাই বলতে পারলুম না। তাই কাল দুপুরে আসুন। সবাই মিলে একটু গল্প করা যাবে।

আমি সানন্দে স্বীকৃতি জানালাম।

সিরাজুল একটু পরেই রেডিও স্টেশনে চলে গেলেন। যাবার সময় বললেন, আপনি আম্মা আর লায়লার সঙ্গে গল্প করুন। আমি যত তাড়াতাড়ি পারি ফিরে আসছি।

সিরাজুলের মার সঙ্গেও অনেক গল্প হল। উনি কাটোয়ার মেয়ে। ম্যাট্রিক পাশ করেছেন কলকাতার সাখাওয়াত মেমোরিয়াল স্কুল থেকে। ভিক্টোরিয়াতে আই-এ ক্লাশ-এ ভর্তি হবার পরই বিয়ে হয়। উনি বললেন, আমাদের সব আত্মীয়-স্বজনই পশ্চিমবাংলায়। শুধু বড় মেয়ে আর জামাই ছাড়া ঢাকায় আমাদের আর কোন আত্মীয় নেই। আত্মীয়স্বজন ছেড়ে এত দূর দেশে পড়ে থাকতে একটুও ভাল লাগে না। সব শেষে উনি একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন, কোথা দিয়ে যে কি ঘটে গেল, তা ভাবতেও অবাক লাগে।

অমি চুপ করে ওঁর কথা শুনি। লায়লা স্নান করতে গেছেন। ঘরে শুধু আমরা দু'জন।

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর হঠাৎ উনি প্রশ্ন করলেন, আচ্ছা বাবা, শনিবারের চিঠি এখনো বেরোয় ?

—না।

—তাই নাকি ? অত সুন্দর কাগজটা বন্ধ হয়ে গেল ?

—হ্যাঁ।

—ভারতবর্ষ-প্রবাসী তো চলছে ?

—না, ওগুলোও বন্ধ হয়ে গেছে।

—কী আশ্চর্য ! তাহলে লোকে পড়ে কী ?

—এখন নতুন নতুন অনেক কাগজ বেরিয়েছে।

—কিন্তু বাবা, সেগুলোতো ভারবর্ষ-প্রবাসী হতে পারে না।

—না, তা কী সম্ভব ?

বৃদ্ধা আবার একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, সব কিছুই এমনভাবে বদলে যাচ্ছে যে আমাদের সব কিছুই বেসুরো মনে হয়।

লায়লা স্নান করে আসতেই উনি বললেন, তোরা গল্প কর। আমি শুতে যাই। পায়ে বড় ব্যথা করছে।

লায়লা আমাকে বললেন, আম্মা বাতের ব্যথায় বড় কষ্ট পাচ্ছেন। বেশীক্ষণ বসে থাকতে পারেন না।

অমি বললাম, আমি তো অনেকক্ষণ আপনাকে আটকে রেখেছি। আপনি এবার বিশ্রাম করুন।

বৃদ্ধা চেয়ার ছেড়ে উঠতে উঠতে লায়লাকে বললেন, একে দেখেশুনে খেতে দিস।

লায়লা হাসতে হাসতে বললেন, কেন, তোমার কলকাতার লোক বলে ?

— তাই তো !

ওঁর মা ভিতরে চলে.যেতেই লায়লা জিজ্ঞাসা করলেন, আমাদের রিহার্সাল কেমন লাগল ?

—খুব ভাল।

—কী ভাল লাগল ?

—নাচ-গান, আপনাকে, আপনার দাদাকে, রহমান সাহেবকে……

—আমি আপনার সামনে বসে আছি বলে আমাকে খুশি করার কোন দরকার নেই।

—ঠিক তো ?

—অবশ্যই।

—তাহলে বলি, আপনি ছাড়া আর সবাইকে ভাল লেগেছে ?

—আর আমাকে ?

—একটুও ভাল লাগে নি ?

—কেন ?

—আপনার রূপ নেই, গুণ নেই, আপনাকে ভাল লাগবে কেন ?

—ঠিক বলেছেন।

দু'জনেই হাসি।

এবার আমি প্রশ্ন করি, আচ্ছা মেয়েরা কি সব সময়ই নিজেদের প্রশংসা শুনতে

ভালবাসে ?

—মেয়েদের দোষ দিচ্ছেন কেন ? প্রশংসা শুনতে আপনারা ভালবাসেন না ?

—অন্যের কথা বলতে পারি না। তবে আমার প্রশংসা করলে নিশ্চয়ই আমার ভাল লাগবে কিন্তু দুঃখের কথা, কেউ আমার প্রশংসা করে না।

-- কেউ না ?

—একজন করে তবে সাক্ষাতে না।

—তিনি কে ?

—এক কথায় জবাব দিতে পারব না।

—ঠিক আছে, সবিস্তারেই বলুন।

—তার কথা শুরু করলে আরো দু-চারদিন আমাকে করাচী থাকতে হবে।

—তাই থাকুন। কে আপনাকে চলে যেতে বলছে ?

—দু-চারদিন থাকার পর যদি যেতে ইচ্ছে না করে ?

—ইচ্ছে না করে থেকে যাবেন।

—যদি সিরাজসাহেব আপত্তি করেন ?

—সে দায়িত্ব আমার।

—আপনি আমার দায়িত্ব নেবেন কেন ?

—আমার ইচ্ছা।

আমি আর কথা বলি না। লায়লার দিকে তাকিয়ে একটু হাসি। লায়লাও হাসেন। দু-জনেই দু-জনকে দেখি আর হাসি।

তারপর লায়লা বললেন, আপনি ভারি মজার লোক।

—কেন ?

—বেশ কথা বলেন।

—তাই নাকি ?

—আপনি আমাদের রিহার্সালের ওখানে ঢুকতেই বুঝলাম, আপনি বেশ ইণ্টারেষ্টিং লোক।

আমি হাসি।

হঠাৎ লায়লা উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, একটু বসুন। চা করে আনি।

—কোন দরকার নেই।

—কেন ? চা খেতে ইচ্ছে করছে না ?

—ইচ্ছে তো করছে কিন্তু আপনি চলে গেলে একলা একলা ঝগড়া করব

কেমন করে ?

লায়লা হাসতে হাসতে বললেন, আমার সঙ্গে কিচেনে চলুন।

—না থাক; তাহলে আপনার সঙ্গে আরো অনেক জায়গায় যেতে ইচ্ছে করবে।

লায়লা হাসতে হাসতে বেরিয়ে গেলেন।

আমরা চা খেতে খেতেই সিরাজুল সাহেব ফিরে এলেন। অনেক গল্প হল তবে শুধুই কলকাতার কথা। ভিক্টোরিয়া, চৌরঙ্গী, কলেজ স্কোয়ার, কফি হাউস বসন্ত কেবিন। পুরনো বইয়ের দোকান, গানের জলসা, ময়দানের ফুটবল—আরো কত কি। সব কিছুর মধ্যেই কেমন একটা আবেগ, মমত্ববোধ। কী যেন হারাবার বেদনা।

কথা বলতে বলতে সিরাজুল সাহেব হঠাৎ চুপ করেন। কী যেন আপন মনে ভাবেন। নাকি মনে মনে কিছু আবৃত্তি করছেন ?

—আচ্ছা অমিয় চক্রবর্তী, বুদ্ধদেব বসু, অজিত দত্ত, বিষ্ণু দে কলকাতাতেই আছেন তো ? সুভাষ মুখোপাধ্যায় খুব জনপ্রিয়, তাই না ?

আমাদের কথাবার্তার মাঝখানে হঠাৎ লায়লা বললেন, দাদাও খুব ভাল কবি।

—তাই নাকি ?

সিরাজুল একটু হাসেন। লায়লা বলেন, দাদার তিনটে কবিতার বইও বেরিয়েছে।

আমি সিরাজুল সাহেবকে বলি, আপনি তো আচ্ছা লোক! এসব খবর আগে বলেন নি ?

উনি সলজ্জভাবে বললেন, পাঁচজনকে জানানোর মত কবিতা আমি লিখতে পারি না। তবে মাঝে মাঝে যখন মানসিক যন্ত্রণাটা অসহ্য হয়, তখন কবিতা না লিখে পারি না।

কথায় কথায় অনেক রাত হয়েছিল। তাই খেয়েদেয়েই হোটেলে ফিরে এলাম। হোটেলে পৌঁছে দেবার সময় সিরাজুল সাহেব জানালেন, উনি ছুটি পান নি। রহমান সাহেবের বাড়িতে খেতে যেতে পারবেন কি-না তারও ঠিক নেই; তবে খুব চেষ্টা করবেন। আর জানালেন, লায়লা ১২টা নাগাদ আমার হোটেলে এসে আমাকে রহমান সাহেবের বাড়ি নিয়ে যাবেন। তারপর খাওয়া-দাওয়ার পর লায়লাই আমাকে ক্লিফটন বীচ্ ঘুরিয়ে আনবেন। মনে মনে খুশি হলেও ভদ্রতার খাতিরে আপত্তি জানালাম কিন্তু সিরাজ সাহেব বললেন, না, না,

আপনার দ্বিধা করার কোন কারণ নেই। ওর একটুও কষ্ট হবে না; বরং খুশি হবে।

মনে মনে ঠিক করেছিলাম, ১০টা-সাড়ে ১০টা পর্যন্ত ঘুমব কিন্তু সাড়ে ৯টা না বাজতে বাজতেই দরজায় খট্ খট্ আওয়াজ। রাত্রে তিনটে নাগাদ এয়ারপোর্ট যেতে হবে; সুতরাং রাত্রে ঘুম হবার সম্ভাবনা অত্যন্ত ক্ষীণ। তাই একটু বিরক্ত হয়েই বিছানা ছেড়ে উঠলাম। দরজা খুলে আমি হতবাক।

লায়লা!

আমি অবাক হয়ে বললাম, আপনি! এখন?

লায়লা দরজার পাশে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আমার দিকে তাকিয়ে মিট মিট করে হাসতে হাসতে বললেন, আগে বলুন, আপনার ঘরে ঢোকার অনুমতি পাব কি-না।

—নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই।

ঘরে ঢুকে আমার বিছানার দিকে একবার তাকিয়েই লায়লা প্রশ্ন করলেন, শুয়ে শুয়ে কাকে স্বপ্ন দেখছিলেন?

আমি হেসে বলি, আপনাকে।

—তাহলে আপনার ঘরে আমার বসার অধিকার আছে, তাই না?

—একশ'বার।

—আমি টেলিফোন করে রুম সার্ভিসকে চা পাঠাতে বলেই ওঁকে প্রশ্ন করি, হঠাৎ এখন আপনার আবির্ভাব?

—অকারণেই।

— সিরাজ সাহেব কী বাড়িতে?

— ওকে আমি অফিসে নামিয়ে দিয়েই এখানে এসেছি।

—উনি এত সকালেই অফিসে গেলেন?

—হ্যাঁ; আজ ওর অনেকগুলো রেকর্ডিং আছে।

সেই বৃদ্ধ রুম বেয়ারা চা নিয়ে এলো। টুকটাক কথা বলে ও চলে গেল। লায়লা আমাকে চা করতে দিলেন না। বললেন, থাক। আমার সামনে আর আপনাকে চা করতে হবে না।

চা খেতে খেতে আমি আবার জানতে চাই, সত্যি বলুন তো আপনি এখন এলেন কেন? কোন প্রোগ্রাম চেঞ্জ হয়েছে?

— না, কোন প্রোগ্রাম চেঞ্জ হয় নি।

—তাহলে এখন এলেন কেন ?

—ইচ্ছে হলো, তাই চলে এলাম।

—সত্যি ?

—আমি মিথ্যে কথা বলি না।

—না, না, তা বলছি না। তবে ভাবছিলাম হয়ত……

—কাল আপনার সঙ্গে কথা বলতে বেশ লাগছিল। তাই মনে হল, যাই আপনাকে একটু বিরক্ত করে আসি।

—খুব ভাল করেছেন।

—সত্যি বলছেন ?

—হ্যাঁ, সত্যি বলছি। করাচীতে আসার আগে মনে মনে অনেক ভয় ছিল কিন্তু কাল এত আনন্দে কাটিয়েছি যে আপনাদের কথা কোনদিন ভুলতে পারব না।

—আমাদেরও খুব ভাল লেগেছে। কাল অনেক রাত পর্যন্ত আমি আর দাদা আপনার কথা আলোচনা করেছি।

—তাই নাকি ?

—হ্যাঁ।

—আমি সত্যি ভাগ্যবান।

—সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। লায়লা আমার দিকে তাকিয়ে একটু হেসে বললেন, আপনি বেশ চট করে সবাইকে আপন করে নিতে পারেন।

—আমি তো বুঝতে পারি নি, কাকে আপন করে নিলাম।

—আচ্ছা ওসব কথা থাক। আপনি কিন্তু রহমান সাহেবের বাড়িতে জমে যাবেন না।

আমি হেসে বলি, সেটা কী আমার হাতে ?

—হ্যাঁ, আপনার হাতে।

আমি হাসি চেপে বললাম, ঠিক আছে। ওরা কেউ থাকতে বললে বলব, আপনি বেশীক্ষণ থাকতে বারণ করেছেন।

—কোন আপত্তি নেই।

না, রহমান সাহেবের বাড়িতে সত্যি বেশীক্ষণ থাকতে পারলাম না। ওঁদের আন্তরিকতার জন্য বারবার ধন্যবাদ জানিয়ে বললাম, বেশ কয়েক জায়গায় ঘোরাঘুরি করতে হবে বলে অনিচ্ছাসত্ত্বেও এমন আড্ডা ছেড়ে উঠছি।

লায়লা আয়েসার সঙ্গে গল্প করছিলেন। আমি ওঁকে বললাম, উঠুন আর গল্প করলে আমার সব জায়গা যাওয়া হবে না।

লায়লা সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, আমি তো আপনার ড্রাইভার। হুকুম করলেই উঠব।

রহমান সাহেবের বাড়ি থেকে বেরিয়ে ডানদিকে ঘুরেই লায়লা হাসতে হাসতে বললেন, ওয়েল ডান।

—কৃতিত্ব অভিনেতার নয়, পরিচালিকার।

লায়লা আমার দিকে তাকিয়ে একটু হেসে বললেন, আপনার সঙ্গে দিনের পর দিন কাটালেও কেউ ক্লান্ত হবে না।

গাড়ী চলছে সোজা পশ্চিমে। আরব সাগরের ঝড়ো হাওয়া উইণ্ড স্ক্রীনের উপর আছড়ে পড়ে গাড়ীর ভিতরে আশ্রয় নিচ্ছে। লায়লার চুল উড়ছে, শাড়ীর আঁচল উড়ছে। আমি দেখছি। না দেখে পারছি না। হঠাৎ দেখি, আরব সাগর আমার সামনে দাঁড়িয়ে মাতলামী করছে। লায়লা অষ্টিনের ইঞ্জিন বন্ধ করে দিয়েই বললেন, এই আমাদের ক্লিফটন বীচ্।

—শহরের এত কাছে ?

—হ্যাঁ, শহর থেকে মাত্র তিন মাইল।

দু-এক পা এগিয়ে চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়েই বললাম, সত্যি অপূর্ব।

—আপনি আরো দু-একদিন থাকলে মনোরা আইল্যাণ্ড ঘুরিয়ে আনতাম। ওটাও খুব সুন্দর জায়গা।

—পরের বার যাওয়া যাবে।

—আপনি কী আবার করাচী আসবেন ?

—আশা তো করি।

আস্তে আস্তে সামনের দিকে এগুতে এগুতে লায়লা বললেন, এলে খুশি হবো কিন্তু আশা করি না।

—কেন ?

—এ সংসারে বেশী আশা করলেই বেশী দুঃখ পেতে হয়।

—তা ঠিক কিন্তু আমি না এলে আপনি দুঃখ পাবেন কেন ?

—দুঃখ না পেলেও আশাভঙ্গ তো হবে।

ক্লিফটন বীচে্র আলোছায়ায় ঘোরাঘুরি করতে করতে আমরা কত কথা বলি।

এলোমেলো। কখনও হাসি, কখনও গম্ভীর হয়ে ভাবি। আবার আনমনাও হই মাঝে মাঝে। তারপর অস্তগামী সূর্যের মুখোমুখি হয়ে সমুদ্রের ধারে বসি। কখনও নীরব, কখনও সরব। আবার কখনও দু-জনে দু-জনের দিকে তাকিয়ে থাকি অপলক দৃষ্টিতে; দুজনের চোখেই কত অনুক্ত প্রশ্ন।

ফেরার পথে গাড়ীতে কেউই বিশেষ কথা বলি না। বলতে পারি না; বলতে মন চায় না। আনমনা হয়ে কত কি ভাবি। বোধহয় লায়লাও ভাবেন। ফিরে আসি করাচী শহরে। রেডিও স্টেশন থেকে সিরাজুল সাহেবকে তুলে নিয়ে সোজা ওঁদের বাড়ি। আম্মার সঙ্গে আবার সেই কলকাতার গল্প। সিরাজুল সাহেব আমায় তাঁর কবিতার বই "সাধনা, আমার সাধনা" উপহার দেন। আমার আটচল্লিশ ঘণ্টা করাচী বাসের মেয়াদ যত কমে আসছে, ঘড়ির কাঁটা তত বেশী জোরে দৌড়চ্ছে। হোটেলে জিনিসপত্র গোছগাছ করার ছিল। তাই দশটার মধ্যে খাওয়া-দাওয়া শেষ করার পর আর বসলাম না। ওঁরা দু-ভাই-বোনেই আমাকে হোটেলে ছাড়তে এলেন। রাত তখন এগারটা।

আমি আর সিরাজুল সাহেব ঘরে ঢুকলেও লায়লা বারান্দায় দাঁড়িয়ে রইলেন। ভিতরে আসতে বললাম কিন্তু উনি এলেন না।

ঘরে ঢুকেই সিরাজুল সাহেব বললেন, দাদা, আমার একটা উপকার করবেন?

—নিশ্চয়ই করব।

—আপনি নিশ্চয়ই মাঝে মাঝে কলকাতা যান?

—হ্যাঁ যাই।

—আমার দু-খানা বই আর একটা ফাউণ্টেন্‌পেন একজনকে পৌঁছে দেবেন?

আমি হেসে বললাম, সানন্দে।

উনি ব্যাগ থেকে দু-কপি "সাধনা, আমার সাধনা" আর একটা নতুন লেডিজ পার্কার কলম বের করে আমার হাতে দেবার পর এক টুকরো কাগজ এগিয়ে দিলেন। বললেন, এই কাগজে ঠিকানা লেখা আছে।

ঠিকানা পড়তে গিয়েই চমকে উঠলাম। শ্রীমতী সাধনা রায়!

আমি ওঁর দিকে তাকাতেই উনি একটু হেসে বললেন, হ্যাঁ দাদা, এই সাধনাই আমার সাধনা।

আমি বিমুগ্ধ হয়ে ওঁকে একবার ভাল করে দেখেই বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরলাম।

আমার বাহুবন্ধন থেকে মুক্ত হয়েই উনি বললেন, দাদা, কফি খাওয়াবেন না?

—নিশ্চয়ই।

—আপনি কফির অর্ডার দিন। আমি গাড়ীটা পার্কিং-এ রেখে আসি।

সিরাজ সাহেব বেরিয়ে যেতেই আমি কফির অর্ডার দিলাম। আমি টেলিফোন নামিয়ে রাখতেই লায়লা ধীর পদক্ষেপে ঘরে ঢুকলেন।

—দাদা কোথায় গেল ?

—গাড়ীটা পার্কিং-এ রাখতে গেলেন।

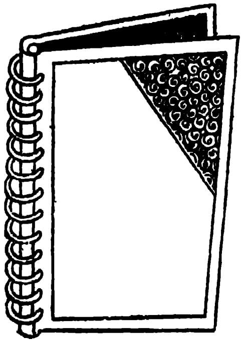
লায়লা দু-এক পা এগিয়ে একেবারে আমার সামনে মুখ নীচু করে দাঁড়ালেন।

জিজ্ঞাসা করলাম, কিছু বলবেন ?

লায়লা একটা ছোট্ট প্যাকেট আমার হাতে দিয়ে বললেন, কাফ লিংকটা ব্যবহার করলে খুশি হবো। যদি কাফ লিংক দেখে আমার কথা মনে পড়ে তাহলে নিজেকে ধন্য মনে করব।

আমি সকৃতজ্ঞ চিত্তে ওঁর উপহার গ্রহণ করে বললাম, নিশ্চয়ই করব।

এবার লায়লা কোন কথা না বলে একটা খোলা খাম আমার হাতে দিলেন। দেখি, ভিতরে রয়েছে ওঁর সুন্দর ছোট্ট একটা ছবি। ঠিক পার্শে রাখার মত। আমি কিছুতেই বলতে পারলাম না, লায়লা, আমার পার্শে একটাই ছবি রাখা যায়। সেখানে যার স্থান আছে সেই আমার চিরদিনের, চিরকালের।



চিরকুমার

এ সংসার সত্যি বড় বিচিত্র জায়গা। কোন মানুষের জীবনে কী ঘটেছে বা ঘটছে, তা বাইরে থেকে বোঝা যায় না, জানা যায় না। অসম্ভব। যে শ্রাবণের বুকের মধ্যে এত আগুন, যার বজ্রমুষ্টিতে এত ক্ষমতা, তার চোখে এত জল কেন? যে কৃষ্ণচূড়া দূর দূরান্তর থেকে মানুষকে এত প্রলুব্ধ করে, তার গন্ধ নেই; অথচ দিনের আলোয় যে তার আপন মাধুর্যে মানুষকে কাছে টানতে পারে না, সে রাতের অন্ধকারে মদির করে তোলে সবাইকে। বিশ্বসংসারের সর্বত্র এই খেলা চলছে। ঘরে-বাইরে। মানুষের জীবনে, প্রকৃতি-রাজ্যে।

সন্তোষদার সঙ্গে আমার আলাপ লালবাজারের লাল বাড়িটায়। আমি তখন এই কলকাতারই অখ্যাত দৈনিকের নগণ্য রিপোর্টার। রাইটার্স বিল্ডিং-লালবাজার নিত্য যাতায়াত করি খবরের আশায়। তখন বয়স বেশী না। ম্যাট্রিক পাশ করে কলেজে ভর্তি হবার কিছুদিন পর থেকেই প্রেস কার্ড পকেটে নিয়ে রাইটার্স বিল্ডিং-এ গিয়ে মনে মনে উত্তেজনা বোধ করি; রোমাঞ্চিত হই লালবাজার পুলিশ হেড কোয়ার্টার্সে ঘোরাঘুরি করে। এরাই চোর-ডাকাত ধরে? এরাই খুনের কিনারা করে? এরা সবাই সব গোপন খবর জানে? ভাবলেও অবাক লাগে। তুমুল বর্ষার রাতে বেলেঘাটার বস্তিতে ছাব্বিশ বছরের ডাগর-ডোগর যুবতী রাধা খুন হ'ল। কেউ জানল না, কেউ, দেখল না। দিন দশেক পরে জামালপুর রেল স্টেশনে পুলিশ গ্রেপ্তার করল মাণিক নামের এক সাইকেল মেকানিক্সকে। কোর্টে মাণিক স্বীকার করল, হ্যাঁ, আমিই রাধাকে খুন করেছি। মাণিকের সাজা হ'ল।

ঐ কাঁচা বয়সে আমি ভেবে অবাক হই, এই লালবাজারের পুলিশ জানল কীভাবে এই মাণিকই খুনী ? সে ঠিক ঐ সময় ট্রেন ধরার জন্ম জামালপুর স্টেশনে থাকবে; এ খবরই বা লালবাজারে পৌছল কেমন করে ? যত ভাবি তত বেশী বিস্মিত হই।

'বলো হরি, হরি বোল'। লালাজী অফিস ঘরের জানলা দিয়ে দেখলেন, একদল ছেলে মড়া নিয়ে আসছে। লালাজী সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে দারোয়ানকে বললেন, নাও, দরজা বন্ধ করো। আমি যাচ্ছি। দারোয়ান তালা লাগায়। লালাজী নিজে দাঁড়িয়ে দেখেন। ইতিমধ্যে ছেলেগুলো ক্লান্ত হয়ে কাঁধ থেকে মড়ার খাটিয়া নামায় ঠিক কারখানার গেটের কাছে। গেটের সামনে লালাজীর গাড়ী। গাড়ীর সামনে বসে আছে ড্রাইভার। ঐ গাড়ীর সামনে আরও একটা গাড়ী। বোধহয় হঠাৎ খারাপ হয়েছে। ড্রাইভার স্টার্ট করার চেষ্টা করছে কিন্তু হচ্ছে না। শ্মশানযাত্রীরা কোমরের গামছা খুলে মুখের ঘাম মোছে। ওদিকে লালাজী বেরিয়ে আসতেই দারোয়ান কারখানার মেন গেটের ভিতর দিকে তালা লাগায়। লালাজী নিজের গাড়ীতে বসতেই ড্রাইভার স্টার্ট দিয়েই হর্ণ বাজায়। সামনের গাড়ীকে পথ ছেড়ে দিতে বলে কিন্তু ও গাড়ী তখনও স্টার্ট হয়নি। লালাজীর গাড়ী ব্যাক করতে পারে না; পিছনেই মড়ার খাটিয়া। সামনের গাড়ীর ড্রাইভারের অনুরোধে লালাজীর ড্রাইভার ও গাড়ীকে ধাক্কা দিতে যায়।

হঠাৎ দুম দাম। লালাজীর চিৎকার। লালাজীর ড্রাইভারের আর্তনাদ। শ্মশানযাত্রী ছেলেরা লালাজীর হাত থেকে ব্যাগ ছিনিয়ে অন্য গাড়ীতে হাওয়া। মড়া ? না, মড়াও নেই।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই একদল লোক জমে গেল। এলো পুলিশের বেতার গাড়ী, থানার দারোগা-কনস্টেবল। একটু পরেই এলেন লালবাজারের গোয়েন্দারা। পরের দিন খবরের কাগজে বড় বড় হরফে ছাপা হল, শ্মশানযাত্রীদের ডাকাতি : পাঁচ লাখ টাকা উধাও।

তিন দিন পর এই ডাকাতির সঙ্গে জড়িত সন্দেহে একজনকে গ্রেপ্তার করা হ'ল নবদ্বীপে। পরের দিন আসানসোলে আটক করা হ'ল একখানা মোটর গাড়ী। এক সপ্তাহ চুপচাপ। তারপর একসঙ্গে তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হ'ল বোম্বের এক বিখ্যাত হোটেল থেকে। দুদিন পরে আরো দুজনকে ধরা হ'ল কাশীর ডাল-কা-মণ্ডীর এক বিখ্যাত বাঈজীর নাচ-গানের আসরে। সাড়ে তিন লাখের কিছু বেশী টাকাও উদ্ধার হ'ল এদের নানা জনের কাছ থেকে। সব শেষে হাওড়ার এক

চোলাই মদের আড্ডাখানা থেকে যাদের গ্রেপ্তার করা হ'ল, তাদের বাড়ী থেকে পাওয়া গেল বারো হাজার টাকা।

একটা খুন, একটা ডাকাতির কিনারা হতে না হতেই আবার খুন, আবার ডাকাতি। এবার ডাকাতি হ'ল পোস্তার গদীতে; খুন হ'ল পার্কস্ট্রীটের বিরাট ফ্ল্যাটবাড়ীর ছাদে। তবে এ খুনের খবর পুলিশ সঙ্গে সঙ্গে পায়নি। দিন তিনেক আগে ঐ বাড়ীর এক ফ্ল্যাটের এক মহিলা থানায় ফোন করে জানাল, কাল থেকে আমার চাকর উধাও। পুলিশ এসে জানাল, মহিলাটির স্বামী ব্যবসার কাজে কানপুর গেছেন এবং ব্যবসার জন্য ওকে মাসের অর্ধেক সময়ই কলকাতার বাইরে বাইরে ঘুরতে হয়। মহিলার বয়স তিরিশ ও পরমা সুন্দরী। উনি বললেন, চাকরটি পুরনো ও বিশ্বাসী; তাই ওর ভরসায় থাকতে কোন ভয় করে না। চাকরটিকে দেখতে কেমন? দেখে হঠাৎ মনে হবে না, ও চাকর। তাহলে দেখতে ভালই? অন্য ফ্ল্যাটের চাকরদের চাইতে বেশ ভাল। বয়স? ঠিক জানি না তবে চব্বিশ-পঁচিশ হবে। স্বাস্থ্য? খুব ভাল। দেশ কোথায়? তা জানি না তবে পাহাড়ী। কতকাল আপনাদের এখানে কাজ করছে? বোধহয় সাত-আট বছরের বেশী। কিছু চুরি গিয়েছে? না, কিছু চুরি যায়নি। আপনি ওকে বকাবকি করেছিলেন? না।

তিন দিন পর মিস্ত্রীরা ছাদে জলের ট্যাংক মেরামত করতে গেলেই দেখা গেল, তিনতলার ফ্ল্যাটের চাকরটি মরে পড়ে আছে। আত্মহত্যা? না, খুন। গুলী করে খুন। আবার থানা, পুলিশ, গোয়েন্দা। দুদিন পরেই লালবাজারের গোয়েন্দারা ঐ সুন্দরী মহিলাকে গ্রেপ্তার করল। খবরটা লেখার সময় আমি ভেবেই পেলাম না ওকে কেন গ্রেপ্তার করা হ'ল।

পরের দিন রাইটার্স ঘুরে লালবাজারে এসে সোজা সন্তোষদার ঘরে গেলাম। উনি দু-তিনজন সহকর্মীর সঙ্গে গল্প করছিলেন। একটু পরে ওরা নিজেদের জায়গায় চলে যেতেই আমি সন্তোষদাকে জিজ্ঞাসা করলাম, আচ্ছা দাদা, শেষ পর্যন্ত ঐ মহিলাকেই এ্যারেষ্ট করলেন কেন?

সন্তোষদা সোজাসুজি আমার মুখের দিকে তাকিয়ে একটু হেসে বললেন, সত্যি শুনবে?

—হ্যাঁ শুনব।

—ঐ হারামজাদীই ছেলেটাকে খুন করেছে।

—উনি কেন খুন করবেন?

সন্তোষদা আবার হেসে বলেন, সব কথা বলব ?

—হ্যাঁ বলুন।

—না, সব কথা বলব না। তবে শুনে নাও, ঐ হারামজাদীর চরিত্র খারাপ। স্বামী বাইরে গেলে ঐ চাকরটাকে নিয়েই উনি স্ফূর্তি করতেন।……

— যার সঙ্গে স্ফূর্তি করে তাকে কেউ মারে ?

-- হ্যাঁ মারে। সবকিছু জানাজানি হবার ভয়ে অনেক সময়ই এ ধরনের মার্ডার হয়।

সব কিছু না বুঝলেও অনেকটা বুঝলাম। তাই আমি আর প্রশ্ন করি না।

সন্তোষদা লালবাজারের ঝানু গোয়েন্দা। খুনী আর ডাকাত ধরতে কলকাতা পুলিশে এমন লোক আর নেই বললেই চলে। দীর্ঘ বলিষ্ঠ চেহারা। রঙটা একটু ময়লা হলেও সুন্দর মুখশ্রী। সব চাইতে দৃষ্টি আকর্ষণ করে দুটি চোখ আর প্রশস্ত ললাট। সব মিলিয়ে সুপুরুষ। ধনী না হলেও অত্যন্ত স্বচ্ছল পরিবারের ছেলে। নিজের মোটরগাড়ী চালিয়ে লালবাজার আসেন। পোষাক-পরিচ্ছদেও রুচি ও বৈশিষ্ট্য সবার চোখে পড়ে। এছাড়া সন্তোষদার জুতার বিলাসিতা বহু সৌখিন লোককেও বিস্মিত করে।

লালবাজারে যাতায়াত করতে করতেই শুনেছি, সন্তোষদা চিরকুমার। কনফার্মড ব্যাচেলার।

সব মিলিয়ে সন্তোষদাকে আমার বেশ লাগে। একে গোয়েন্দা, তার উপর এমন মিশুকে ও স্নেহপ্রবণ। তখন ফেলুদার জন্ম না হলেও কিরীটি রায়ের কৃপায় গোয়েন্দাদের সম্পর্কে আগ্রহের সীমা নেই। তাইতো আমি আরো এগিয়ে যাই। সন্তোষদার ঘনিষ্ঠ হই। কিছুতেই ভেবে পাই না, এই স্নেহপ্রবণ অমায়িক মানুষটা কীভাবে খুনী বা ডাকাত ধরেন। লালবাজারে ওঁর ঘরে বহু খুনী, বহু ডাকাত দেখেছি। সবাই ভয়ে কাঁপে।

যাদের আমরা সবাই ভয় করি, তারা সন্তোষদাকে দেখে ভয় পেলেও লালবাজারের বাইরে ওঁকে দেখে অবাক না হয়ে পারি না। আমার বয়স তখন বেশী নয়। অনেক কিছুই বুঝি না কিন্তু বেশ বুঝতে পারি উনি ব্যাচেলার হলেও সংসারের প্রতি বড় আসক্ত। আসক্ত না হলে কেউ অত ঘুরে-ফিরে বাজার করে ? বাজারে আম ওঠেনি কিন্তু চিৎপুরের ফলপট্টিতে দু-এক ঝুড়ি আম এলেই সন্তোষদা আম কিনবেন। শিয়ালদা বাজারে পাটালি গুড় ওঠার বহু আগেই কাউকে ধরে উনি পাটালি আনবেনই। সব কিছুর ব্যাপারেই এইরকম। সহকর্মীদের কাছে

বা ধর্মতলার কোন দোকানে ফ্রকের ভাল কাপড় দেখলেই সন্তোষদা দু-গজ কিনবেনই। যেদিন আর কিছু কেনার নেই, সেদিনও কিছু ট্রফি-বিস্কুট বা এক শিশি আচার কিনবেনই।

আমি অবাক হই। মনে মনে ভাবি, শুনেছি, সন্তোষদার কোন ভাইবোনও নেই। তবে প্রতিদিন এসব কেনেন কাদের জন্য ? সন্তোষদা কি লুকিয়ে-চুরিয়ে বিয়ে করেছেন ? নিজের মনে নিজেই বলি, না, না, তা কখনও হতে পারে না। চরিত্রহীন মানুষ কখনই এত ভাল হতে পারে না। কিন্তু .....

মনের মধ্যে ঐ কিন্তুটা থেকেই যায়।

তারপর একদিন বিকেলের দিকে এক রাস্তার মোড়ে দূর থেকে সন্তোষদাকে দেখেই আমি থমকে দাঁড়ালাম। হাতে এক বোতল হরলিক্স। চঞ্চল পায়ে পায়চারী করতে করতে বার বার হাতের ঘড়ি দেখছেন। চোখে-মুখে উৎকণ্ঠা, তেমনি বিরক্তি। মাঝে মাঝে দাঁড়িয়ে ঝানু গোয়েন্দার দৃষ্টিতে একবার চারদিক দেখছেন। আমি আর দূরে দাঁড়িয়ে থাকতে পারি না। রাস্তা পার হয়ে ওঁর কাছে যাই।

—কী হ'ল সন্তোষদা ? আপনি এখন এখানে দাঁড়িয়ে ?

—আর বলিস না, মেয়েটা আমাকে মেরে ফেলবে। সন্তোষদার চোখে সেই উৎকণ্ঠা, গলার স্বরে কেমন একটা ব্যাকুলতা।

আমি ওঁর কথার অর্থ বুঝতে পারি না। তাই অবাক হয়ে ওঁর দিকে তাকাই কিন্তু কোন প্রশ্ন করি না।

বোধহয় আমাকে আপন মনে করেন সন্তোষদা। আমার দিকে তাকিয়ে হঠাৎ গড় গড় করে বলে যান, বাপ-মা মরা দেড় বছরের মেয়েটাকে কিভাবে মানুষ করেছি, তা তুই ভাবতে পারবি না। সে দুর্দিনে মামার বাড়ির কারুর টিকি দেখতে পাইনি। আর এখন ?

আমি বোবা হয়ে ওঁর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকি। উনি এক নিঃশ্বাসে বলে যান, এখন যে মেয়ে বড় হয়েছে ; এখন তো ওর কোন ঝামেলা নেই। একে পরমা সুন্দরী, তার উপর লেখাপড়ায় ব্রিলিয়াণ্ট। এখন মামাবাড়ির দরদ উপচে পড়ছে।

এবার কিছুটা আন্দাজ করতে পারি। প্রশ্ন করি, তা এখানে হরলিক্সের শিশি হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন কেন ?

আমার প্রশ্ন শুনেই সন্তোষদা দপ্ করে জ্বলে ওঠেন, যে মেয়েটা জীবনে

কোনদিন চা খায়নি, এখন মামাবাড়িতে ঘণ্টায় ঘণ্টায় তাকে চা খাওয়ানো হচ্ছে। চা খেলে ছেলেমেয়ের শরীর থাকে? তারপর যদি একবার মেয়েটা অসুস্থ হয়, তখন তো মামাবাড়ি ধারেও ঘেষবে না।

— তাই কী ওকে হরলিক্স খাওয়াবেন? আমি হেসে প্রশ্ন করি।

সন্তোষদা বেশ একটু রেগেই বললেন, মহারাণীকে বলেছি, আমি এখানে হরলিক্স নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকব। উনি যেন কলেজ থেকে ফেরার পথে দয়া করে……

উনি কথা শেষ করার আগেই আমি প্রশ্ন করি, ও কী এখন মামাবাড়িতে থাকে?

—আমি কী মরে গেছি যে ও মামাবাড়িতে থাকবে? দিন দশেকের জন্য বেড়াতে গেছে।

হঠাৎ একটা মেয়ে সন্তোষদার সামনে এসে হাসতে হাসতে বললো, আচ্ছা, কাকু, দশদিনের জন্য মামাবাড়িতে গেছি বলেই এত রাগছ, তাহলে আমি শ্বশুর বাড়ি গেলে তুমি তো পাগল হয়ে যাবে।

— চুপ কর, চুপ কর। বাজে বকিস না। আমি কখন থেকে দাঁড়িয়ে আছি জানিস?

মেয়েটির মুখে তখনও হাসি। বলে, তুমি যদি এক ঘণ্টা আগে এসেই দাঁড়িয়ে থাক, তার জন্য কী আমি দায়ী? আমি তো দশ-পনের মিনিট ধরে তোমাদের কথা শুনছি।

এবার সন্তোষদা না হেসে পারেন না। হাসতে হাসতে আমাকে বলেন, মেয়ের কথা শুনছিস? মেয়ে বাসস্ট্যাণ্ডে এসে দাঁড়িয়ে থাকবে, সেটা ভাল? নাকি আমার একটু আগে আসা ভাল?

সন্তোষদার ভাইঝি আত্রেয়ী আমাকে বলে, আমার কলেজ ছুটি হবে সাড়ে চারটেয়; আর কাকু সাড়ে তিনটে-পৌনে চারটে থেকে ড্রাইভারদের মত গাড়ী নিয়ে কলেজের গেটের সামনে বসে থাকবে।……

সন্তোষদা সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করেন, অত আগে মোটেও যাই না। তবে কলকাতার পথঘাটে কখন কি হয়, তার তো ঠিক নেই; তাই হাতে একটু সময় নিয়ে যাই।

একথা-সেকথার পর আত্রেয়ী বললো, তুমি হরলিক্স বাড়ি নিয়ে যাও।……

সন্তোষদা ঐ বাসস্ট্যাণ্ডে দাঁড়িয়েই প্রায় চিৎকার করে ওঠেন, আরো সপ্তাহ

খানেক চা খেয়ে খেয়ে লিভারটার বারোটা না বাজালে বুঝি তোর মামাবাড়ির সবাই খুশি হচ্ছে না ?

আত্রেয়ী সন্তোষদার একটা হাত ধরে বললো, রাস্তায় দাঁড়িয়ে ঝগড়া না করে চলো বাড়ি যাই।

খুশিতে, আনন্দে সন্তোষদা আবার চিৎকার করে ওঠেন, তুই বাড়ি যাবি ? মামাবাড়ি যাবি না ?

আত্রেয়ী একটু চাপা হাসি হেসে বললো, আমি দু-দিনের জন্য কোথাও গেলেই যদি তুমি ঠিকমত খাওয়া-দাওয়া না কর, তাহলে আমি বাড়ি না গিয়ে কী করব ?

সন্তোষদা ওকে জড়িয়ে ধরে বললেন, চল, চল, বাড়িই চল। তুই না থাকলে বাড়িতে টি\`কতে পারি না।

ওঁরা গাড়ীতে উঠলেন। আমি হাজরা পার্কের জনসভার রিপোর্ট সংগ্রহ করতে বাসে উঠলাম।

মাঝে মাঝে সন্তোষদার বাড়িতেও যেতাম কারণে-অকারণে। সেদিন সকালে সন্তোষদার বাড়িতে গিয়েই দেখি, তুমুল কাণ্ড। আত্রেয়ী বেশ রেগে বলছে, আজ তুমি বেরুলে আমি জলস্পর্শ করব না। দেখি তুমি কী করে বেরোও ?

—তুই ধমক দিয়ে আমাকে বাড়ি বসিয়ে রাখবি ?

—একশ'বার রাখব। যে লোকটা তিন রাত্তির ঘুমোয় না, তাকে আমি কিছুতেই অফিস যেতে দেব না।

—তুই জানিস না আমি কী কাজ করি ? আমি অফিস না গেলে মহা কেলেংকারী হবে।

—যা ইচ্ছে, তাই হোক। একে রবিবার। তার উপর তিন রাত ঘুমোও না। তুমি খেয়েদেয়ে চুপটি করে আমার ঘরে শুয়ে থাকবে।

—তোর ঘরে শোব কেন ? আমার কী ঘর নেই ?

—তুমি তোমার ঘরে শুলে পঞ্চাশবার টেলিফোন আসবে আর পঞ্চাশবার তুমি টেলিফোন করবে, তা হবে না।

সন্তোষদা আর তর্ক করতে পারেন না। আমার দিকে তাকিয়ে হেসে বলেন, দেখছিস, মেয়েটা একটা গুণ্ডা হয়েছে।

আমি হেসে বলি, এমন গুণ্ডা না হলে তো আপনাকে ঠিক রাখা যাবে না।

সন্তোষদা বেশ করুণ মুখে আমাকে বললেন, নারে ভাই, সত্যি বলছি, আজ

আমার খুব জরুরী কাজ আছে।

আত্রেয়ী বললো, আমি ডি-সি-কে ফোন করে বলে দিচ্ছি, তোমার শরীর ভাল না ; তুমি আজ অফিস যাবে না।

—না, না, তোকে ফোন করতে হবে না ; আমিই ফোন করছি।

সন্তোষদা ফোন করার জন্য নিজের ঘরে যেতেই আত্রেয়ী আমাকে বললো, সামনেই আমার ফাইন্যাল পরীক্ষা বলে রাত দেড়টা-দুটো পর্যন্ত পড়াশুনা করি বলে কাকুও ঘুমোবে না।

—তাই নাকি ?

—তবে কী ? আমাকে শুইয়ে দিয়ে তবে কাকু শোবে।

আমি হাসি।

আত্রেয়ী আবার বলে, আমি তো বেলা করে উঠি কিন্তু কাকু তো উঠবে সেই ভোর পাঁচটায়। দিনের বেলায় কাকুর বিশ্রাম করার সময় নেই। এর উপর গত তিন রাত লোকটা এক মিনিটের জন্য ঘুমোয় নি। বলুন তো, লোকটা ডিটেকটিভ ডিপার্টমেণ্টে কাজ করে বলে কী গভর্ণমেণ্ট মাথা কিনে নিয়েছে ?

এমন সময় সন্তোষদা বসার ঘরে ঢুকে আত্রেয়ীকে বললেন, তুই গত জন্মে আমার সৎমা ছিলি।

আত্রেয়ী হেসে বললো, সামনের জন্মে আবার সৎমা হবো।

—আগে তো এ জন্মে তোর হাত থেকে নিস্তার পাই। তারপর সামনের জন্মের কথা ভেবে দেখব।

হঠাৎ আত্রেয়ী সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে দু-হাত দিয়ে সন্তোষদার গলা জড়িয়ে ধরে আমার দিকে তাকিয়ে বলে, যাই বলুন, আমার ছেলেটা আমার কথা শোনে।

সন্তোষদা হাসতে হাসতে বললেন, থাক্, থাক! কাজকর্মের বারোটা বাজিয়ে এখন আর আমার প্রশংসা করতে হবে না।

আমি ওঁদের দুজনকে দেখে মুগ্ধ হয়ে যাই।

আত্রেয়ী বি এ পাশ করে ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হবার পর পরই আমি দিল্লী চলে গেলাম। মাঝে মাঝে কলকাতা আসি। কখনও একলা, কখনও ভি আই পি-দের সঙ্গে কিন্তু সন্তোষদার সঙ্গে দেখা হয় না। বহুকাল। তবে মাঝে মাঝেই ওঁদের দুজনের কথা মনে হয়। মনে মনে ভাবি, এতদিনে নিশ্চয়ই খুব ভাল পাত্রের সঙ্গে আত্রেয়ীর বিয়ে হয়েছে। দুটো-একটা ছেলেমেয়েও হয়েছে। সন্তোষদা আগে কোনকালে ছুটি না নিলেও এখন নিশ্চয়ই ছুটি নিয়ে ছুটে যান

আত্রেয়ীর কাছে। নাতি-নাতনীর কাছে। মনে মনে আরো কত কি ভাবি। ভাবতে ভাবতে স্বপ্ন দেখি।

বেশ ক'বছর পরের কথা। ভি আই পি রোডের ধারে বিধান শিশু উদ্যানের শিলান্যাস করতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কয়েক ঘণ্টার জন্য কলকাতা এলেন। সঙ্গে আমিও এসেছি। না এসে পারি নি। দমদম এয়ারপোর্টে নেমেই দেখি, বেশ বৃষ্টি হচ্ছে। অনুষ্ঠানস্থলে পৌঁছতে না পৌঁছতেই মুষলধারে বৃষ্টি এলো। ওখানে পৌঁছে দেখি, চারপাশে শুধু পুলিশ।

নেতারা মঞ্চে উঠতেই আমি বাইরে এসে ঘুরে-ফিরে পরিচিত সাংবাদিক ও অফিসারদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে হঠাৎ একজন পুলিশ অফিসারকে দেখেই মনে হল, উনি আমার পরিচিত। আস্তে আস্তে ওঁর সামনে এগিয়ে গেলাম। অপলক দৃষ্টিতে ওঁর দিকে তাকিয়ে রইলাম। তারপর বললাম, সন্তোষদা না?

উনি একটু হেসে বললেন, হ্যাঁ।

—একি চেহারা হয়েছে আপনার? দেখে তো চেনাই যায় না।

উনি কোন কথা বললেন না। শুধু একটু ম্লান হাসি হেসে চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

আমার হাতে বেশী সময় নেই। যে কোন মুহূর্তে অনুষ্ঠান শেষ হবে। সঙ্গে সঙ্গে আমাকে ছুটতে হবে দমদম এয়ারপোর্ট। ওখানে ইণ্ডিয়ান এয়ারফোর্সের স্পেশ্যাল প্লেন রাজহংস দাঁড়িয়ে আছে আমাদের নিয়ে যাবার জন্য। তাই বেশী কথা না বলে প্রশ্ন করি, আত্রেয়ী কেমন আছে?

সন্তোষদা দাঁত দিয়ে ঠোঁটটা কামড়ে মাথা নেড়ে বললেন, সে আর নেই।

—কী বললেন?

—নারে ভাই, তাকে আর ধরে রাখতে পারলাম না।

মুহূর্তের জন্য আমি যেন সমস্ত বাকশক্তি হারিয়ে ফেললাম। একটু পরে নিজেকে একটু সামলে নিয়ে বললাম, বিয়ে দিয়েছিলেন?

সন্তোষদা আবার মাথা নেড়ে বললেন, হ্যাঁ। তারপর হঠাৎ উনি একটু হেসে বললেন, ও তো জানে আমি একলা থাকতে পারি না, তাই ছয় মাসের একটা বাচ্চা রেখে গেছে।

আমি আর সহ্য করতে পারি না। মাথায় হাত দিয়ে বললাম, ইস!

—ইস কিরে! আমি আমার সাধনা দিদিকে নিয়ে আবার নতুন সাধনা শুরু করেছি।

আমি আর সন্তোষদার দিকে তাকাতে পারি না। মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে থাকি।

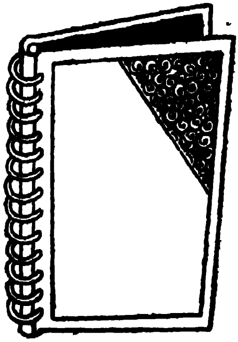
সন্তোষদা আমার একখানা হাত ধরে বললেন, ওর কথা তুইও ভুলতে পারিস নি?

আমি মুখে কিছু বলতে পারি না। শুধু মাথা নেড়ে বলি, না।

সন্তোষদা বললেন, এ জন্মের কথা তো বাদই দিলাম; সামনের জন্মেও আমি হতভাগীকে ভুলতে পারব না।

অনুষ্ঠান শেষ। আমাকে দৌড়ে গাড়ীতে উঠতে হবে। আমি কিছু বলে সন্তোষদার কাছ থেকে বিদায় নিতে পারলাম না। নেব কেমন করে? উনি যে তখন রুমাল দিয়ে মুখ ঢেকে চোখের জল লুকোবার চেষ্টা করছেন।

গাড়ীতে উঠে দেখি, পুলিশের সবাই এ্যাটেনশন হয়ে দাঁড়িয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে স্যালুট করছেন। ব্যতিক্রম শুধু সন্তোষদা। উনি তখনও চোখে-মুখে রুমাল চাপা দিয়ে মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে আছেন।



বইমেলা

জীবনের তাগিদে কলকাতা ছেড়ে দিল্লী চলে গেলাম কিন্তু কখনই বেশিদিন কলকাতা না দেখে থাকতে পারি না। সুযোগ পেলেই ছুটে আসি কলকাতায়। কখনও একদিন, কখনও এক সপ্তাহ থেকে ফিরে যাই। একবার এক ভি আই পি-র সঙ্গে মাত্র দু ঘণ্টার জন্য কলকাতা আসি। না এসে পারি নি।

কলকাতা যেন আমার প্রথম প্রেম। প্রথম প্রণয়ী। কিছুতেই ভুলতে পারি না। জানি, আমার প্রথম প্রণয়ী আর আমার নেই। তবু কাছে যেতে, কাছে পেতে মনে মনে পাগল হয়ে উঠি। আসার সময় যত আশা নিয়ে আসি, যত প্রত্যাশা মনের মধ্যে লুকিয়ে থাকে, ফিরে যাবার সময়, ঠিক ততটাই দুঃখ, আশাভঙ্গের বোঝা বয়ে নিয়ে যাই।

তবু আসি। আবার আসব। বারবার আসব। না এসে পারব না। এ যে কলকাতা! এর বাতাসে নাকি বিষ আছে। ডিজেলের ধোঁয়া, শত-সহস্র কারখানার লক্ষ চিমনির বিষোদ্গার, লক্ষ লক্ষ মানুষের হাহাকার আর দীর্ঘশ্বাস কলকাতার বাতাসকে বিষাক্ত করে তুলেছে। তুলুক। এই বিষাক্ত বাতাসই বুক ভরে নিই। নেবোই। এ বাতাসে যে আমার শৈশবের কান্না, কৈশোরের হাসি মিশে আছে। কলকাতা আমার যৌবনের উপবন, হয়ত বার্ধক্যের বারাণসীও।

এত ঘন ঘন আসা-যাওয়া করলেও বিশুদ্ধ প্রবাসী বাঙ্গালীর মত তাঁতের শাড়ি বা পাটালি গুড় কিনি না; দেখি না বাংলা সিনেমা বা থিয়েটার। হানা দিই না কোন আত্মীয়-গৃহ, রসনা তৃপ্তি করি না গঙ্গার ইলিশ বা সোনা মুগের ডাল

দিয়ে। সামান্য কাজকর্ম আর বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিয়েই ফিরে যাই। কিছু দেখা, কিছু শোনার ইচ্ছে থাকলেও হয়ে ওঠে না।

যেমন বইমেলা। এত বছর ধরে বইমেলা হচ্ছে। কিন্তু আমার দেখার সুযোগ হয় নি। কখনও বইমেলা শুরু হবার দু-একদিন আগে ফিরে গেছি, কখনও বইমেলা শেষ হবার পরদিন এসে পেঁৗচেছি। এতকাল পরে প্রথম বইমেলা দেখলাম এবার। এইত ক মাস আগে।

প্রথম কলকাতার বইমেলা দেখছি। যেমন আগ্রহ, তেমন কৌতূহক। শত কাজের মধ্যেও রোজ একবার যাই। কখনও অপরাহ্নে কখনও সন্ধ্যায়। অপরাহ্নে বা সন্ধ্যার সময় না হলে রাত্তিরের দিকে যাই। যেদিন কাজ কম, হাতে সময় আছে, সেদিন দু-এক ঘণ্টা কাটাই। কোনদিন আবার এক গেট দিয়ে ঢুকে অন্য গেট দিয়ে বেরিয়ে যাই।

বইমেলার বই দেখি। নানা ভাষার, নানা বিষয়ের বই। দামী বই, সস্তা বই। দেশী বই, বিদেশী বই। দেখতে দেখতে বিস্মিত হই। বিস্মিত হই মানুষ দেখেও। বইয়ের বৈচিত্র্যের চাইতে মানুষের বৈচিত্র্যও কম নয়, বরং বেশি। বইমেলা যেন মানুষেররও মেলা। হবেই তো। এমন নিরানন্দময় শহর তো ভূ-ভারতে নেই। এতগুলো প্রাণবন্ত ভাবুক মানুষ করবে কী? যেখানে সামান্য বৈচিত্র্য আনন্দের স্বাদ পায়, সেখানেই ছুটে যায়। ভিড় হয হাজাব-লক্ষ মানুষের। শুরু হয় মানুষেরা মেলা।

প্রথম দিন দেখি নি, এলেও জানতে পারি নি। অত বড় বইমেলায় কী সব মানুষকে দেখা যায়? দ্বিতীয় দিন দূর থেকে দেখেই চিনতে পারলাম। না চেনার কোন কারণ নেই। বন্ধুর বন্ধু ও প্রতিবেশী। তা হোক আশিস আমারও বন্ধু। খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু না হলেও বন্ধু। মনের সুখ-দুঃখ সব খুলে না বললেও কলেজে পড়ার সময় অনেক আড্ডা দিয়েছি ওর সঙ্গে। কলেজ ছাড়ার পর অবশ্য কমই দেখা হতো। তবে মনে আছে, আশিস মাঝে মাঝে আমাদের কাগজের অফিসে আসত রবিবাসরীয় বিভাগে কবিতা জমা দেবার জন্য। আমি কলকাতা ছাড়ার পর ওর সঙ্গে আর দেখা হয় নি। তবে শুনেছি, আশিস ব্যবসা বাণিজ্য করে বছরে লাখ লাখ টাকা আয় করে। এক কথায় ও এখন গণ্যমান্য ব্যক্তি।

তাই দূর থেকে আশিসকে দেখে এগিয়ে গেলাম ওর দিকে। ওকে লক্ষ্য রেখে এগুতে গিয়ে কিছু মানুষকে ধাক্কা দিলাম, কিছু মানুষের ধাক্কা খেলাম। দু'চারজন মন্তব্যও করলেন। গ্রাহ্য করলাম না কিছুই। পুরানো দিনের বন্ধুর কাছে যাবার

জন্য এগিয়ে গেলাম।

আশিস তখন আমার দূরে নয়, বেশ কাছে। একটু জোরে ডাকলেই ও শুনতে পাবে। অথবা আর দু'চার পা এগুলেই ওর পাশে দাঁড়াতে পারি। কিন্তু না, আর এক পা এগুলাম না। ওকে ডাকলাম না। মনে হল, ও যেন কাকে খুঁজছে। হয়ত স্ত্রী বা ছেলেমেয়ে অথবা অন্য কাউকে। হয়ত অনেক দূরে দেখতে পেয়েছে। আমি ডাক দিলেই ও অন্যমনস্ক হবে। যাকে খুঁজছে সে হয়ত মানুষের মেলায় হারিয়ে যাবে। সেদিন দূর থেকে আশিসকে দেখেই ফিরে এলাম।

পরের দিন আবার গেছি। ঘুরছি এদিক ওদিক। কিছু পরিচিত মানুষের সঙ্গে দেখা হচ্ছে। কথা বলছি। আবার এগিয়ে যাই ডাইনে-বাঁয়ে। আবার কেউ না কেউ এগিয়ে আসেন। কথা বলি। হয়ত চা খাই, কফি খাই। সিগারেট টানি। দুটো চোখ স্থির হয়ে থাকে না। আমি এক জায়গায় বসে-দাঁড়িয়ে থাকলেও চোখ দুটো ঘুরে-ফিরে কত কি দেখে। না দেখে পারে না। হঠাৎ চা কফি খেতে খেতে উঠে দাঁড়াই। খানিকটা দূরে আশিসকে দেখে অবাক হই। আজও এসেছে? তাড়াতাড়ি এগিয়ে যাই। ওর পাশে গিয়েও থমকে দাঁড়াই। আজও ও যেন কাকে খুজছে। ব্যাকুল হয়ে খুঁজছে। কত হাজার হাজার মানুষ ওর সামনে দিয়ে ঘুরছে, কিন্তু না, ও তাদের কাউকে খুঁজছে না। খুঁজছে অন্য কাইকে। ওর দুটো চোখে এমন ব্যাকুলতা দেখলাম যে, সেদিনও ডাকতে পারলাম না। দ্বিধা হল, সংকোচ হল।

প্রথম বইমেলা দেখার উৎসাহ-উদ্দীপনায় আমি রোজ গেছি। কখনও কোন বইয়ের দোকানে বা কফি হাউসের স্টলে বসেছি, কখনও ঘুরেছি, ফিরেছি, দেখেছি। দেখেছি আশিসকেও। প্রতিদিন। অপরাহ্নে দেখেছি, সন্ধ্যায় দেখেছি, রাত্রিতেও। সব সময়ই ও যেন কাকে খুঁজছে। চোখে সেই ব্যাকুলতা। হঠাৎ দেখলে মনে হয়, আশিস যেন কাঁদছে। খুজে খুঁজে ও যেন ক্লান্ত। আর যেন পারছে না। অসহ্য। হাউ হাউ করে কাঁদতে চাইছে কিন্তু পারছে না। ও যে এখন গণ্যমান্য ব্যক্তি! ও কী কাঁদতে পারে? ছি, ছি! লোকে বলবে কী? এ সংসারে কান্নার অধিকার কী শুধু অবোধ শিশুদের? দুঃখ, ব্যথা-বেদনা কী শুধু দরিদ্রের সম্পদ?

মনে মনে ভাবি, আশিস কী সোনার হরিণ খুঁজছে?

বইমেলার মেয়াদ ফুরিয়ে এল। আবার বাড়িয়ে দেওয়া হল দু'তিন দিন। আমি তখনও গেছি। তখনও দেখেছি আশিসকে।

বইমেলা যেদিন শেষ হচ্ছে সেদিন আর আশিসকে দূর থেকে দেখলাম না। এগিয়ে গেলাম। কাছে গিয়ে থমকে দাঁড়ালাম না। ওর কাঁধে আলতো করে হাত রাখতেই ও চমকে উঠল। অবাক হয়ে বলল, তুই ?

আমি একটু হেসে বললাম, হ্যাঁ আমি।

—দিল্লী থেকে কবে এলি ?

—কদিন আগে।

আশিস একটু হেসে বলল, তোর সব লেখা পড়ি।

—পড়িস ?

—হ্যাঁ, পড়ি। তারপর একটু থেমে, আমার চোখের পর চোখ রেখে একটু হেসে বলল, তোর মেমসাহেব যে কতবার পড়েছি তার ঠিকঠিকানা নেই।

আমি হাসি। বলি, তুইও কী তোর মেমসাহেবকে পাস নি ?

আশিস হো হো করে হেসে ওঠে। তারপব বলে, আমার আবার মেমসাহেব! এখন আমি বিজনেসের প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছি।

আমি মুখ টিপে হাসতে হাসতে মাথা নাড়ি। বলি, যে রাঁধে সে বুঝি চুল বাঁধে না ?

আশিসেব মুখে হাসি যেন আরো উজ্জ্বল হয়। বলে, না, না, আমি শুধু রাঁধি ; চুল বাঁধি না।

আমি আর কথা না বাড়িয়ে একটু চাপা গলায় ওকে জিজ্ঞেস করলাম, দেখা হয়েছে ?

ও ভূত দেখার মত চমকে উঠেই সামলে নিল। তারপর একটু হেসে বলল, কার দেখা ? কী দেখা ?

—যাকে খুঁজছিলি, তার দেখা পেয়েছিস ?

আশিষ যেন একটু ঘাবড়ে যায় ; বলে, কাকে আবার খুঁজলাম ? আমি তো কাউকে খুঁজি নি।

আমি হেসে বললাম, কেন লুকোবারা চেষ্টা করছিস ? আমি বইমেলায় তোকে রোজ……

আমাকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই ও আমার হাত চেপে ধরে বলল, তুই কি রোজ আমাকে দেখেছিস ?

আমি মাথা নেড়ে বললাম, হ্যাঁ।

আশিস মুহূর্তের জন্য মুখ নীচু করে রইল। তারপর আমার হাত ধরে বলল,

চল, কোথাও বসি।

বইমেলার চত্বরে না, মেলা প্রাঙ্গণের বাইরে, রেসকোর্সের ধারে আশিস আমাকে নিয়ে বসল। কোন ভূমিকা না করেই বলল, তুই ঠিকই দেখেছিস, আমি রোজ বইমেলায় এসেছি শুধু একজনের দেখা পাবার আশায়।

আমি কোন প্রশ্ন করি না। চুপ করে বসে থাকি। ওর কথা শুনি।

কয়েক বছর আগেই দেশ স্বাধীন হয়েছে। চারিদিকে হাহাকার। ছিন্নমূল উদ্বাস্তু ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছে সর্বত্র। শহরে-নগরে, গ্রামে-গঞ্জে, মাঠে-ঘাটে। কলকাতার রাজপথে নিরন্ন মানুষের মিছিল। শ্রমিক, চাষী, মধ্যবিত্তের সংসারে হাহাকার। কখনও কখনও তারা গর্জে ওঠে লাটসাহেবের বাড়ির কাছে, রাইটার্স বিল্ডিং-এর কিছু দূরে। আরা, বালিয়া, ছাপরার বশম্বদ পুলিশ অকৃপণ ঔদার্যে লাঠি চালায়, গুলী করে। রক্তগঙ্গা বয়ে যায় কলকাতার রাজপথে। বাঙ্গালীর ঘরে তখন শনির দশা।

আশিসকে তার বাবা সোজাসুজি বললেন, বি এ পড়তে হলে টিউশনি করে পড়ার খরচ চালাতে হবে তোমাকেই। আমি এক পয়সাও দিতে পারব না।

আশিস সকালে-সন্ধ্যেয় ছাত্র পড়ায়। সারা মাস বক বক করে কোথায় দশ, কোথায় পনের। দুপুরে কলেজ। এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জে নাম লেখায়, অকল্যাণ্ড রোডের অফিসে হাঁটাহাঁটি করে। সময় সুযোগমত সবিনয়ে তাগিদ দেয়। চাকরিও জোটে না, রিফিউজী লোনও জোটে না; জোটে অপমান। সরকারী কর্মচারীদের খিঁচুনি।

কোনমতে গড়িয়ে গড়িয়ে দুটো বছর কাটল। কিন্তু বি এ পাশ করার পরই আশিস যেন হোঁচট খায়। থমকে দাঁড়ায়। এবার?

কলকাতার ময়দানে সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এসেছে। শত সহস্রলক্ষ মানুষের ভাগ্য পরীক্ষার কুরুক্ষেত্র রেসকোর্স বহুজনের ভাগ্য বিড়াম্বনার স্মৃতি রোমন্থন করছে রাতের অন্ধকারে। মনে মনে, চুপি চুপি। ওদিকে বইমেলার রঙীন আলো গাছে গাছে দুলছে, ঝুলছে। হাজার হাজার মানুষের চাপা গুঞ্জন, গাড়ি ঘোড়ার আওয়াজ, বাতাসের শনশনানি ছাপিয়েও বইমেলার লাউডস্পীকারে ছড়িয়ে দিচ্ছে গান—না চাহিলে যারে পাওয়া যায়।

আশিস খুব জোরে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, কী অসহ্য যন্ত্রণায় তখন দিনগুলো কেটেছে, তা হয়ত আন্দাজ করতে পারবি। কিন্তু আমি বলতে পারব না। অকল্যাণ্ডের অফিসে দু হাজার টাকা লোনের জন্য ঘুষ চাইল পাঁচশো।

কিন্তু কোথায় পাব পাঁচশো টাকা? অত টাকা তখন চোখেও দেখি নি।

টিউশনির সংখ্যা বাড়ল। কিন্তু তাতে কি অভাব মেটে?

বাড়িতে টিকতে পারে না আশিস। অবসর সময় ঘুরে বেড়ায়। হানা দেয় এখানে-ওখানে। ক্লান্ত হলে কোথাও একটু বসে। বিশ্রাম করে।

—আরে আপনি?

আশিস গাছে হেলান দিয়ে বসে বসেই একটু হাসে। ম্লান হাসি। বলে, কলেজে পড়ার সময় ন্যাশনাল লাইব্রেরীর কার্ড করিয়েছিলাম। মাঝে মাঝে আসতাম। এখনও কার্ডটা আছে কিন্তু পড়তে আসি না। এদিকে এলে এই গাছতলায় বসে একটু বিশ্রাম করি।

বাণী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওকে দেখে। বোধহয় দু' এক মিনিট। তারপর বলে, তা তো বুঝলাম। কিন্তু আপনার কি হয়েছে বলুন তো।

আশিস ন্যাশনাল লাইব্রেরীর সবুজের মেলায় দৃষ্টি ছড়িয়ে দিয়ে একটু ম্লান হেসে বলে, না কিছু হয় নি।

—আপনি হয় নি বললেই আমি বিশ্বাস করব? আমি কি আপনাকে নতুন দেখছি?

আশিস চুপ করে থাকে।

বাণী প্রশ্ন করে, বাড়িতে কেউ কিছু বলেছেন?

মুখে না, শুধু মাথা নেড়েও বলে, না।

—আজ সারাদিন খান নি?

—খেয়েছি।

—খাওয়া দাওয়া করলে এই চেহারা হয়?

আশিস আবার নীরব।

শেষ অপরাহ্নের সূর্যের তির্যক রশ্মি ন্যাশনাল লাইব্রেরীর উদার প্রান্তর থেকে বিদায় নিয়েছে কিছুক্ষণ আগেই, গোধুলির আলোকটুকুও হারিয়ে যাবে একটু পরেই। বাণী জিজ্ঞেস করে আজ সমুকে পড়াবেন না?

—না! আপনি বরং বলে দেবেন, আমি কাল সকালে যাব।

—খুব ভাল কথা। এবার আপনি উঠুন।

—আপনি যান আমি একটু পরে যাব।

—আবার পরে কেন? এখনই উঠুন।

—না, না, একটু বিশ্রাম করি।

বাণী একটু হেসে আশিসের একটা হাত ধরে টান দেয়। বলে, অনেক বিশ্রাম হয়েছে। এবার উঠুন।

বাণী ধনীর ঘরের দুলালী না হলেও বিত্তবান মধ্যবিত্ত পরিবারের সুন্দরী ও শিক্ষিতা মেয়ে। পড়াশুনায় খুবই ভাল। ম্যাট্রিকে লেটার পেয়েছে দুটি বিষয়ে। অনার্স নিয়ে বি এ পাশ করেছে। আশুতোষ কলেজের মেয়েদের মধ্যে সব চাইতে বেশী নম্বর পেয়ে কি একটা মেডেলও পেয়েছে। কলেজের এক তরুণ অধ্যাপকের সুপারিশে আশিস বাণীর ছোট ভাই সমরের গৃহশিক্ষক নিযুক্ত হয় ক' বছর আগে। প্রথম দিন ওদের বাড়িতে ঢুকেই আশিস থমকে দাঁড়ায়। বিস্মিত মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে কয়েক মুহূর্ত।

আশিস আমার একটা হাত চেপে ধরে বলে, তুই বিশ্বাস কর, সেদিন ওকে দেখে আমি মুগ্ধ হয়ে গেলাম। মনে হল যেন আমি সাক্ষাৎ দুর্গা প্রতিমার সামনে দাঁড়িয়ে আছি। এত স্নিগ্ধ শান্ত পবিত্র রূপ আমি আজ পর্যন্ত দেখি নি।

না, আশিস বিমুগ্ধ হলেও প্রেমে পড়ে নি। সে মন, সে অবসর তার ছিল না। কোনমতে বেঁচে থাকার তাগিদে সে তখন বিব্রত। হয়ত বিভ্রান্তও। সমুকে পড়াতে গিয়ে মাঝে মাঝে দেখা হতো। কখনও মুখোমুখি। আশিস একবার মুখ তুলে বাণীকে দেখেই দৃষ্টি গুটিয়ে নিত। হয়তো একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলতো। কিন্তু লুকিয়ে লুকিয়ে। কদাচিৎ কখনও কথা হতো। তাও দুটো-একটা। অত্যন্ত সাধারণ ম্যামুলি কথা। মুহূর্তের জন্য ওকে দেখে, ঐ সামান্য দুটো একটা কথা বলেই আশিসের মন কানায় কানায় ভরে আনন্দে, আত্মতৃপ্তিতে কিন্তু স্বপ্ন দেখে না। সাহস হয় না।

—বিশ্বাস কর, সেদিন বাণী আমার হাত ধরে টেনে তুলতেই আমি অবাক হয়ে গেলাম। আমার সারা শরীরের মধ্যে দিয়ে আনন্দের বিদ্যুৎ তরঙ্গ বয়ে গেল।

—তারপর ?

—আমাকে দাঁড় করিয়ে রেখে ও ন্যাশনাল লাইব্রেরীর পাবলিক টেলিফোন থেকে একটা টেলিফোন করে এসে আমাকে নিয়ে চৌরঙ্গীর একটা রেস্তরাঁয় ঢুকল। খুব খাওয়ালো।

—কিছু বলল না ?

—হ্যাঁ বলল, কিন্তু সেদিন না, আরেক দিন।

এক নির্জন মধ্যাহ্নে বেলুড় মঠের মন্দিরের ছায়ায় বসে বাণী প্রশ্ন করল, আপনি ভগবান বিশ্বাস করেন ?

—ঠিক বলতে পারব না। একটু থেমে আশিস বলে বোধহয় অবিশ্বাস করি না।

—মানুষকে বিশ্বাস করেন ?

—মনের মত মানুষকে নিশ্চয়ই বিশ্বাস কবি।

—আমাকে বিশ্বাস করেন ?

আশিস চমকে ওঠে। বিস্ময়ে ওকে দেখে। সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিতে পারে না।

—আমাকে বিশ্বাস করতে পারেন না ?

আশিস মাথা নেড়ে বলল, হ্যাঁ, আপনাকে বিশ্বাস করি।

—সত্যি বিশ্বাস করেন ?

—হ্যাঁ।

—কেন ? বাণী একটু হেসে বলে, কবে থেকে আমাকে বিশ্বাস কবেন ?

—প্রথম দিন আপনাদের বাড়িতে গিয়ে আপনাকে দেখেই বুঝেছিলাম, আপনি একটু স্বতন্ত্র।

—কোন তুজন মানুষই তো এক হয় না।

—তা ঠিক। কিন্তু আপনি সবার থেকে আলাদা।

—সত্যি তাই মনে করেন ?

কোনদিন তো বলেন নি ?

—সাহস হয় নি।

বাণী হাসে। বলে, কেন ?

—যদি আপনি ভুল বোঝেন, যদি আপনি রাগ করেন।

বাণী একটু জোরে নিঃশ্বাস ফেলে বলে, আচ্ছা যাক ওসব কথা। এখন বলুন, সব সময় আপনাকে এত চিন্তিত দেখি কেন ? কী হয়েছে আপনার ?

—সংসারে এত অভাব-অনটন অথচ আমি কিছু করতে পারছি না ; চিন্তিত হবো না ?

—শুধু অভাব-অনটনের জন্যই এত চিন্তা ?

অতি তুঃখেও আশিস হাসে। বলে, তুশ্চিন্তার জন্য অভাব অনটনই যথেষ্ট। আর কিছুর দরকার নেই।

—চিন্তা করলেই সব সমস্যা মিটে যাবে ?

—না, তা তো মিটবে না কিন্তু……

—ওসব কিন্তু-টিন্তু ছাড়ুন। বাণী এক নিঃশ্বাসে বলে, এত বড় কলকাতা

শহরে হাওয়ায় টাকা উড়ছে আর আপনি চেষ্টা করলে কিছু হবে না, তা হতেই পারে না।

আশিস চুপ করে থাকে। কোন কথা বলে না। মনে মনে ভাবে, কলকাতায় হাওয়ায় টাকা উড়ছে, তা ও জানে। কিন্তু জল থাকলে তো জল বাঁধবে। জল বাঁধার মত জলটুকুও তো ওর নেই।

—কী হল? চুপ করে রইলেন যে?

—কী আর বলব? আপনার কথা শুনছি।

—আমি শুধু কথা বলতে আসি নি, শুনতেও এসেছি।

- বলুন, কী শুনতে চান?

—অনেক কথা শুনতেও চাই, বলতেও চাই। কিন্তু সবার আগে একটা অনুরোধ করব।

—কী অনুরোধ?

—সবার আগে কথা দিন, আপনি সব সময় এরকম গম্ভীর, মনমরা হয়ে থাকবেন না। বাণী একটু থেমে বলে, আপনি হাসলে কত ভাল লাগে, তা জানেন?

আশিস আবার চমকে ওঠে। বিস্মিত হয়ে ওকে দেখে।

—কী দেখছেন? কথা দিন আর কোনদিন এমন মনমরা হয়ে থাকবেন না। এমন গম্ভীর, মনমরা হয়ে থাকলে আমি আর কোনদিন আপনার সঙ্গে কথা বলব না।

হঠাৎ যেন আশিস চঞ্চল হয়ে ওঠে। হাসে। প্রতিশ্রুতি দেয়, কথা দিচ্ছি, আর কোনদিন আমাকে গম্ভীর মনমরা দেখবেন না।

ময়দানের অন্ধকার আরো গাঢ় হয়। বইমেলার কলগুঞ্জন আরো স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

আশিসের কণ্ঠস্বর হঠাৎ নরম হয়। বলে, আজ আমার সব সাফল্যের পিছনে রয়েছে বাণী। আজ সময় নেই, কিন্তু পরে একদিন বলব বাণী আমার জন্য কি করেছে। এসব কথা কাউকে বলি নি। বলতে পারি না। লোকে ভুল বুঝবে। কিন্তু তোকে বলব। আশিস একটু থেমে প্রায় আপন মনেই বলে, ওর কথা অন্তত একজনকে না বললে শান্তিও পাব না।

—বিয়ে করলি না কেন?

আশিস একটু ম্লান হেসে বলল, যাকে ভালবাসা যায়, তাকে কী বিয়ে করা

যায়? তারপর একটু থেমে বলল, আমিও সংসারী হয়েছি, বাণীও সংসারী হয়েছে।

—তাই নাকি?

—হ্যাঁ। আশিস আবার একটু ম্লান হাসে। বলে, বাণীর বিয়ের পর ঠিক করেছিলাম, ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ করে দেশ ছেড়ে চলে যাব। কিন্তু পারলাম না।

—কেন?

—ও আমাকে লিখল, আমি জানতাম না আমি এমন কাপুরুষকে ভালবেসেছিলাম। যে সমস্ত দায়িত্ব-কর্তব্য অস্বীকার করে, সংসার ভাসিযে দিয়ে বিদেশে পালিয়ে যেতে চায়, তাকে আমি ভালবাসি নি, ভালবাসব না।

আমি হাসি। বলি, সত্যি, অদ্ভুত মেযে। একটু থেমে জিজ্ঞেস করলাম, বইমেলায় দেখা হল?

—হ্যাঁ, একদিন দেখেছি।

– কথাবার্তা হল?

—না, সে সুযোগ আর নেই।

—তুই কী জানতিস ও বইমেলায় আসবে?

—মনে মনে জানতাম, ও আসবেই।

অবাক হয়ে প্রশ্ন করি, কেন?

আশিস একটু হেসে বলল, ওর তো দুটো নেশা।

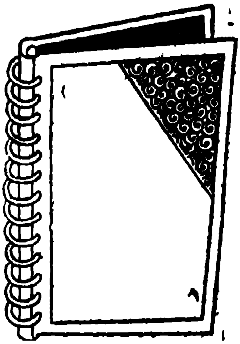
—কী কী?

—আমাকে ভালবাসা আর পড়াশুনা করা। ও বইমেলায় আসবে না, তা হতেই পারে না।

বাণীর প্রতি ওর আস্থা, বিশ্বাস, ভালবাসা দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলাম। বুঝলাম, শ্রাবণের মেঘলা আকাশে সূর্য লুকিয়ে থাকলেও তার আলো ছড়িয়ে পড়বেই।

আমরা উঠলাম। বইমেলা তখনো চলছে। লাউডস্পীকারে গান হচ্ছে। আমরা বইমেলার পাশ দিয়ে যেতে যেতে শুনলাম—

আমার জীবনপাত্র উছলিয়া
মাধুরী করেছ দান—
তুমি জান নাই, তুমি জান নাই,
তুমি জান নাই
তার মূল্যের পরিমাণ।



মেমসাহেব ?

এ সংসারে যেদিন আমার যাত্রারম্ভ হয় সেদিন আমি ছিলাম শুধু আমাদের সংসারের একজন। তারপর এ সংসারের চড়াই-উৎরাই পার হয়ে এগুতে গিয়ে দেখা হল আরো কতজনের সঙ্গে। আমি তাঁদের আপন হয়েছি কিনা জানি না কিন্তু তাঁরা অনেকেই আপন ঔদার্যে ও মহত্বে আমার আপন, আমার প্রিয় হয়েছেন। এঁরা ছড়িয়ে রয়েছেন পৃথিবীর নানা প্রান্তে। যখন একা থাকি, আনমনে খেলা করি নিজের সঙ্গে, তখন এঁরা সবাই আমার কাছে আসেন। আমি এঁদেরই কয়েকজনের ছবি দিয়ে অ্যালবামের পাতা সাজাতে শুরু করি। মনের মধ্যে অনেক মানুষের অনেক ছবি জমা আছে কিন্তু হঠাৎ খেয়াল হল এই ছোট অ্যালবামের মাঝখানে একটা পাতা খালি আছে। কার কোন ছবি দিয়ে সেই পাতাটি ভরব ভেবে পাই না। প্রায় দিশেহারা হয়ে যাই। হঠাৎ মনে পড়ল নিজেরই এক কাহিনী। এক বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা। কয়েকটা টুকরো টুকরো ছবি। অ্যালবামের এই পাতায় তো সেই ছবি দিয়েই ভরিয়ে দেওয়া যায় কিন্তু দ্বিধা হয়, সংকোচ হয়। তবু আনমনে সেই ছবি দিয়েই অ্যালবামের পাতা ভরিয়ে তুলি।

সব মানুষের জীবনেই কিছু ঘটনা, অঘটন বা দুর্ঘটনা ঘটে। আমার জীবনেও ঘটেছে। একবার নয়, একাধিক বার। স্বপ্ন দেখতাম, ডাক্তার হব। ছোট-বেলায় লাল-নীল শিশিতে জল ভরে, নুন-হলুদ-চিনি গুঁড়া করে ডিসপেন্সারী সাজাতাম। দড়ির সঙ্গে শিশির ঢাকনা দিয়ে তৈরী করতাম স্টেথো। তাই দিয়েই রুগীর বুক-পিঠ পরীক্ষা করে ডিসপেন্সারী থেকে ওষুধ দিতাম। স্বপ্ন দেখলে

কি হয়? হওয়া উচিত ছিল কেরাণী বা প্রাইমারী স্কুলের মাষ্টারমশাই। ডাক্তারও হলাম না, কেরাণী বা স্কুলের মাষ্টারও হলাম না। হলাম খবরের কাগজের রিপোর্টার। জার্ণালিষ্ট। তারপরও কত অঘটন! যা ভাবি নি, তাই ঘটল। বার বার, বহুবার।

এখানেই শেষ নয়! হঠাৎ একদিন গল্প-উপন্যাস লিখতে শুরু করলাম। একের পর এক। অনেক। কিছুদিন পর থেকে পাঠক-পাঠিকাদের চিঠি আসতে শুরু করল। নানাজনের নানারকম চিঠি। ভাল-মন্দ নিন্দা-প্রশংসা। বহুজনে কৌতুহলী হয়ে প্রশ্ন করেন নানা বিষয়ে। চিঠিগুলো পড়তে বেশ লাগে।

দিন পনের বাইরে কাটিয়ে ফিরে এসে দেখি, টেবিলের উপর অনেক চিঠি। একের পর এক চিঠিগুলো পড়ি। একটা খামের চিঠি খুলেই অবাক—প্রিয়তম বাচ্চু! আমার প্রাণাধিক প্রিয় বাচ্চু!

বই পড়ে লেখক সম্পর্কে নানারকমের ধারণা জন্মায় পাঠক-পাঠিকাদের মনে। এ ব্যাপারে তাঁদের পূর্ণ স্বাধীনতা আছে। কিছু কিছু পাঠক-পাঠিকার ধারণা আমার নাম বাচ্চু! তাই তো চিঠি আসে বাচ্চুদা, স্নেহের বাচ্চু. প্রিয় বাচ্চু বা শ্রদ্ধেয় বাচ্চুর কাছে। কিন্তু প্রিয়তম বাচ্চু? না। আমার প্রাণাধিক প্রিয় বাচ্চু? না, এ ভাবেও কেউ চিঠি লেখে নি এর আগে। প্রায় এক নিশ্বাসে চিঠিখানা পড়ি।......

ক' বছর আগে এক বন্ধুই আমাকে তোমার 'মেমসাহেব' পড়তে দেয়। কয়েক পাতা পড়ার পরই চমকে উঠলাম। একি? এ তো আমারই কথা, আমারই অমু লিখেছে। অমুই তো আমাকে দেখে বলেছিল—

প্রহর শেষের আলোয় রাঙা
সেদিন চৈত্র মাস—
তোমার চোখে দেখেছিলাম
আমার সর্বনাশ!

আর কেউ নয়, আমার অমু, আজকের মেমসাহেব-এর বাচ্চুই আমাকে লিখেছিল, এমন উজ্জ্বল ঘন কালো টানা টানা দুটি চোখ আগে দেখিনি; আমার অমুকে আমি পেয়েছিলাম বঙ্গ সংস্কৃতি'র মেলায়। আমাকে নিয়েও অমু রেস্তর্রাঁয় গিয়েছিল। দুজনেই ফিসফ্রাই খেয়েছিলাম—ঠিক যেমন করে বাচ্চু তার মেমসাহেবকে পেয়েছিল।

বন্ধুকে তার 'মেমসাহেব' ফিরিয়ে দিয়ে নিজেই এক কপি কিনলাম। পড়লাম।

বার বার পড়লাম। পড়তে পড়তে প্রায় মুখস্ত হয়ে গেল। দিনে, রাত্রে সব সময় শুধু তোমার কথা ভাবি। রাত্রে শুয়ে শুয়ে তোমার জন্য চোখের জল ফেলি। কিন্তু কাউকে কিছু বলি না, বুঝতে দিই না। আমাদের দু-জনের ভালবাসা নিয়ে সাঁত্রাগাছিতে ঝড় উঠেছিল। আমি জানি, অনেক দুঃখে তোমাকে সাঁত্রাগাছি ছাড়তে হয়েছে। এখন মেমসাহেব পড়তে পড়তে বুঝতে পারছি, তুমি আমাকে কত গভীরভাবে ভালবেসেছ। আমি একজন অতি সাধারণ মেয়ে। কিন্তু মেমসাহেব পড়ে বুঝেছি, তোমার স্পর্শে আমিও আসাধারণ হয়ে উঠেছি। তুমি আমাকে দেবীর আসনে বসিয়েছ। তোমার বিরুদ্ধে আমার অনেক রাগ, অভিমান অভিযোগ জমা ছিল কিন্তু মেমসাহেব পড়ে বুঝলাম, আমার বিরুদ্ধে তোমার কোন অভিমান, কোন অভিযোগ নেই; বরং তুমি শুধু আমার মহত্ব ও ঔদার্যই দেখেছ। সত্যি, তুমি কত মহৎ! কত উদার!

কিন্তু অমু, তুমি কেন নিজেকে বাচ্চু বলে পরিচয় দিয়েছ? কি দরকার ছিল এই পরিচয়টুকু লুকোবার? লোকে কিছু বলতো? সেই নগণ্য, তুচ্ছ মানুষগুলোকে কি আজও তুমি উপেক্ষা করতে পার না? সেই সব নিন্দুকের দল এখন তো তোমাকে কাছে পেলে নিজেদের ধন্য মনে করবে। তুমি কি এখন শিক্ষকতা কর না? নাকি সত্যি সত্যি সাংবাদিক হয়েছ? মনে হচ্ছে তুমি সাঁত্রাগাছি থেকে চলে যাবার পর পরই শিক্ষকতা ছেড়ে সাংবাদিকতা শুরু কর এবং আমার ভালবাসা আর তোমার বিরামহীন সাধনা তোমাকে খ্যাতি, যশ, প্রতিষ্ঠা এনে দিয়েছে।

যাইহোক তুমি আর আমার কাছ থেকে দূরে লুকিয়ে থেকো না। আমার কাছে ফিরে এসো। তোমাকে আদর ভালবাসায় ভরিয়ে দেব। আর এভাবে একলা একলা রাত কাটাতে পারি না। তুমি এসো। আমি আর পারছি না।......

চিঠি পড়েই বুঝলাম ভুল হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলাম আপনার চিঠি পেলাম। কিন্তু, আমি তো অমু না। আমি কোনকালে সাঁত্রাগাছিতেও থাকি নি, শিক্ষকতাও করি নি।......

ক'দিন পরে আবার চিঠি—তোমার চিঠি পেয়ে সারা রাত কেঁদেছি। কেন তুমি আমার কাছ থেকে এমন করে দূরে লুকিয়ে থাকছ? আমি তো এখন সাঁত্রাগাছিতে থাকি না। সাঁত্রাগাছির সঙ্গে আমার আর কোন যোগাযোগ নেই। তবে এত দ্বিধা কেন? তাছাড়া এখানে আমি একলা থাকি। সুন্দর কোয়ার্টার।

তোমার কোন অসুবিধে হবে না; কেউ তোমাকে বিরক্ত করবে না। এসো, ফিরে এসো; আর এক মুহূর্ত দেরি করো না। সেবা, যত্নে, ভালবাসায় যদি তোমাকে খুশি না করতে পারি, তাহলে তুমি ফিরে যেও। আমি তোমাকে জোর করে ধরে রাখব না। আর কোনদিন আসতেও বলব না।.....

আমি আবার জবাব দিই, আপনার দ্বিতীয় চিঠি পেলাম। কিন্তু সত্যি আমি অমু না। আপনার অমুর নামও কি নিমাই ভট্টাচার্য? অমুর কোন আত্মীয়-স্বজন বন্ধু বান্ধবকে কি আপনি চেনেন না। তাদের কারুর কাছে অমুর খোঁজ করুন। আপনার চিঠি পড়ে মনে সমবেদনা অনুভব করি কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের কথা, এ বিষয়ে আমার কিছু করণীয় নেই। অনুগ্রহ করে আপনি এ ধরনের চিঠি লিখে আমাকে আর বিব্রত করবেন না। অন্য কোন ব্যাপারে যদি আপনাকে সাহায্য করতে পারি, তাহলে সুখী হব।

হা ভগবান। এর পরও চিঠি। একের পর এক।......কি বিয়ে করেছ? নাকি তোমার জীবনে অন্য মেয়ে এসেছে? যদি বিয়ে করে থাকো, অন্য কোন মেয়ে তোমার জীবনে এলেও তোমাকে গ্রহণ করতে আমার বিন্দুমাত্র আপত্তি বা সংকোচ নেই। তোমাকে মাঝে মাঝে মাত্র কয়েকটি মুহূর্তের জন্য কাছে পেলেই আমি নিজেকে ধন্য মনে করব।......

কি জবাব দেব? আমি চুপ করে থাকি কিন্তু মিস ব্যানার্জী চুপ করে থাকেন না। আবার চিঠি লেখেন—আমার অমু, আমার বাচ্চু, তুমি কি দিল্লী নেই? তিন-চারখানা চিঠি দিয়েও জবাব পাই নি। তাই মনে হচ্ছে, তুমি বোধহয় দিল্লীর বাইরে ছিলে? বিদেশ গিয়েছিলে? কোন দিকে? পূর্বে না পশ্চিমে? নিশ্চয়ই ক্লান্ত! চলে এসো আমার কাছে। ক'দিনের মধ্যেই তোমার শরীর ঠিক করে দেব।......

এ চিঠিরও কোন জবাব দিই না। কিন্তু সপ্তাহ ঘুরতে না ঘুরতে আবার চিঠি আসে, তোমার নীরবতা দেখে মনে হচ্ছে তুমি ইচ্ছা করেই চিঠির জবার দিচ্ছ না, কেন? আমি তোমার খ্যাতি যশ অর্থের ভাগীদার হব বলে ভয় পাচ্ছ? না' ওসব আমি কিছুই চাই না। তোমার এই 'মেমসাহেব' শুধু তার বাচ্চুকেই চায়—আর কিছু না।

এবার আমি আর চুপ করে থাকি না। লিখি, আপনার সব চিঠিই আমি পেয়েছি। কিন্তু কেন আপনি বার বার এই ধরনের চিঠি লিখছেন? আমি, আমি আপনাকে আবার বলছি, এ সংসারে কালো মেয়ের অভাব নেই, অভাব

নেই টানা টানা উজ্জ্বল চোখের কিন্তু তারা সবাই মেমসাহেব নয়। কার অনুপ্রেরণায় বা কোন ঘন কালো টানা চোখের কালো মেয়েকে অবলম্বন করে মেমসাহেব লিখেছি, তা জানাবার প্রয়োজন অনুভব করছি না। উপন্যাসকে উপন্যাস হিসাবে বিচার করাই কর্তব্য। যাই হোক আবার সবিনয়ে নিবেদন করছি, আপনার অনুপ্রেরণায় মেমসাহেব লিখি নি এবং আপনি অনুগ্রহ করে আমাকে নিয়মিতভাবে প্রেমপত্র না লিখলেই সুখী হব……

মিস ব্যানার্জীর আরো চিঠি আসে কিন্তু আমি জবাব দেওয়া তো দূরের কথা সঙ্গে সঙ্গে ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটে ফেলে দিই। মনে মনে ভাবি, মেয়েটি কি ব্ল্যাকমেল করার চেষ্টা করছে? নাকি মানসিক রোগে ভুগছে? এর পর ওর চিঠি আসা বন্ধ হল। আমি মনে মনে স্বস্তি পাই।

বছর খানেক পরের কথা। খুব জরুরী কাজে দু' দিনের জন্য কলকাতা এসেছি। আশ্রয় নিয়েছি আমার পুরনো হোটেলেই। সারাদিন ঘোরাঘুরির পর হোটেলে এসেছি কিছুক্ষণের জন্য। স্নান করে জামা কাপড় বদলেই আবার বেরুব। ঘরে ঢুকতে না ঢুকতেই কে যেন দরজায় নক্ করলেন। বললাম, কাম ইন।

না, সংবাদপত্র জগতের কেউ না, কোন প্রকাশক বা পত্র-পত্রিকার লোকও না। একটি মেয়ে। রং ময়লা। বয়স? পঁচিশ ছাব্বিশ বা তার কিছু বেশি। জীবনে কোনদিন কোথাও দেখেছি বলেও মনে হল না। প্রশ্ন করলাম, আপনি।

-- আমি মিস ব্যানার্জী।

— কি বললেন? আপনি মিস ব্যানার্জী?

—হ্যাঁ।

– কি করে জানলেন আমি এসেছি?

—এই হোটেলের একটি ছেলের মামার বাড়ি আমাদের বাড়ির পাশেই। তার কাছেই আজ দুপুরে শুনলাম……

— তার কাছে শুনেই চলে এলেন?

মিস ব্যানার্জী কোন জবাব দেন না।

এবার আমি প্রশ্ন করি, বাড়িতে বলে এসেছেন যে কলকাতায় আমার সঙ্গে দেখা করতে আসছেন?

—না।

শুনেই আমার মাথা গরম হয়ে যায়। মেয়েটি যেখানে থাকেন সেখানে যেতে

দু' আড়াই ঘণ্টার দরকার। হাতে সময় ছিল না। তাই রুম বেয়ারাকে ডেকে বললাম, এই ভদ্রমহিলাকে হাওড়ার ট্রামে চড়িয়ে দাও।

মিস ব্যানার্জীকে বললাম, আমি আপনার অমু না। ভবিষ্যতে এ ধরনের পাগলামী করলে হয়তো আমি পুলিশকে জানাতে বাধ্য হব।

মিস ব্যানার্জী চলে গেলেন। তারপর মিস ব্যানার্জীর আর কোন চিঠি পাই নি। আশা করি, তিনি তাঁর অমুকে খুঁজে পেয়েছেন।

* * * *

শুধু মিস ব্যানার্জীকে দোষারোপ করব না। মনে পড়ে একবার এক বিবাহিতা মহিলা লিখলেন -প্রিয় রিপোর্টার, তোমার 'মেমসাহেব' পড়লাম। একবার না, অনেকবার। যত পড়ি তত ভাল লাগে। মজা লাগে। কখনও গর্বে বুক ভরে ওঠে, কখনও আবার চোখের জল ফেলি।

এবার একটু পুরনো কথা বলি। আমরা তখন বেহালায় থাকি। আমাদের পাশের বাড়ির একটি ছেলের সঙ্গে একজন রিপোর্টারের বন্ধুত্ব ছিল। রিপোর্টার মাঝে মাঝেই ঐ বাড়িতে আসত এবং একদিন আমার সঙ্গে আলাপ হয়। বোধহয় দুজনকেই দুজনের ভাল লাগে। তারপর আমি আশুতোষ কলেজে পড়ার সময় রিপোর্টারের সঙ্গে কত ঘুরেছি। সত্যি, রিপোর্টার আমাকে ভালবাসায় ভরিয়ে দেয়। আমিও ওকে বিনা দ্বিধায় অনেক কিছু দিয়েছি। তারপর হঠাৎ আমার বিয়ে হল। স্বামীর সঙ্গে চলে এলাম ধানবাদ। রিপোর্টারও হারিয়ে গেল। আর কোনদিন রিপোর্টারের সঙ্গে দেখা হয় নি। তার মাঝে মাঝে মাঝেই রিপোর্টারের কথা মনে হয়। একবার কাছে পেতে ইচ্ছে করে। খুব ইচ্ছে করে ওকে একটু আদর করি, ও আমাকে আবার সেই পুরনো দিনের মত আদর করুক। না, তা সম্ভব হয় না। রিপোর্টারের লেখা কিছু চিঠি আজও আমার কাছে আছে। মাঝে মাঝে সেই চিঠিগুলো পড়ি।

তোমার 'মেমসাহেব' পড়ে হঠাৎ মনে হল, তুমিই কি আমার সেই রিপোর্টার বোধহয় তুমিই তাই না ? লক্ষ্মীটি একবার চলে এসো আমার কাছে। যে কোন শুক্রবার চলে এসো। প্রতি শুক্রবার সকালে আমার স্বামী কলকাতা যান এবং ফিরে আসেন শনিবার রাত্রে। তুমি এসো আমি আজও তোমারই আছি।...

চিঠিখানা কয়েকবার পড়লাম। ভারী মজা লাগল। লিখলাম, বৌদি, আপনি আমার 'মেমসাহেব পড়েছেন জেনে খুব খুশি হলাম। আমার সাধ্যমত দরদ ও নিষ্ঠা দিয়ে মেমসাহেব লিখেছি কিন্তু 'মেমসাহেব' ও 'রিপোর্টার বাচ্চু' আপনাদের

কাছে যে ভালবাসা ও আন্তরিকতা পেয়েছে, তার তুলনা হয় না। তাইতো আপনাদের মত পাঠক-পাঠিকাদের প্রতি আমি অশেষ কৃতজ্ঞ, ঋণী।

যাই হোক আমি কদাচিৎ কখনও বেহালায় গেলেও ওখানে আমার কোন বন্ধু ছিল না। যে রিপোর্টারের সঙ্গে আপনার আলাপ হয়েছিল, আমি সেই ভাগ্যবান রিপোর্টার নই। সে রিপোর্টারের চিঠি তো আপনার কাছে আছে। দেখবেন আমার হাতের লেখা আলাদা।......

বোধহয় মাস খানেক পরে আবার বৌদির চিঠি এল প্রিয় রিপোর্টার, তোমার চিঠি পেয়ে খুব ভাল লাগল। কিছু আত্মীয়স্বজন এখানে ছিলেন বলে তোমাকে চিঠি দিতে পারি নি সেজন্য রাগ করো না। হ্যাঁ, আমার কাছে রিপোর্টারের যে চিঠি আছে, তার সঙ্গে মিলিয়ে দেখলাম, তোমার হাতের লেখা আলাদা। কিন্তু হাতের লেখা কি বদলে যায় না? আমার মন বলছে তুমি সেই রিপোর্টার। তোমাকেই আমি ভালোবাসি। তোমার মেমসাহেব পড়ে বুঝেছি, তুমিও কত গভীরভাবে আমাকে ভালোবাসো। আমার বিশ্বাস, তুমিই আমাকে বেশি ভালোবাসো। তাই তো বলছি, কলকাতা যাবার পথে একবার ধানবাদে নেমে পড়ো। তোমাকে পুরোপুরি আর পাব না। সে অধিকার আমি হারিয়েছি। কিন্তু মাঝে মাঝেও কি একবার তোমাকে কাছে পাব না? নিশ্চয়ই পাব। কবে আসছো জানাও। . ..

এ চিঠির কি জবাব দেব? কিন্তু তবু লিখি, বৌদি, চিঠি পেলাম কিন্তু আপনার উদার আমন্ত্রণ গ্রহণ করব কোন্ অধিকারে? শুধু মেমসাহেব লিখেছি বলে তো এ অধিকার অর্জন করিনি।

অধিকার? তোমাকে সে অধিকার আমি দিচ্ছি এবং হাসি মুখে তোমাকে সে অধিকার দেব। তুমি এসো। এক সপ্তাহ বা দশ দিনের মধ্যে বৌদি একথা লিখলেন। আর লিখলেন, তুমি কেন আমাকে বৌদি বলে লিখছ? তাছাড়া আপনি বলেও লিখতে হবে না।

আমি সে চিঠির জবাব দিলাম না। ধানবাদ থেকে আরো কয়েকটা চিঠি এল। কিন্তু কোন চিঠিরই জবাব দিলাম না।

দু' বছর পরের কথা। পূজার সময়ের কথা। ঘরে বসে কিছু পড়ছিলাম। হঠাৎ টেলিফোন।...

—হ্যালো কাকে চাইছেন?

—তোমাকে।

—আমাকে ?

-- হ্যাঁ, হ্যাঁ, তোমাকে।

– অ পনি কে বলছেন ?

· আমাকে আপনি বলতে হবে না। তুমি কেমন আছ ?

—ভাল কিন্তু আপনি কে ?

—আবার আপনি ?

- আপনি কে বলছেন, বলবেন কি ?

আমি পূজার ছুটিতে দিল্লী এসেছি। একবার দেখা করবে না ?

আমি হেসে বলি, চলে আসুন আমার বাড়িতে।

- না, তুমি এসো কালীবাড়ি।

– ওখানে গিয়ে কি বলব ?

– ধানবাদ থেকে এসেছেন বললেই…

আপনি ? বৌদি ?

না, আমি বৌদি না।

– আমিও আপনার সেই রিপোর্টার না। এই কথা বলেই আমি টেলিফোন নামিয়ে রাখি।

না, বৌদি আর টেলিফোন করেন নি, চিঠিও লেখেন নি।

* * * *

মনে পড়ছে আর একটি মেয়ের কথা। দিল্লী থেকে এলাম পাটনা। সেখান থেকে রাঁচী —তারপর জামসেদপুর হয়ে কলকাতা। এই রাঁচীর ইউনিয়ন ক্লাবের সভায় আমার বক্তৃতা শুনতে এসেছিল মেয়েটি। সভার পর আলাপ হল দু' এক মিনিটের জন্য। পরের দিন হঠাৎ রাস্তায় দেখা। সেও দু' এক মিনিটের জন্য। ভেবেছিলাম ওখানেই শেষ হবে কিন্তু না, হল না।

কলকাতায় এক প্রকাশকের ঠিকানায় চিঠি এলো—প্রিয়জনকে তুমি বলেই সম্বোধন করা হয়। সেই দাবিতেই লিখছি, তোমার 'মেমসাহেব' পড়েছি। এখনও মাঝে মাঝে পড়ি। না পড়ে পারি না। ভাল লাগে কি ? বোধহয় না। এমন ভালবাসার এই বিয়োগান্ত পরিণতি সত্যি সহ্য করতে পারি না। কাঁদি তোমার জন্য, তোমার মেমসাহেবের জন্য। না কেঁদে পারি না। অনেকবার ভেবেছি, কাঁদব না। অনেক শক্ত বাঁধন দিয়ে মনকে বেঁধেছি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত হেরে গেছি। কিছুতেই চোখের জলকে আটকে রাখতে পারি নি। তোমাদের

দুজনের সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য দেখে অবাক হয়ে যাই। দুজনে দুজনকে ভালো-বাসায় ভরিয়ে সৌভাগ্য লাভ করছে। কিন্তু হারাবার বেদনাও দুজনেরই সমান। তোমাদের সৌভাগ্য দেখে যেমন ঈর্ষা হয়, দুর্ভাগ্য দেখে ঠিক ততটাই দুঃখ হয়।

ক'দিন আগেই তোমাকে দেখলাম। তোমাকে প্রণাম করার লোভ সামলাতে পারলাম না। জানি, তোমার মেমসাহেবের সঙ্গে কোনদিন দেখা হবে না, হতে পারে না। কিন্তু যদি কোন অলৌকিক কারণে তাঁর সঙ্গে দেখা হয়, তবে তাঁকেও প্রণাম করব।

তুমি ব্যস্ত মানুষ। দীর্ঘ চিঠি লিখে তোমাকে বিরক্ত করব না। শুধু প্রার্থনা করব, তোমার শূন্য জীবনকে আবার ভরিয়ে তোলার সুযোগ আমাকে দাও। আমি সমস্ত মন-প্রাণ দিয়ে ভালবেসে আবার তোমাকে ভরিয়ে তুলব। মেমসাহেব রাগ করবে? না, সে রাগ করবে না। তোমাকে আবার পূর্ণ করে ভরিয়ে তোলার জন্য মেমসাহেব অদৃশ্যলোক থেকেই আমাকে আশীর্বাদ করবে এবং তাঁর আশীর্বাদ নিয়েই আমি তাঁর সংসারে প্রবেশ করব।······

চিঠিটা পড়ে আমি অবাক হয়ে যাই। চোখের সামনে ভেসে উঠল মেয়েটির মুখ। কতই বা বয়স হবে। বড় জোর একুশ-বাইশ। বোধহয় এম. এ. পড়ে। কিন্তু কি আশ্চর্য দরদী মন! একখানি উপন্যাস পড়ে লেখকের প্রতি কি আশ্চর্য দরদ, সমবেদনা। প্রকাশকের অফিসে বসেই জবাব লিখি—গল্প-উপন্যাস পড়ে অনেকেই চিঠি লিখেছেন। দু'চারজন মেয়ে সন্দেহ করেছেন, আমি তাঁদের অনুপ্রেরণাতেই 'মেমসাহেব' লিখেছি। এঁদের অদ্ভুত দাবি দেখে বিস্মিত হয়েছি। কিন্তু তোমার চিঠি পড়ে সত্যি মুগ্ধ হলাম। এমন দরদ ও সমবেদনা ভরা চিঠি খুব কম পেয়েছি। মনে পড়ে এক মাতৃতুল্যা মহিলার কথা। তিনি আমাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে বলেছিলেন, সামনের জন্মে যেন তোমাকে বা তোমার মেমসাহেবকে গর্ভে ধারণ করতে পারি। আমার এই অপরিচিতা মায়ের কথায় আনন্দে, খুশিতে, কৃতজ্ঞতায় আমি চোখের জল ফেলেছিলাম। ঐ মায়ের কথায় যে আন্তরিকতার স্বাদ পেয়েছিলাম, তোমার চিঠিতেও ঠিক সেই একই সুর, একই স্বাদ। এমন চিঠি লেখার জন্য তোমার প্রতি আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। তুমি নিজের পথে নিজের জীবনকে পূর্ণ করে তোল, এই প্রার্থনাই করি।

পরের বার কলকাতায় এসে আবার প্রকাশকের ওখানে ওর চিঠি পেলাম—তোমার চিঠি পেলাম। এক কথায় বলব, চিঠিখানা খুবই সুন্দর হয়েছে কিন্তু আমাকে তুমি এভাবে প্রত্যাখ্যান করছ কেন? আমি প্রতিজ্ঞা করছি, প্রতিশ্রুতি

দিচ্ছি, মেমসাহেবের অবমাননা আমার দ্বারা হবে না ; বরং তাঁরই মন্ত্রে দীক্ষিতা হয়ে আমি তোমার সেবা করব, তোমাকে ভালবাসব। তবে কেন তুমি আমাকে সে অধিকার দেবে না ?

এ চিঠির কি জবাব দেব ? তবু পোষ্টকার্ডে লিখলাম, তোমার চিঠি পেলাম। খুব ভাল লাগল। মাঝে মাঝে চিঠি দিও। খুশি হব। আমি নানা কাজে ব্যস্ত থাকি। তাই উত্তর পেতে দেরি হলে রাগ করো না।

তুমি কি ভেবেছ ? কেন তুমি বার বার আমার প্রশ্ন এড়িয়ে যাচ্ছ ? শুধু ভদ্রতা করে আমার চিঠির উত্তর দিতে হবে না। জানতে যা চেয়েছি তার জবাব দাও।

অনেকদিন পর কলকাতা এসে দেখলাম ওর দুটি চিঠি এসেছে। দ্বিতীয় চিঠিতে লিখেছে, তুমি কি সমাজসংসারের কথা বিবেচনা করে আমার অনুরোধ রক্ষা করতে ভয় পাচ্ছ ? তোমার চাইতে আমি বয়সে অনেক ছোট—তাই কি পিছিয়ে যাচ্ছ ? এসব তুচ্ছ ব্যাপার। এর জন্য অন্তত তোমাব মত লোকের পিছিয়ে যাওয়া উচিত নয়। নাকি মেমসাহেব তোমাকে ভালোবাসত বলে আমি তোমাকে ভালবাসতে পারি না। পৃথিবীর কোন শাস্ত্রে এমন ভালবাসায় নিষেধ আছে ?

লিখলাম, তোমার দুটো চিঠি এক সঙ্গে আমার হাতে এলো। কি উত্তর দেব তোমার চিঠির ? শুধু জানিয়ে রাখি, তোমার অনুরোধ রক্ষা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তবে তোমার এই আন্তরিকতার কথা কোনদিন ভুলব না। তুমি নিশ্চয়ই চিঠি লিখবে। কিন্তু ঐ একই বিষয়ে বার বার লিখে আমাকে লজ্জা দিও না। হাজার হোক তুমি আমার পাঠিকা। তোমাকে আমার দেবারও যেমন সীমা আছে, তোমার কাছ থেকে নেবার অধিকারও তেমনি সীমিত।

এরপর অনেকদিন কোন চিঠি এল না। পূজার পর চিঠি পেলাম, আজ বিজয়া। সবার আগে তোমাকে প্রণাম জানাই। তুমি কি আমাকে আশীর্বাদ করবে না ? তোমার আশীর্বাদ ছাড়া যে আমার এক পা এগুবার উপায় নেই।

চিঠি পড়ে আমি হাসি। অবাক হই। মুগ্ধও হই। জবাব দিই।

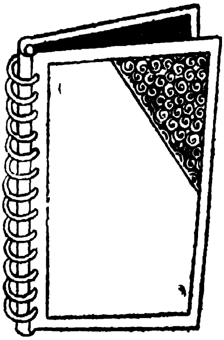
তারপর আবার নীরব।

নববর্ষের সময় কলকাতা এসে চিঠি পেলাম, নতুন বছরের শুরুতে তোমাকে প্রণাম করে যাত্রারম্ভ করছি। তুমি আমাকে আশীর্বাদ করো।

আমি জবাব দিই। কিন্তু তারপর আর কোন চিঠি পাই না। কয়েক মাস

পরে আবার রাঁচী থেকে চিঠি এলো—আমার বিয়ে। কার্ড পাঠালাম। আসবে কি আমাকে আশীর্বাদ করতে? না আসতে পারলে দূর থেকে আশীর্বাদ করো। আর জানিয়ে রাখি বিয়ের পরও তোমাকে ভালবাসব। বলেছি তো কোন শাস্ত্রেই লেখা নেই, বিয়ের পর ভালবাসা যায় না বা বিবাহিতকে ভালবাসতে নেই।

সত্যি, পুরুষস্য ভাগ্যম আব নারী চরিত্র বোঝা অসম্ভব। তাই কি চিব-তুষারাবৃত চিররহস্যময় হিমালযের মত নারী আমাদের যুগ যুগান্তর ধরে হাতছানি দেয়?



উনযৌবনা

তাপ্তী, সবরমতী, মাহী পেরিয়ে সাতপুরা, সহ্যাদ্রি, বিন্ধ্য ও আরাবল্লীর পাহাড়ের চড়াই-উতরাই পিছনে ফেলে গুজরাত সেখানে আরব সাগরের কোলে প্রায় ঢলে পড়েছে। ইতিহাসের পাতায় পাতায় যাদের উল্লেখ সেই গিরনার পাহাড়, জুনাগড়, সোমনাথ, দ্বারকা ছড়িয়ে রয়েছে আশে পাশেই। একটু উত্তরে জামনগর ছাড়লেই কচ্ছের রণ্-এ নোনা জলের সাম্রাজ্য শুরু। মাটির নিচে সর্বত্রই অমূল্য খনিজ সম্পদ। আরব সাগর আর কচ্ছ-কাম্বে উপসাগরের কোলে কত ছোটবড় বন্দর। ছোট-বড় শহরেরও অভাব নেই কিন্তু মাঝে মাঝেই চোখে পড়ে সীমাহীন জনশূন্য প্রান্তর। টুকরো টুকরো জমিতে বজরা বা ভুট্টার চাষ। ছোট রেল-গাড়ী এরই মধ্যে দিয়ে যাতায়াত করে কিন্তু কোন ব্যস্ততা নেই।

ছোট্ট স্টেশনে গাড়ি থামল। জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখি। সংস্কৃত টোলবাড়ির পণ্ডিত মশাইদের ফতুয়ায় ঘাঘরার মত কুঁচি দেওয়া জামা পরা কিছু পুরুষ যাত্রী ওঠানামা করে কিছু সওদা মাথায় নিয়ে। রঙীন পোষাক পরা কিছু মেয়ে যাত্রীও চোখে পড়ে। হকাররা চিৎকার করে ব্যায় আনা, ব্যায় আনা। অসংখ্য বৈচিত্র্যের দেশ ভারতবর্ষের এক অপরূপ ছবি দেখি সর্বত্র। দেখতে দেখতে মুগ্ধ হয়ে যাই। অতি সাধারণ গরীব মানুষ কিন্তু তাদের চোখে-মুখে হাহাকারের স্পর্শ নেই।

দু' এক মিনিট দাঁড়িয়ে আবার চলতে শুরু করে আমার ছোট রেলগাড়ি।

আবার স্টেশন আসে, আবার দাঁড়ায়। দু' এক মিনিট পরে গার্ডের বাঁশী বাজে; অথবা তার আগেই ইঞ্জিনের বাঁশী। গাড়ি আবার চলতে শুরু করে।

হঠাৎ খেয়াল হয়, আমি বিভোর হয়ে মানুষ দেখছি, আমার কামরায়, ষ্টেশন, প্ল্যাটফর্মে। আহা! কী চোখ! শুধু সুন্দর নয়, অপূর্ব! এর আগে আর কোথাও দেখি নি। না দেশে, না বিদেশে। ভূমধ্য সাগরের ধারে, নাইলের পাড়ে, গ্রীসের ধ্বংস-স্তুপের পাশে পৃথিবীর সব চাইতে সুন্দর মানুষদের দেখেছি। এখানকার সুন্দরীরা যুগ যুগ ধরে সারা পৃথিবীর পুরুষকে মুগ্ধ করেছে কিন্তু তাদেরও এমন চোখ নেই। বোধহয় এদেরই কাউকে দেখে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, কালো মেয়ের কালো হরিণ চোখ।

টিকিটবাবু টিকিট চাইতেই সম্বিত ফিরে এল। শুধু আমার না, গাড়ির সবার টিকিট পরীক্ষা করলেন উনি। অবাক হলাম, সবারই টিকিট আছে। টিকিট পরীক্ষা শেষ করে টিকিটবাবু আমারই পাশে বসলেন। এমন বন্ধু এত কাছাকাছি আর পাই নি। তাই তাঁকেই বললাম, মাঝপথে ট্রেন বদলে আমাকে আমার গন্তব্যস্থল পৌঁছতে হবে কিন্তু এ গাড়ি তো পৌঁছবার দু'ঘণ্টা আগেই ও গাড়ি ছেড়ে দেবে।

টিকিটবাবু হেসে বললেন. এ গাড়ি এ রকমই চলে। আপনি বরং সামনের ষ্টপেজেই নেমে পড়ুন। ওখান থেকে বাসে চলে যান। টিকিটবাবু আরো বললেন, দু' তিন টাকার লোকসান হলেও অনেক তাড়াতাড়ি পৌঁছবেন।

গাড়ি থামতেই নেমে পড়লাম। মাত্র দু' তিনজন যাত্রী ওঠানামা করতেই গাড়ি আবার ছেড়ে দিল। আমি তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলাম গাড়ি এগিয়ে চলেছে মাঠের মধ্যে। না দেখে পারলাম না। যে গাড়িতে বসে এত কিছু দেখেছি তাকে বিদায় না জানিয়ে দৃষ্টি ঘোরাতে পারলাম না।

এটা স্টেশন নয়, হল্ট। হিন্দী, ইংরাজি, গুজরাতীতে লেখা পরিচয়-লিপি থেকে চোখ ঘোরাতেই দেখি, মাষ্টারবাবু অবাক হয়ে আমাকে দেখছেন। পরনে ধুতি কিন্তু তার উপর রেল কোম্পানীর কোট। বয়স বেশি নয়, বোধহয় ত্রিশ-বত্রিশ। খুব বেশি হলে চৌত্রিশ-পঁয়ত্রিশ। তার বেশি কখনই নয়। এমন কিছু সুপুরুষ না হলেও চেহারাটি মোটামুটি ভালই।

প্ল্যাটফর্ম বলে কিছু না থাকলেও দু দিকের দুটি পরিচয়লিপির মাঝখানের লম্বা জমিটুকুর উপরই মাষ্টারবাবু দাঁড়িয়ে। ওর পিছনেই ছোট্ট একটা ঘর। নিঃসন্দেহে ওটাই ওর অফিস ঘর। তাকিয়ে দেখি, ঐ অফিস ঘরের দরজায়

দাঁড়িয়ে একজন বৃদ্ধ ও একজন কিশোরীও মাষ্টারবাবুর মতই অবাক হয়ে দেখছে। মনে মনে হাসি। ভাবি, ওরা কী কোনদিন আমার মত মানুষ দেখে নি।

আমি মাষ্টারবাবুর দিকে এগুতেই মেয়েটি দৌড়ে কোথায় চলে গেল।

তারপর মাষ্টারবাবুর কাছে গিয়ে প্রথমে নমস্কার, পরে আমার সমস্যার কথা বললাম। উনি বাসের খবর না দিয়ে প্রশ্ন করলেন, কোথায় থাকেন?

— দিল্লীতে।

শুনে উনি অবাক, দিল্লীতে থাকেন?

—হ্যাঁ।

—দিল্লীতে কোন ডিপার্টমেণ্টে আছেন?

—আমি কোন ডিপার্টমেণ্টেই নেই।

—আপনি চাকরি করেন না?

—হ্যাঁ, করি।

—তবে বলছেন, কোন ডিপার্টমেণ্টেই নেই।

—আমি সরকারী চাকরি করি না।

— তবে আবার দিল্লীতে কী চাকরি করেন?

—আমি খবরের কাগজে কাজ করি।

মাষ্টারবাবু চোখ দুটো বড় বড় করে বললেন, আপনি জার্ণালিস্ট?

—হ্যাঁ।

আর এক মুহূর্ত সময় নষ্ট না করেই মাষ্টারবাবু বললেন, আসুন, আসুন।

ওকে অনুসরণ করে ওর অফিস ঘরে আসি। ঘরে একটা চেয়ার, একটা টেবিল, একটা আলমারী, একটা বেঞ্চ। আমাকে চেয়ারখানা এগিয়ে দিয়ে বললেন, বসুন।

আমি ওর অনেক অনুরোধ-উপরোধ উপেক্ষা করেও বেঞ্চিতে বসলাম। অনেক দ্বিধা-সঙ্কোচের সঙ্গে উনি চেয়ারে বসেই হাঁক দিলেন, রতিলাল!

বৃদ্ধ রতিলাল আমাকে ঘরে ঢুকতে দেখেই দরজার আড়ালে লুকিয়েছিল। মাষ্টারবাবুর হাঁক শুনে এবার সে আত্মপ্রকাশ করতেই হুকুম হল, কৃষ্ণাকে তাড়াতাড়ি চা করতে বল।

কৃষ্ণা! মেয়েটির নাম শুনে একটু অবাক হলেও মুখে কিছু বললাম না।

এবার মাষ্টারবাবু আবার আমাকে প্রশ্ন করেন, আপনি কী দিল্লীরই লোক? মানে আপনি কী পাঞ্জাবী?

—আমি বাঙ্গালী।

এতক্ষণ হিন্দীতেই কথাবার্তা চলছিল। এবার উনি প্রায় পাগলের মত চিৎকার করে বাংলায় বললেন, আপনি বাঙ্গালী ?

আমিও বাংলায় জবাব দিলাম, হ্যাঁ।

চিৎকার শুনে রতিলাল ছুটে আসে। ও কিছু বলার আগেই মাষ্টারবাবু বলেন, রতিলাল, বহু বছর পর একজন বাঙ্গালী পেয়েছি। তুমি আমার সাইকেল নিয়ে চটপট সৈয়দের কাছে গিয়ে একটু মাছ নিয়ে এসো। একটুও দেরি করো না।

আমি কিছু বলতে গেলাম কিন্তু ওরা কেউ আমার কথায় কান দিলেন না। রতিলাল মাষ্টারবাবুর হুকুম শুনেই প্রায় উড়ে গেল। মাষ্টারবাবুও সঙ্গে সঙ্গে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। পাঁচ-সাত মিনিট পরেই ফিরে এলেন। হাতে এক প্লেট ভর্তি মিষ্টি। ওর পিছনেই কৃষ্ণা। হাতে দু' কাপ চা। পরনে সুন্দর রঙীন শাড়ি। মাথায় ঘোমটা। হাতে চা নিয়েই ও মাথা নীচু করে বলল, নমস্কার

আমি কৃষ্ণার মুখে বাংলা শুনে অবাক বিস্ময়ে বলি, তুমি বাঙ্গালী ?

কৃষ্ণা ডান হাত দিয়ে ঘোমটা একটু টেনে একটু হেসে মাথা নেড়ে বলে, না বাবুজি, আমাদের দেশ জেতপুরের ওদিকে। আমি বাংলা জানে। মাষ্টারবাবু আমার গুরু আছে।

আমি হেসে বলি, তাই নাকি ?

কৃষ্ণাও হাসে। বলে, হ্যাঁ।

আমি চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বলি, তোমার নামটিও খুব সুন্দর।

ও মুখ নীচু করে হাসতে হাসতেই বলে, সেটাও মাষ্টারবাবুর কৃপা।

এবার আমি মাষ্টারবাবুর দিকে তাকাই। দেখি উনিও হাসছেন। বললেন, হ্যাঁ, আমিই ওর নাম রেখেছি কৃষ্ণা। ভারি ভাল মেয়ে।

প্রশংসা শুনে কৃষ্ণা লজ্জায় প্রায় মাটির সঙ্গে মিশে যায়। অনেক কষ্টে বলে, আমি ঘরে যাবে বাবুজি ?

—হ্যাঁ যাও।

কৃষ্ণা চলে যায়।

আমি এবার বাসের খোঁজ করি। মাষ্টারবাবু বললেন, একটা ব্রীজ ভেঙ্গে গেছে বলে ক'দিন বাস চলছে না।

— তাই নাকি ?

— হ্যাঁ।

— তাহলে কী করে যাব ?

মাষ্টারবাবু জিজ্ঞেস করলেন, ওদিকে যাওয়া কী খুবই দরকার ?

— কিছুদিন আগেই কচ্ছের রণ্ নিয়ে পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধ হয়ে গেল বলে এদিক ঘুরতে বেরিয়েছি।

— ভুজের দিকে গিয়েছেন কী ?

— হ্যাঁ, ওদিক ঘুরে এসেছি।

— তাহলে এদিকে আর কী দেখবেন। সঙ্গে সঙ্গে মাষ্টারবাবু হেসে বলেন, ভাগ্যক্রমে যখন আপনাকে পেয়েছি তখন দু'চারদিন না রেখে ছাড়ছি না।

আমি চমকে উঠি, বলেন কী ?

উনি আবার হেসে বলেন, আমি যেতে দিলেও রতিলাল বা কৃষ্ণা আপনাকে ছাড়বে না।

— কেন ?

— ওরা মানুষ বড় ভালবাসে।

এক মুহূর্ত থেমে ভেবে বলি, কিন্তু……

উনি মাথা নেড়ে বলেন, আমার আর রতিলালের কথা ছেড়েই দিলাম। আপনি কৃষ্ণাকে ছেড়েই যেতে পারবেন না। কথাটা শুনেই খটকা লাগল। বললাম, কেন ?

— ও এমন আদর-যত্ন করে যে ওকে ছেড়ে যাওয়া খুবই মুস্কিল।

ওর কথা শুনে আমি স্বস্তির নিশ্বাস ফেলি। বলি, তাই নাকি ?

একটু সলজ্জ আত্মতৃপ্তির হাসি হেসে মাষ্টারবাবু মুখ নীচু করে বললেন, শুধু ওর জন্যই তো আমি এখানে ক'টা বছর পড়ে আছি। আরো কতকাল থাকব তা ভগবানই জানেন।

শুনেও আমার মজা লাগে। ভালও লাগে। হাসি। ঠাট্টা করে বলি, তাহলে তো এখানে থাকা একদম নিরাপদ নয়।

মাষ্টারবাবু হো হো হেসে ওঠেন। পর মুহূর্তেই ম্লান হয়ে যায় মুখের হাসি। কেমন যেন বেদনার্ত সুরে বলেন, এ সংসারে আমার আপনজন নেই বললেই চলে। পেটের দায়ে এই পাণ্ডব-বর্জিত দেশে পড়ে আছি। কতকাল প্রাণভরে বাংলায় কথা বলি না। এবার আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, যখন এসেই

পড়েছেন, দু' একদিন থাকুন। সত্যি খুব খুশি হব।

কথাগুলো যেন এলোমেলো হয়ে বেরিয়ে এল ওর মুখ থেকে কিন্তু আমার মনে বড় দাগ কাটল। কথাগুলোর মধ্যে ওর আন্তরিকতার এমন স্পর্শ অনুভব করলাম যে কিছুতেই ওর অনুরোধ উপেক্ষা করতে পারলাম না। হেসে বললাম, আজ তো ট্রেনও নেই বাসও নেই; সুতরাং আজ তো আছি। তারপর কালকের কথা কাল ভাবা যাবে।

আবার কৃষ্ণা দু' কাপ চা নিয়ে হাজির। ওকে দেখেই আমি হেসে বললাম, আদর-যত্ন করে তুমি কী আমাকেও এখানে বন্দী করে রাখবে?

কৃষ্ণা মুখ নীচু করে হাসতে হাসতে বলল, বাবুজি, আপনি মুসাফির। মুসাফির ঘরে এলে তাকে দেবতার মত যত্ন করতে হয় কিন্তু আমরা তো গরীব আছে· ····

আমি মাথা নেড়ে বললাম, না, কৃষ্ণা, ঠিক হল না। যে মানুষকে ভালবাসতে পারে, সে তো কখনো গরীব হতে পারে না।

মাষ্টারবাবু হেসে বললেন, বাঃ! ভারী সুন্দর কথা বললেন তো।

চা খেতে খেতে আমি কৃষ্ণাকে জিজ্ঞেস করি, দুপুরে কি খাওয়াবে?

- বাবুজি, এখানে সব্জী খুব কম পাওয়া যায়। ইঞ্জিনের ড্রাইভারবাবু মাঝে মাঝে সব্জী এনে দেয়। একটু সব্জী আপনাকে খাওয়াবে। মচ্ছির ঝোল হবে। আর ডাল-পাঁপর তো জরুর পাবেন।

– তুমি মাছ খাও?

অত্যন্ত কুণ্ঠার সঙ্গে মুখ নীচু করে ও বলে, হ্যাঁ বাবুজি, আমি মচ্ছি খায়।

-- মচ্ছি না, বল মাছ।

· হা, হা, মাছ। গলতি হয়ে যায়।

আমি হেসেই বলি, আর যেন গলতি না হয়।

কৃষ্ণা মুখখানা গম্ভীর করে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, গলতি হলে আপনি মাফ করবেন না বাবুজি?

আমি ওর সারল্য, নিষ্পাপ মুখ দেখে যেন মুগ্ধ হয়ে যাই। এই পৃথিবীর দেশে দেশে ঘুরেও যেন এই স্নিগ্ধ পবিত্রতার মুখোমুখি হই নি কোন মন্দিরে-মসজিদে বা গির্জায়। এ সারল্য, এ পবিত্রতা যেন শুধু কাশবনে, শুধু শরতের আকাশে, দোয়েল-কোকিলের মধ্যেই দেখা যায়। হঠাৎ মনে হল এই কিশোরীকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে বলি, এই পৃথিবীতে এমন কোন পাপিষ্ঠ নেই যে তোমাকে মাপ করবে না। পারলাম না। মনের ইচ্ছা মনেই রইল। হেসে

বললাম, তোমার মত বুদ্ধিমতী মেয়ের তো গলতি হওয়া উচিত নয়।

—ঠিক বলেছ বাবুজি। আমার আর গলতি হবে না। আমি আর মচ্ছি বলবে না।

—তবে কি বলবে ?

কৃষ্ণা একটু জোরেই বলল, মাছ !

আমি আর মাষ্টারবাবু হেসে উঠি।

হাসি থামতেই কৃষ্ণা মাষ্টারবাবুকে বলে, বাবুজিকে ঘরে নিয়ে যাই ? আর কত সময় দপ্তরে বসবেন ?

আমি বললাম, না, না, আমি একলা যাব না। মাষ্টারবাবুর কাজ শেষ হলেই……

মাষ্টারবাবু বললেন, আপনি স্নান করে নিন। আমি একটু কাজ সেরেই আসছি।

কৃষ্ণা আর এক মুহূর্ত সময় নষ্ট করে না। এক হাতে আমার স্যুটকেশ তুলে নিয়েই অন্য হাতে আমাব একটা হাত ধরে টান দিয়ে বলে, চলিয়ে, চলিয়ে।

মাষ্টারবাবু আবার বললেন, আপনি যান। আমি আসছি।

কী আর করব ? কৃষ্ণার পিছন পিছন মাষ্টারবাবুর কোয়ার্টারে গেলাম।

কোয়ার্টার মানে একখানি ঘর, একটা বারান্দা, ঐ বারান্দার এক পাশেই রান্নাঘর। ছোট একটু উঠান। তার কোণায় একটু ঘেরা জায়গা। ওর নাম বাথরুম। তবে কলও নেই, পায়খানাও নেই। কোয়ার্টার আর স্টেশনের মাঝখানে একটা টিউবওয়েল আছে। প্রাকৃতিক কাজকর্মের জন্য মুক্তাঙ্গন।

তা হোক। শুধু ঘরখানি নয়, সমস্ত বাড়িটাই অত্যন্ত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও পরিপাটি করে সাজান গোছান। ঘরের দেয়ালে রবীন্দ্রনাথের একটা ছবি। বোধহয় কোন ক্যালেণ্ডার থেকে কেটে বাঁধান। একটা চেয়ার-টেবিলও আছে ঘরটার এক কোণায়। খুব পুরনো দু' তিনটে শারদীয়া সংখ্যা অত্যন্ত সযত্নে রাখা আছে টেবিলের ওপর। এছাড়া দুটো-একটা ডায়েরি ও কাগজ-কলম। ঘরের সব চাইতে উল্লেখযোগ্য দ্রষ্টব্য হচ্ছে, টেবিলের উপর ছোট এক টুকরো কাঁচের তলায় কৃষ্ণার একটা ছবি। মনে মনে হাসি। ভাবি, যে মাটিতে বজরা-ভুট্টার চাষ করতে চাষীর প্রাণ বেরিয়ে যায়, সে মাটিতেই স্বচ্ছন্দে মানুষের মনে জন্ম নেয় সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ।

স্নান করার জন্য টিউবওয়েলের দিকে পা বাড়াতেই কৃষ্ণা বলল, বাথরুমেই জল

আছে। বাথরুমে ঢুকে দেখি, চাব বালতি জল, সাবান, ছোট্ট একটা তোয়ালে রাখা আছে। স্নান করে ঘরে আসতেই কৃষ্ণা আয়না-চিরুনী এগিয়ে দিল। তারপরই নিয়ে এল এক গেলাস সরবং। আমি প্রতিবাদ করি না। হাসি আর কৃষ্ণাকে দেখি।

—তোমার মা নেই কৃষ্ণা ?

—না বাবুজি, আমার মা নেই। আমি যখন সাত সালের তখন আমার মা মারা যায়।

—তুমি এখানে আছ ক' বছর ?

—আমি যখন সাত সালের তখন থেকেই আছি।

আমি আর প্রশ্ন করি না। চেয়ারে বসে সরবং খেতে খেতে কৃষ্ণার কথা শুনি। এখন যেখানে স্টেশন, আগে এখানেই ছিল লেভেল-ক্রশিং। সে লেভেল-ক্রশিং পাহারা দিত রতিলাল। দক্ষিণ দিকে মাইলখানেক দূরে বড় রাস্তা তৈরী হবার পর এই লেভেল-ক্রশিং-এর জায়গায় তৈরী হল স্টেশন। নতুন মাষ্টারবাবু এলেন ভেরাবল থেকে কিন্তু পুরো দুমাসও থাকলেন না। আবার মাষ্টারবাবু এলেন, গেলেন। কেউই এখানে থাকতে চায় না। থাকবে কেন ? পড়ালেখা জানা শহরের মানুষ কি এখানে থাকতে পারে ?

ক'টা বছর এইভাবেই কেটে গেল। তারপর একদিন সকালবেলার গাড়িতে এই বাঙ্গালী মাষ্টারবাবু এসে হাজির। মাষ্টারবাবু না পারেন রাঁধতে, না পারেন গুজরাতী বলতে; মাষ্টারবাবু কোনদিন খাওয়া-দাওয়া করেন, কোনদিন করেন না। চা আর ভাজাভুজি খেয়েই কাটিয়ে দেন। রতিলাল বজরার রুটি দিতে দ্বিধা করে। ভয়ও পায়। মাষ্টারবাবু প্রায় সারা দিনরাতই স্টেশনে থাকেন। কোন কোনদিন রাত্রের মালগাড়ি চলে গেলে কোয়ার্টারে আসেন; তবে রোজ নয়। অফিসের টেবিলেই ঘুমিয়ে পড়েন। স্টেশন পাহারা দেবার কাজ খালাসী রতিলালের। সে মেঝেয় শুয়ে থাকে। কিন্তু মাষ্টারবাবুর সামনে ঘুমুতে দ্বিধা করে। সময় সময় ওরা বাপ-বেটিতে আলোচনা করে কিন্তু ভেবে পায় না কে বেড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধবে। শেষ পর্যন্ত একদিন রতিলালের কিশোরী মেয়ে মাথার ঘোমটা আরো একটু সামনে টেনে এগিয়ে এল।

—বাবুজি !

—কে ?

—আমি খালাসীর বেটি।

মাষ্টারবাবু বিছানায় শুয়ে শুয়ে পুরনো শারদীয়া সংখ্যার পাতা ওলটাতে ওলটাতে মুখ না তুলেই বলেন, কী চাই ?

—কিছু চাই না বাবুজি। আপনি হাত-মুখ ধুয়ে নিন। আমি আপনার খানা নিয়ে এসেছি।

—খানা ? মাষ্টারবাবু অবাক।

—হ্যাঁ বাবুজি, খানা। জলদি হাত-মুখ ধুয়ে নিন। খানা ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

মাষ্টারবাবু বিছানায় উঠে বসে জিজ্ঞেস করেন, কে তোমাকে খানা আনতে বলল ?

- আগে হাত-মুখ ধুয়ে খেয়ে নিন, পরে সব জবাব দেব।

মাষ্টারবাবু খেতে খেতেই রতিলালের বেটি বিছানা ঠিক করে টেবিলের ওপর এক গেলাস জল ঢেকে রাখে। মাষ্টারবাবু ঘরে ঢুকতেই সে বলল, মালগাড়িকে আলো দেখাবার জন্য আপনাকে আর স্টেশনে যেতে হবে না। এখন শুয়ে পড়ুন। অনেক রাত হয়েছে।

—রতিলাল কোথায় ?

- খেয়েদেয়ে স্টেশন চলে গেছে।

মাষ্টারবাবু শুয়ে পড়েন। রতিলালের বেটি চলে যায় কিন্তু অনেকক্ষণ শুয়ে থাকার পরও মাষ্টারবাবুর চোখে ঘুম আসে না, রতিলালের বেটির কথাই শুধু ভাবেন।

রাত আরো গভীর হয়। বিছানায় শুয়ে শুয়েই মাষ্টারবাবু শুনতে পান মাল-গাড়ি আসছে। হঠাৎ দরজার বাইরে বারান্দার কোণায় একটা ছায়া মূর্তি দেখেই চিৎকার করে ওঠেন, কে ?

রতিলালের বেটি বলে, আমি।

- তুমি ? এত রাত্রে ?

—আপনি ঘুমোন নি মাষ্টারবাবু ?

—না।

মাষ্টারবাবু বিছানা ছেড়ে দরজার কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করেন, তুমি এত রাত্রে কি করছ ?

-- সত্যি কথা বলব ?

—হ্যাঁ, সত্যি কথা বল।

- রাগ করবেন না ?

—না।

রতিলালের বেটি একটু ভেবে বলে, দেখছিলাম আপনি শুয়ে আছেন নাকি স্টেশনে গিয়েছেন।

এবার মাষ্টারমশাই আর গম্ভীর থাকতে পারেন না। হেসে ওঠেন। আরো দু' এক পা এগিয়ে ওর সামনে দাঁড়ান। হাসতে হাসতেই জিজ্ঞেস করেন, তুমি ঘুমোও নি কেন ?

রতিলালের বেটি আবার বলে, সত্যি কথা বলব মাষ্টারবাবু ?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, সত্যি কথাই বল।

শুয়ে শুয়ে আপনার কথা ভাবছিলাম।

—অ্যাঁ! আমার কথা ?

—হ্যাঁ, আপনার কথা। রোজ রাত্রে শুয়ে শুয়ে আপনার কথা ভাবি।

মাষ্টারবাবু আবার প্রশ্ন করেন, আবার জবাব দেয় রতিলালের বেটি, আপনি খাওয়া-দাওয়া করেন না সব সময় কি যেন ভাবেন, বিশেষ কথাবার্তাও বলেন না, তাইতো আপনার কথা ভাবি।

বিকেলবেলায় মাষ্টারবাবুর সঙ্গে রেল লাইনের ওপর দিয়ে বজরার ক্ষেতের পাশের কালভার্টের উপর বসে কথা হচ্ছিল। তখন রতিলালের বেটির কতই বা বয়স! বড় জোর এগার-বারো। নিতান্তই কিশোরী! তার মনেও এত প্রশ্ন ? আমাকে নিয়ে এত চিন্তা ? রতিলাল স্টেশনে ডিউটি দেয়। আর সে একলা ঘরে শুয়ে শুয়ে শুধু আমার কথাই ভাবে ?

মাষ্টারবাবু যেন থমকে দাঁড়ান। দাঁড়াবেন না ? ওর জীবনে যে অনেক দুঃখ, অনেক হতাশা। বাবা টিটাগড়ের কারখানায় কাজ করতেন আর ও দেশে থাকত মার কাছে। সেই ছোটবেলার কথা কিন্তু তবু ওর মনে আছে, বাবা বিশেষ দেশে আসতেন না। কদাচিৎ কখনও এলেও বোতল থেকে ঢেলে কি যেন খেতেন। শুরু করতেন চেঁচামেচি—মারধোর।

অবোধ শিশু আব একটু বড় হল। বুড়ী ঠাকুমার হাত ধরে গ্রামের স্কুলে যায়, আসে। রাত্তির বেলায় হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে যায়। স্কুলের এক মাষ্টারমশায়ের সঙ্গে মাকে ফিস ফিস করে গল্প করতে দেখে চমকে ওঠে। ভয় পায়। ঘুম আসে না কিন্তু চোখ বন্ধ করে শুয়ে থাকে। মাঝে মাঝে চোখ খোলে। দেখে, মাষ্টারমশাই আর মা খেলা করছে।

ক'বছর পর টিটাগড়ের কারখানা থেকে চিঠি এল, বাবা মারা গেছেন। তার কিছুদিন আগেই বুড়ী ঠাকুমা গত হয়েছেন। সাত-আট বছরের শিশুপুত্রকে সঙ্গে নিয়ে কাটোয়া লোক্যালে চেপে মা চলে আসেন কলকাতা। হাওড়া স্টেশনে অভ্যর্থনা জানালেন সেই মাষ্টারমশাই।

উপেক্ষা আর অনাদরের মধ্যেও পিতৃহীন বালক বড় হয়। খুঁড়িয়েই পার হয় ক'টা বছর। সোমনাথ তখন চোদ্দ বছরের কিশোর। ছবিটা তখন অনেক বেশী স্পষ্ট। বুকের ব্যথা প্রায় অসহ্য। মনের মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টা আগুন জ্বলছে দাউ দাউ করে। বাড়ি থেকে পালাল সোমনাথ।

মাষ্টারবাবু একটু ম্লান হাসি হেসে বলেন, ক'টা বছর বড় কষ্টে কাটালাম। কত জনে কত বদনাম দিয়েছে। কেউ বলেছে চোর ; কেউ বলেছে পকেটমার। মারধোরও খেয়েছি বহুবার।

আমার অজ্ঞাতসারেই আমার মুখ দিয়ে আওয়াজ বেরোয়, ইস !

—ঘুরতে ঘুরতে এলাম নাসিক। সৌভাগ্যক্রমে এক বৃদ্ধ মিঠাই-ওয়ালার কৃপা লাভ করলাম। ঐ বৃদ্ধের দোকানেই থাকি ; কাজকর্মও করি। ওরই দয়ায় আবার পড়াশুনা শুরু করলাম।

—তারপর ?

—স্কুলের গণ্ডী পার হতে না হতেই বৃদ্ধ মারা গেলেন। ওর ছেলে বোম্বেতে চাকরি করত। তাছাড়া মিষ্টির দোকানের কাজও জানত না। ব্যবসা তুলে দিল। আমিও ওরই সঙ্গে বোম্বে চলে এলাম।

—তারপর ?

—এটা-ওটা করতে করতেই রেলের চাকরি পেয়ে গেলাম।

—এখানে এলেন কেন ?

মাষ্টারবাবু একটু শুকনো হাসি হেসে বলেন, একদিন হঠাৎ কোন্নগর স্কুলের এক পুরনো বন্ধুর সঙ্গে দেখা হল চার্চ গেটের ধারে। কথায় কথায় তার কাছে মার অনেক কীর্তি শুনলাম ?

মাষ্টারবাবু আর বলতে পারেন না। থামেন। আমি অবাক হয়ে ওকে দেখি।

একটু পরেই উনি আবার শুরু করলেন, বন্ধুর কাছে ঐসব শুনে মনটা খুবই খারাপ হয়ে গেল। তাই মনে মনে ঠিক করলাম, এমন জায়গায় যাব যেখানে কোন পরিচিতের মুখ কোনদিন দেখব না। মাষ্টারবাবু হঠাৎ একটু হেসে বললেন,

অনেক খোঁজখবর, অনেক চেষ্টা করে এখানে এসেছি।

হঠাৎ নজর পড়ে, রেল লাইনের ধার দিয়ে কৃষ্ণা আসছে। মাষ্টারবাবুকে বললাম, দেখুন দেখুন, কৃষ্ণা আসছে।

—নিশ্চয় চা নিয়ে আসছে।

—ও জানল কেমন করে, আমরা এখানে আছি ?

—প্রায় রোজ বিকেলের দিকেই আমি এই কালভার্টের উপব বসে থাকি।

—তাই নাকি ?

—হ্যাঁ, এ জায়গাটা আমার খুব প্রিয়। অনেকদিন রাত্রেও আমি এখাে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকি।

—কৃষ্ণা এখানে এসেও চা দিয়ে যায় ?

—হ্যাঁ।

মাষ্টারবাবুর সংসারে ফ্লাস্ক নেই কিন্তু কেটলি আছে। কৃষ্ণা সেই কেটলিব চারপাশে জড়িয়েছে ছোট একটা তোয়ালে। সে মাষ্টারবাবুকে আর আমাকে গরম চা খাওয়াবেই। আমি দেখে হাসি। মনে মনে খুশি হই, মুগ্ধ হই ওর আন্তরিকতা আব ভালবাসা দেখে।

কৃষ্ণা চা খায় না। আমরা দুজনে চা খাই। দুটো-একটা কথাবার্তার পরই ও মাষ্টারবাবুকে বলে, মাষ্টারবাবু, আজ আমি পডবে না।

—কেন ? মাষ্টারবাবু প্রশ্ন কবেন।

কৃষ্ণা তার কালো হরিণ-চোখ ঘুরিয়ে বলে, আজ আমি পডবে কেন ? আজ তো বাবুজির সঙ্গে কথা বলবে।

মাষ্টারবাবু হেসে বলেন, বাবুজির সঙ্গে তো আমি গল্প করব। তুমি কেন পড়বে না ?

কৃষ্ণা মাথা নেড়ে বেণী দুলিয়ে বলে, না, না, আজ আমি জরুর বাবুজির সঙ্গে গল্প করবে।

আমি না হেসে পারি না। আমি ওর মাথা ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বলি, না, না, আজ তোমাকে পড়তে হবে না। আজ আমি আর তুমি গল্প করব।

—আর মাষ্টারবাবু ?

—মাষ্টারবাবু আজ সারা রাত স্টেশনে ডিউটি দেবে।

আমার কথা শুনে ও হাসিতে ফেটে পড়ে। মাষ্টারবাবুও হাসেন।

কৃষ্ণা কেটলি থেকে আবার চা ঢেলে দেয়। আমরা চা খাই। গল্প করি।

হাসি। তিনজনে একসঙ্গে ফিরে আসি। কৃষ্ণা কোয়ার্টারে যায়। আমরা দুজনে স্টেশনে বসি। ঘোরাঘুরি করি। কত কথা শুনি, কত কথা বলি। সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে আসে ভারতবর্ষের পশ্চিম দিগন্তের প্রত্যন্ত অঞ্চলে। রতিলাল অফিস ঘরে আলো জ্বেলে দিয়ে কোয়ার্টারে যায়। ফিরে আসে খাওয়া-দাওয়ার পর। আমরা তখনও গল্প করি।

রতিলাল তাগিদ দেয় কিন্তু আমরা উঠতে পারি না। গল্পের নেশায় এমনই মশগুল যে উঠব উঠব করেও উঠতে পারি না। শেষে ছুটে আসে কৃষ্ণা। আমরা আর দেরি করি না।

খাওয়ার আগে, খাওয়ার পরে আবার গল্প। তিন জনেই যেন গল্পের নেশায় মাতাল হয়ে গেছি। কোয়ার্টারের বাইরে চাটাই বিছিয়ে গল্প করতে করতে ভুলে গেছি শুক্ল তৃতীয়ার রাতের মেয়াদ আর বেশি নেই। হঠাৎ মাষ্টারবাবু উঠে কোয়ার্টারে যান। বোধহয় বাথরুমে। কৃষ্ণা হাত দিয়ে আমার মুখখানা ওর দিকে ঘুরিয়ে নিয়ে প্রশ্ন করে, আচ্ছা বাবুজি, আমার মাষ্টারবাবু খুব ভাল না ?

উনযৌবনার কথা শুনে মুগ্ধ হই। বলি, হ্যাঁ, তোমার মাষ্টারবাবু খুব ভাল লোক।

ওদের সান্নিধ্যে দুটো দিন কাটিয়ে দিলাম।

পরের দিন সকালের ট্রেনেই চলে যাব। শেষ রাত্তিরের দিকে শুতে এলাম। হঠাৎ মাষ্টারবাবু প্রশ্ন করলেন, আমি কি ভুল করলাম ?

—না, না, ভুল করবেন কেন ? ঠিকই করেছেন। একটু থেমে বললাম, ভগবান দু-হাত দিয়ে যাকে এগিয়ে দিয়েছেন তাকে বুক পেতে গ্রহণ করার মধ্যে কোন অন্যায়, কোন ভুল নেই।

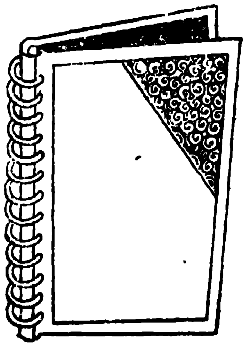
পরের দিন সকালে সকলের চোখেই জল। গাড়ি এসে থামল এই অখ্যাত অপরিচিত হল্ট-এ।

কৃষ্ণা কাঁদতে কাঁদতে আমাকে বলল, বাবুজি, এর পরের বার এসে তুমি আমাকে বাঙ্গালীদের দেশে নিয়ে যাবে। আমি আরো ভাল বাংলা শিখবে, আরো ভাল খানা বানাবে।

বিদায়বেলার বিচ্ছেদ বেদনার মধ্যেও আমি হাসি। বলি, তোমার মাষ্টারবাবু নিশ্চয়ই তোমাকে বাঙ্গালীদের দেশে নিয়ে যাবে। ওটা তো তোমারও দেশ।

রতিলাল গামছা দিয়ে চোখের জল মুছে বলল, হ্যাঁ বাবুজি, ও আপনাদেরই মেয়ে আছে।

গাড়ি ছেড়ে দিল। আমি লাফিয়ে ট্রেনে উঠলাম।



কর্ণেল সাহেব

আজ মনে হচ্ছে এতকাল খবরের কাগজে কাজ করেও বহু কাহিনী লিখতে পারি নি। কত অসংখ্য মানুষের সুখ-দুঃখের মুখোমুখি হয়েছি কিন্তু তাদের সে আনন্দ-বেদনার কথা, চোখের জলের কাহিনী, সংগ্রাম ও সাফল্যের ইতিহাস খবরের কাগজে স্থান পায়নি। তাইতো কর্ণেলের কাহিনী কেউ জানে না।.....

নবজাতকের কোষ্ঠী তৈরী করতে গিয়েই পণ্ডিতমশাই চমকে উঠলেন। মনের সন্দেহ দূর করার জন্য নতুন করে ছক করলেন; দ্বাদশটি ঘর বিচার করলেন অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে। না, আগের বিচারও ভুল হয়নি। পণ্ডিতমশায়ের মনটা একটু খারাপ হয়ে গেল কিন্তু নরেন সরকারের কাছে চেপে গেলেন। চেপে যাবেন না? নরেন একে প্রতিবেশী, তার উপর ছোট ভাইয়ের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও সহপাঠী। উনি শুধু বললেন, তোমার ছেলে চরিত্রবান হবে, চিকিৎসা শাস্ত্রে উচ্চ শিক্ষিত হবে এবং অত্যন্ত কর্তব্যপরায়ণ হবে। আনন্দে খুশিতে নরেনবাবু সেদিন দুপুর থেকেই হুইস্কির বোতল নিয়ে বসলেন।

নরেনবাবু ভাড়াটে হলেও এ পাড়ার পুরানো বাসিন্দা। তাইতো পণ্ডিত-মশাইকে উনি বড়দা বলেন আর বিনয়বাবু ওর রাঙাদা। নরেনবাবুকে পাড়ার সবাই ভালবাসেন; বুড়ো-বুড়ী, ছেলে-মেয়ে কচি-কাঁচা সবাই। ওর মত প্রাণবন্ত মানুষ এ পাড়ায় আর নেই। তবে সন্ধ্যের পর, রাত্রিতে নরেনবাবুকে পাড়ার সবাই ভয় করেন। মদ খেলে উনি আর মানুষ থাকেন না। ওর চিৎকার আর গালি-গালাজ শুনেই পাড়ার সবাই বুঝতে পারেন, নরেন সরকার ফিরছেন। এর।

উপর রিক্সা থেকে নামার সময় প্রায়ই ওর কাপড় খুলে যায়। কোন কোনদিন এর-ওর বাড়ির সামনে পেচ্ছাবও করে দেন।

সব মিলিয়ে এক বিচ্ছিরি পরিস্থিতি। নরেনবাবুর স্ত্রী বাণী তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আসেন। কোন মতে টেনেটুনে স্বামীকে বাড়ির মধ্যে নিয়ে যায়। বাণীর ভাগ্য সুপ্রসন্ন হলে নরেনবাবু সঙ্গে সঙ্গে বিছানায় লুটিয়ে পড়েন। আবার কোন কোনদিন বাড়িতে এসেও উনি এমন বেলেল্লাপনা শুরু করেন যে বাণীর লজ্জায় মাথা কাটা যায়। সারা রাত্রি বিভীষিকার মধ্যে কাটান নরেনবাবুর স্ত্রী।

শেষ রাত্তিরের দিকেই সব মেঘ কেটে যায়। ভোর হবার আগেই স্ত্রীকে আদর-ভালবাসায় ভরিয়ে দেয় নরেন সরকার। সকালবেলায় নরেন সরকারকে দেখে বিশ্বাস করা যায় না, রাত্রিবেলায় ইনিই গাড়ার কলংক, বাণীর আতংক।

ছোট্ট শিশুটার মুখের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে থাকেন নরেন সরকার। অনেকক্ষণ। বাণী মাছের ঝোল চাপিয়ে এ ঘরে ঢুকেই বলেন, ক'টা বাজে জানো ?

উনি মুখ না তুলেই বলেন, ক'টা ?

—সাড়ে আটটা।

—বাজুক।

—বাজুক মানে ? আজ কী অফিস যাবে না ?

—যাব, যাব।

—তাহলে আর ছেলেকে দেখতে হবে না। উঠে পড়ো।

এবার নরেন সরকার স্ত্রীর দিকে তাকান। সারা মুখে পরিতৃপ্তির হাসি লেগে আছে। বলেন, যাই বলো বাণী, খোকনকে ভাল করে দেখলেই বেশ বোঝা যায় ও একটু অন্য ধরনের, তাই না ?

বাণী একটু হেসে বলেন, অন্য ধরনের মানে ?

—খোকন যে দশ জনের একজন হবে, তা ওর চোখ দুটো দেখলেই বোঝা যায়।

—তাই নাকি ?

—একশ বার।

—আচ্ছা এবার তুমি ওঠো ; নইলে অফিস যাওয়া হবে না।

শুধু বাজার যাওয়া ছাড়া সারা সকাল নরেন সরকার ছেলেকে নিয়েই কাটান। প্রতিদিনই ঐ ছোট্ট শিশুটার চোখে-মুখে প্রতিভার কোন না কোন ইঙ্গিত

আবিষ্কার করেন উনি। তাছাড়া কত কথা, কত আলোচনা।

—আচ্ছা বাণী, খোকনকে কোন্ স্কুলে পড়াবে ?

– তোমার কী ইচ্ছা ?

— স্কটিশ বা সেণ্ট পলস্-এ পড়ানই ভাল।

—হ্যাঁ, তাই দিও।

– ডাক্তারী তো মেডিক্যাল কলেজেই পড়াব।

স্বামীর কথা শুনেও বাণীর ভাল লাগে। বলেন, তাছাড়া আর কোথায় পড়বে।

স্বামীকে নিয়ে বাণীর সুখেরও শেষ নেই, দুঃখেরও অন্ত নেই। সেদিন শনিবার দুপুরবেলায় অফিস থেকে ফিরেই নরেনবাবু স্ত্রীকে বললেন চোখ বন্ধ করো।

বাণী হাসতে হাসতেই চোখ বন্ধ করে।

নরেনবাবু এবার বলেন, হাত এগিয়ে দাও।

বাণী হাত এগিয়ে দিতেই নরেনবাবু ওর হাতে দু'খানা রেলের টিকিট দেন।

বাণী সঙ্গে সঙ্গে চোখ খুলেই বলেন, একি ! কোথাকার টিকিট ?

—পুরীর।

—পুরীর ! চমকে ওঠেন বাণী।

—ক'দিন আগে তুমি বলছিলে, পুরীর সমুদ্র দেখতে খুব ইচ্ছে কর তাই……।

বাণী বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে স্বামীকে দেখে বলেন, তুমি সত্যি পাগল। কখন যে কি পাগলামী করবে তার ঠিক নেই।

—তোমার মত স্ত্রীকে নিয়েও পাগলামী করব না ?

—তোমার বয়স কী দিন দিন কমছে ?

—তুমি এমন আঁট-সাঁট বাঁধুনী দিয়ে চেহারাটাকে রেখেছ যে আমার বয়স বাড়লে চলবে কেন ?

সময় দাঁড়িয়ে থাকে না। পৃথিবী আপন গতিতে আবর্তন করে। খোকন বড় হয় ; জন্ম হয় আরো দুটি ভাই-বোনের। নরেনবাবুর পদোন্নতি হয়, মাইনে বাড়ে, সন্ধ্যার পর মদ্যপানের মাত্রাও বৃদ্ধি পায়।

খোকন আরো বড় হয় ; বড় হয় ওর ভাইবোন।

খোকন পড়তে বসেও মন বসাতে পারে না। কি যেন ভাবে। চোখের

দৃষ্টি, মুখের চেহারায় বিষণ্ণতার ছাপ স্পষ্ট হয়। খোকনকে এইভাবে অনেকক্ষণ বসে থাকতে দেখে বাণী এগিয়ে যান ওর কাছে। ছেলের মাথার উপর আলতো করে হাত রেখে জিজ্ঞাসা করেন, কী এত ভাবছিস ?

— বাবার কথা ভাবছি। খোকন সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেয়।

— কেন ? উনি কিছু বলেছেন ?

—না।

— তবে কী ভাবছিস ?

—রোজ সন্ধ্যেবেলা থেকে মাঝ রাত্তির পর্যন্ত এভাবে হৈ-হুল্লোড করলে কিভাবে……

খোকন কথাটা শেষ করতে পারে না। বোধহয় সংকোচ হয়।

বাণী ছেলের মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে বলেন, ছোটবেলা থেকেই তো দেখছিস উনি সন্ধ্যের পর একটু বেসামাল হয়ে পড়েন। তাছাড়া সারাদিন তো উনি আমাদের কাউকেই বিরক্ত করেন না।

খোকন তর্ক করে না কিন্তু দুঃখ করে বলে, তুমি তো জানো না বাবার জন্য বন্ধুদের কাছে আমাকে কত কথা শুনতে হয়।

মা ওকে সান্ত্বনা দেন, সবই বুঝি কিন্তু কি করবি বল।

দেখতে দেখতে আরো ক'টা বছর পার হলো। খোকন সামনের বছর ম্যাট্রিক দেবে অন্য দু'ভাইবোনও বেশ বড় হয়েছে। নরেন বাবুর মদ্যপানের মাত্রা আরো অনেক বাড়ে। খোকন আর চুপ করে থাকে না, থাকতে পারে না। প্রতিবাদ করে, তুমি রোজ মদ খেয়ে এভাবে মাতলামী করলে আমরা লেখাপড়া করব কী করে ? নরেনবাবু কখনও চুপ করে থাকেন, কখনও নেশার ঘোরেই নিজের ছেলেকেই যা তা বলেন, ভাগ শূয়ার কা বাচ্চা ! তোর বাপের পয়সায় মদ খাই ?

খোকনের ম্যাট্রিক পরীক্ষার দু'তিন মাস আগে একদিন রাতে নরেনবাবু এমন অশ্লীল ও জঘন্য কাজ করলেন যে ও আর সহ্য করতে পারল না। পরের দিন সকালেই খোকন বাড়ি ছেড়ে চলে গেল।

সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর মত উদাসীন হয়ে সময় তখনও এগিয়ে চলল।

ম্যাট্রিকের রেজাল্ট বেরুতেই নরেনবাবু চমকে উঠলেন। খোকন ফার্স্ট ডিভিশনে পাশ করেছে ? তিনটে লেটার পেয়েছে। আনন্দে খুশিতে পাগল হয়ে নরেনবাবু ছুটে গেলেন ছেলের কাছে। বুকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে কাঁদতে বললেন,

তোকে ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করছি আমি আর মদ খাবো না।

না, পুনর্মিলন উৎসবের আনন্দ দীর্ঘস্থায়ী হলো না। যিনি বহুকাল ধরে প্রতিদিন আকণ্ঠ মদ্যপানে অভ্যস্ত ছিলেন, হঠাৎ মগুপান বন্ধ করায় তাঁর দেহ বিদ্রোহ করল। খোকনকে ফিরিয়ে আনার ক'দিনের মধ্যে নরেনবাবু এ সংসার থেকে চিরকালের মত বিদায় নিলেন।

পণ্ডিতমশাই তখনও জীবিত। উনি একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সামনের বাড়ির বিনয়বাবুকে বললেন, খোকনের কোষ্ঠী করার সময় যা ভয় করেছিলাম, তাই হলো।

যাই হোক এই মহাবিপর্যয়ের দিনেও সময় একবারের জন্যও থমকে দাঁড়াল না। স্বভাবসিদ্ধ গতিতে পৃথিবী ঘুরে চলল। পাড়ার লোকজন সাহায্য-সহানুভূতি নিয়ে এগিয়ে এলেন। মাসখানেক কোন মতে কেটে গেল।

তারপর ?

খোকন বিনয়বাবুকে বললো, জ্যেঠু, বাবার সব দেনা শোধ করে মোটে হাজার দুয়েক টাকা মার হাতে আছে। তাই এ বাড়ি ছেড়ে আমরা বেলেঘাটায় চলে যাচ্ছি।

— বেলেঘাটায় ?

—হ্যাঁ, বেলেঘাটায় আঠারো টাকা ভাড়ায় একখানা কাঁচা ঘর ভাড়া নিয়েছি মাকে বলেছি, ঐ হাজার দুয়েক টাকা থেকে বাড়িভাড়া আর ভাইবোনের স্কুলের মাইনে দিতে।

—খাওয়া দাওয়ার খরচপত্র......

জ্যেঠুকে কথাটা শেষ করতে দেয় না খোকন। বলে, আপনার আশীর্বাদে আমি ছাত্র পড়িয়েই সে টাকা আয় করব।

—তাহলে কি তুই ঠিকমত পড়াশুনা করতে পারবি ?

— পড়াশুনা ঠিকই করব ; তবে একটু বেশী পরিশ্রম করতে হবে।

বৃদ্ধ অভিজ্ঞ বিনয়বাবু বললেন, একটু না অসম্ভব করতে হবে। তারপর একটু ভেবে একটু থেমে বললেন, তুই পারবি। যুদ্ধে নেমে পড়। আর সেই সময় মনে রাখিস এই বুড়ো জ্যেঠু তোর পিছনে আছে।

কলেজে ভর্তি হবার সময় পার হয়ে যায় যায়। হাতে একেবারেই সময় ছিল না। তাই সময় নষ্ট না করেই খোকন যুদ্ধে নেমে পড়ল। বেলেঘাটার বস্তিতে একখানি মাত্র ঘর। তাই জামাকাপড়, সামান্য বাসনকোসন আর একখানি

খাট ছাড়া প্রায় সব কিছুই বিক্রী করে মার হাতে আরো কিছু টাকা তুলে দিল খোকন। তারপর একদিন বহু পরিচিত পরিবেশ ছেড়ে যাত্রা করল অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে।

সকালে দুটি, বিকেল-সন্ধ্যেয় তিনটি টিউশনির মাঝখানে কলেজ করেও খোকন ফার্ষ্ট ডিভিশনে আই এস-সি পাশ করল। বেলেঘাটার ঐ বস্তি বাড়ির ঘরখানিতে হঠাৎ বিদ্যুতের আলোয় অমাবস্যার অন্ধকার হারিয়ে গেল কয়েক দিনের জন্য।

আবার নতুন দুঃশ্চিন্তা। অতঃ কিম? মা বললেন, না, না, খোকন তুই মেডিক্যাল কলেজেই ভর্তি হবি। তোকে ডাক্তার হতেই হবে।

—কিন্তু .....

—না, না, কোন কিন্তু নয়। আমার যা সোনাদানা এখনও পড়ে আছে তা দিয়ে তুই অনায়াসে ভর্তি হতে পারবি।

দুই ভাইবোনও বললো, হ্যাঁ দাদা, তুই ডাক্তারী পড়।

খোকন দু'ভাইবোনকে দু'হাত দিয়ে বুকের কাছে টেনে নিয়ে বললো, তাহলে আরো পাঁচ বছর তাদের এই দুঃখকষ্ট ভোগ করতে হবে।

ভাইমণি বললো, আমরা আর এমন কী কষ্ট করছি? কষ্ট তো তুই করছিস।

খোকন হেসে বললো, কষ্ট করছি কোথায়? একটু পরিশ্রম করছি।

খোকনের মনে তবু দ্বন্দ্ব। ছুটে গেল জ্যেঠুর কাছে। বিনয়বাবু বললেন, বৌমা ঠিকই বলেছেন; তুই নিশ্চয়ই ডাক্তার হবি।

—কিন্তু জ্যেঠু, সে তো অনেক খরচ। তাছাড়া পাঁচ বছরের ধাক্কা।

—তাহোক। উনি একটু থেকে বললেন, তুই ডাক্তার না হলে তোর সঙ্গে সঙ্গে আমরা সবাই হেরে যাব।

—কিন্তু টিউশানির আয়ের উপর ভরসা করে ডাক্তারীতে ভর্তি হওয়া কি ঠিক হবে?

—ভয় পাচ্ছিস কেন? তুই ঠিক কোন স্কলারশিপ পেয়ে যাবি। তাছাড়া আমি কি মরে গেছি?

—কিন্তু জ্যেঠু, আপনি আর কত সাহায্য করবেন?

—দূর বোকা। আমি তোকে সাহায্য করব কেন? আমি শেষ বয়সের জন্য তোর কাছে কিছু গচ্ছিত রাখছি।

শেষ পর্যন্ত খোকন মেডিক্যাল কলেজেই ভর্তি হলো।

বিনয়বাবু অল্প বয়সেই স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন। তার পর অরবিন্দ-বারীন্দ্রের সংস্পর্শে এসে ভিড়ে যান বিপ্লবীদের দলে। বহুকাল জেল খেটেছেন। পুরানো বিপ্লবীদের এক অনুষ্ঠানেই বিনয়বাবুর সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ, আস্তে আস্তে ঘনিষ্ঠতা। তাই মাঝে মাঝে ওর ছোট ছাপাখানায় বসে নানাজনের নানা কাহিনী শুনতাম। একদিন কথায় কথায় এই খোকনের কাহিনীও বললেন।

সত্যি এমন দুর্জয় প্রতিজ্ঞা নিয়ে লড়াই করতে কম ছেলেকে দেখেছি। বৃদ্ধ বিনয়দা একটু হেসে বলেন, খোকন আগে জন্মালে ও ঠিক টেগার্টকে মারতে পারতো।

আমি চুপ করে শুনি।

—সাড়ে সাতটা-আটটায় মেডিক্যাল কলেজে পৌঁছবার পথেই এক ছাত্রকে পড়াতো। তারপর বিকেলের দিকে পর পর আরো তিনটে। তাও ট্রামে বাসে নয় পায়ে হেঁটে।

বিনয়দা বললেন, খোকনের কথা যত শুনবে তত অবাক হবে। হরেনবাবু তখন গভর্ণর। একদিন কথায় কথায় খোকনের কথা বললাম। কয়েকদিন পর হরেনবাবু আমাকে বললেন, ছেলেটিকে সাহায্য করবো বলে কিছু টাকা জোগাড় করেছি। ওকে একদিন নিয়ে আসুন।

আমি প্রশ্ন করি, খোকনকে নিয়ে গেলেন?

—হ্যাঁ কিন্তু খোকন টাকা নিল না।

—কেন?

—ও হরেনবাবুকে সোজাসুজি বললো, আমি কারুর দান নেব না; তবে যদি পারেন আমার স্কলারশিপের টাকাটা নিয়মিত পাবার ব্যবস্থা করুন।

—কী আশ্চর্য!

বিনয়দা মাথা নেড়ে বললেন, না একটুও আশ্চর্যের নয়; বরং ওর পক্ষে ওটাই স্বাভাবিক।

একটু থেমে বিনয়দা বললেন, ও এম বি বি এস-এ ব্রিলিয়ান্ট রেজাল্ট করল। স্কলারশিপও পেল। ওকে সবাই বললো, বিলেতে গিয়ে এফ আর সি এস পড়ো কিন্তু আমি আর ওকে পড়তে দিলাম না।

—কেন?

—আর কতকাল ওরা চারজনে স্ট্রাগল করবে? আমি বললাম আর নয়,

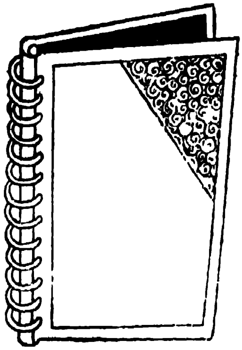
এবার আর্মিতে চাকরি নাও।

আমি প্রবীণ বা বিবেচক না হয়েও বললাম, ঠিক করেছেন।

বিনয়দার মুখখানা হঠাৎ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। বলেন, খোকন যে শুধু ওর মা আর ভাইবোনকে সুখী করেছে তাই নয়, আমাকেও ও বাঁচিয়ে দিয়েছে। উনি আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, এই প্রেসের আয় দিয়ে দু-বেলা ডাল-ভাতের সংস্থান করাই কষ্টকর। খোকন না থাকলে বোধহয় মেয়েটার বিয়েই হতো না।

এসব বহুদিন আগেকার কথা। তারপর কত কি ঘটে গেছে। পঁয়ষট্টির যুদ্ধের সময় আম্বালা ক্যাণ্টনমেণ্টে হঠাৎ এক কর্ণেলের সঙ্গে আলাপ। কথায় কথায় জানলাম, ইনিই সেই খোকন।

কর্ণেলের সঙ্গে অনেক কথা, অনেক গল্প হলো। সব শেষে উনি বললেন, কত কী ঘটে গেল কিন্তু তবুও কিছুতেই ভুলতে পারি না আমার বাবার মৃত্যুর জন্য আমিই দায়ী।



হাতে খুব অল্প সময় ছিল। চিৎকার করে চলন্ত ট্যাক্সি থামিয়েই ড্রাইভারকে বললাম, ভাই, পনের মিনিটও সময় নেই। আমাকে কলেজ স্ট্রীট পৌঁছে দিতে হবে। বললাম বটে, কিন্তু মনে মনে সন্দেহ ছিল। টালিগঞ্জ টেকনিসিয়ান্স স্টুডিও থেকে কলেজ স্ট্রীট, দূরত্ব নেহাৎ কম নয়। তাছাড়া এ তো দিল্লী-বোম্বে নয়, কলকাতার রাস্তা।

ড্রাইভার বললেন, বসুন।

হ্যাঁ, অসম্ভবকে সম্ভব করলেন উনি; ঠিক সময়েই কলেজ স্ট্রীট পৌঁছলাম। পাঁচ-দশ মিনিটের কাজ ছিল। ড্রাইভারকে অনুরোধ করতেই উনি অপেক্ষা করতে রাজী হলেন। ঐ ট্যাক্সিতেই ঘুরে আরো দু' জায়গায় কাজ শেষ করতেই প্রায় তিনটে বাজল। বেশ ক্ষিদে পেয়েছিল। তাই বললাম, চলুন, পার্ক স্ট্রীট।

পার্ক স্ট্রীটের রেস্তোরাঁর সামনে ট্যাক্সি থামতেই আমি ড্রাইভারকে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি খেয়েছেন?

—না; আমি পরে খাব।

—পরে কেন? আসুন, একসঙ্গেই খেয়ে নিই।

উনি অনেকবার আপত্তি করলেও শেষ পর্যন্ত আমার অনুরোধে ট্যাক্সি লক্ করে আমার সঙ্গে রেস্তোরাঁর ভেতরে ঢুকলেন। বেশ দ্বিধা-সংকোচ নিয়েই উনি আমার সামনের চেয়ারে বসলেন।

তারপর খেতে খেতেই উনি আমাকে প্রশ্ন করলেন, আপনি কী কলকাতাতেই থাকেন ?

—না, আমি দিল্লী থাকি।

—আগে তো কলকাতাতেই থাকতেন ?

—হ্যাঁ।

ত্ব'এক মিনিট পরে উনি আবার আমাকে প্রশ্ন করলেন, আপনি কী রিপন স্কুলে পড়তেন ?

—হ্যাঁ।

এবার ওর মুখে সামান্য একটু হাসি? বললেন, আমি বোধহয় আপনার সঙ্গেই পড়তাম। একসঙ্গে খেলাধূলাও করতাম।

আমি চমকে উঠি। এক মুহূর্তে অনেকগুলো বছর পিছনে চলে যাই। মনে করি, স্কুলের কথা, মাস্টারমশাইদের কথা, বন্ধুদের কথা। বার বার চেয়ে দেখি আমার সামনে বসা ময়লা জামা-কাপড় পরা ট্যাক্সি ড্রাইভারকে। তারপর হঠাৎ একটু জোরেই বলি, তুই মাণিক ?

ও এক গাল হাসি হেসে বললো, হ্যাঁ।

সঙ্গে সঙ্গে আমার আবো অনেক কিছু মনে হলো।

পশ্চিম বাংলা বা পূর্ব বাংলার গ্রাম-গঞ্জের সঙ্গে যাদের পরিচয় আছে, তারা জানেন কিছু কিছু গামের কিছু কিছু পরিবারের বিশেষ খ্যাতি আছে। হয়ত মুন্সীডাঙ্গার মিত্তির, রাঙামাটির চৌধুরী, কেষ্টপুরের চক্রবর্তী, নহাটার বাঁড়ুজ্যে বাড়ির লোক বললেই ওসব অঞ্চলের সবাই চেনে। সম্মানও করে। কলকাতাতেও এমন কিছু পরিবার আছে হাটখোলার দত্ত বা চোরবাগানের মিত্তিদের বাড়ি বললেই একটা ঐতিহ্য আভিজাত্যপূর্ণ পরিবারের ছবি চোখের সামনে ফুটে ওঠে। মাণিকও ঠিক এইরকম এক বনেদী বাড়ির ছেলে।

আমার বেশ মনে আছে, মাণিক ঘোড়ার গাড়ি চড়ে স্কুলে আসত। টিফিনের সময় ত্বধ-সন্দেশ আনত দারোয়ান। তখন ত্বর্গাপূজা দেখতে যেতাম ওদের মত কিছু বনেদী বড়লোকের বাড়ি।

মাণিকদের বাড়ির কথা ভাবলে এখনও আমার অবাক লাগে। প্রথমদিন তো ঢুকতেই ভয় করছিল। ঠিক রাজামহারাজাদের প্রাসাদের মত বিরাট বিরাট থামওয়ালা বাড়ি। ত্বটো লোহার গেটে ত্ব'জন পাগড়ীওয়ালা দারোয়ান। বাড়ির সামনে ত্ব'-তিনটে মোটর গাড়ি-ঘোড়ার গাড়ি।

সিঁড়ি ভেঙে বিরাট চওড়া বারান্দা পার হয়ে সামনের ঘরে ঢুকে আমি প্রায় বোবা। এত বড় ঘর হয়। যে অ্যালবার্ট হলে আমাদের স্কুলের প্রাইজ দেওয়া হয়, এ বোধহয় তার চাইতেও বড়। সামনে কুইন ভিক্টোরিয়া আর লর্ড কার্জনের বিরাট দুটো পেন্টিং। কী বিরাট শ্বেত পাথরের টেবিল! হা ভগবান! এত বড় আয়না হয়?

আমার শৈশবের সেই স্বপ্নভরা চোখ দিয়ে দেখা রাজবাড়ির ছেলে মাণিক এখন ট্যাক্সি চালায়? মনে মনেই হোঁচট খাই। তবু নিজেকে সামলে নিয়ে বলি, কতকাল পরে তোর সঙ্গে দেখা হলো!

— হ্যাঁ, বহুকাল পরে।

—তুই আমাকে চিনতে পারলি? আমি তো তোকে দেখে চিনতে পারি নি।

—প্রথমে একটু খট্‌কা লাগলেও ঠিক চিনতে পারি নি। তারপর কিছুক্ষণ তোকে নিয়ে ঘোরাঘুরির পর মনে হলো, নিশ্চয়ই তুই হবি।

—স্কুলের পুরনো বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হয়?

- কয়েকজনের সঙ্গে দেখা হয়।

—কার কার সঙ্গে দেখা হয়? ওরা কে কী করছে জানিস?

—প্রতাপ ডাক্তার হয়েছে, নিতাই প্রফেসারী করছে, দিব্যেন্দু মার্টিন বার্ণের অফিসার, দিবাকর ইণ্ডিয়ান অয়েলে আছে।

অনেকদিন পর বাল্যবন্ধুদের কথা শুনে আমার অজান্তেই আমার মুখে হাসি ফুটে ওঠে। জিজ্ঞাসা করি, ওরা কে কোথায় থাকে, তা জানিস?

— দু'-তিনজনের বাড়ি চিনি।

—একবার কলকাতা এসে ওদের সঙ্গে দেখা করতে হবে।

— আগের থেকে জানলে আমি ওদের খবর দিয়ে দেব।

খেতে খেতে আরো কত কথা হয়। ছোটবেলার স্মৃতি নিয়ে দুজনেই কত কথা বলি, কত কথা শুনি। তারপর আইসক্রীম খেতে খেতে জিজ্ঞাসা করি, তুই ট্যাক্সি চালাচ্ছিস কতদিন?

— বছর দশেক হয়ে গেল।

—তাই নাকি?

—হ্যাঁ।

—তোদের ফ্যামিলির তো অনেক ব্যবসা ছিল; তা তুই কেন ব্যবসা

করলি না ?

মাণিক একটু ম্লান হাসি হেসে বললো, আমাদের ফ্যামিলির কথা বাদ দে।

আমি অবাক হয়ে বলি, সেকি রে। তোদের মত ফ্যামিলি কলকাতায় ক'টা আছে ?

ও আবার একটু হাসে। বলে, আমাদের মত ফ্যামিলি যত কম থাকে তত ভাল।

আমি হেসে বললাম, বাড়ির সঙ্গে কী তোর রাগারাগি ? তুই তো সেই বাড়িতেই আছিস ?

মাণিক লুকিয়ে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললো, আজকাল আর কারুর উপরই রাগ করি না। যেমন কপাল করে জন্মেছি, তার ফল তো ভোগ করতেই হবে।

ওর কথাগুলো শুনেই বুঝতে পারি, মাণিকের জীবনে কোথাও ছন্দপতন ঘটেছে। মনে মনে একটু আহত হই, বেদনাবোধ করি। দু'-এক মিনিট পরে জিজ্ঞাসা করলাম, তুই তোদের সেই বাড়িতেই থাকিস তো ?

—হ্যাঁ, থাকি ; তবে না থাকতে পারলেই ভাল হতো।

মুখ ফস্‌কে বেরিয়ে পড়ে, কেন ?

মাণিক এবার হেসে আমার দিকে তাকায়। বলে, বনেদী বাড়ির কেচ্ছাগুলোও বেশ বনেদী। ও মুহূর্তের জন্য কোথায় যেন তলিয়ে যায়। তারপর মুখ নীচু করে বলে, মেয়েটা আর একটু বড় হলেই কোথাও চলে যাব।

বুঝলাম, আর প্রশ্ন করা ঠিক নয়। এবার কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরিয়ে আসবে।

মাণিককে ছাড়লাম না। ওর ট্যাক্সিতেই বিকেল-সন্ধ্যা ঘুরলাম। তবে পেছনে বসে নয়, পাশে বসে। কাজকর্ম সেরে হোটেলে ফেরার পথে ল্যান্সডাউন-হাজরার কাছাকাছি একটা ছেলে আর মেয়ে হাত দেখাতেই বললাম, ওদের তুলে নে।

—তুই যে আছিস !

—তাতে কী হ'ল ? আমি তো তোর সাগ্‌রেদ।

মাণিক হেসে ট্যাক্সি থামায়। জিজ্ঞাসা করে, কোথায় যাবেন ?

ছেলেটি বলল, এসপ্ল্যানেড।

মাণিক কিছু বলার আগেই আমি বললাম, তুলে নে।

মাণিক মিটার ঘুরিয়ে আবার ডাউন করতেই ওঁরা দু'জনে পেছনে উঠলেন। একটু নিবিড়, ঘনিষ্ঠ হয়েই বসলেন। কথাবার্তা শুনে মনে হ'ল, দুজনের চোখেই স্বপ্ন। মিলনের পথে বাধাবিঘ্ন প্রায় অসহ্য হয়ে উঠেছে।

ওরা মেট্রোর সামনে নামতেই আমি মাণিককে বললাম, ট্যাক্সি চালাতে চালাতে অনেক রসের খোরাক হয়ে যায়।

—ওসব আর আজকাল শুনি না।

—কেন? শুনতে শুনতে পুরনো হয়ে গেছে?

—না, তা না; মেয়েদের ব্যাপারে আমার আর কোন আগ্রহ নেই। মাণিক স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে আমার হোটেলের দিকে ট্যাক্সি চালায়।

ওর কথা শুনে আমি হেসে বলি, এই বয়সেই বৈরাগ্য?

—না, বৈরাগ্য না, বিতৃষ্ণা।

—বিতৃষ্ণা?

—হ্যাঁ, বিতৃষ্ণা। মাণিক ট্যাক্সি চালাতে চালাতেই বলল, মেয়েদের দেখলেই আমার ঘেন্না হয়।

আমি চুপ করে থাকি। ইতিমধ্যে ট্যাক্সি আমার হোটেলের পাশে পৌঁছয়। আমি বললাম, গাড়ি এখানে থাক। চল আমার ঘরে।

—তোর কাজের ক্ষতি হবে না?

আমি হেসে বললাম, কাল চলে যাব বলে আজ তো ঘুরে ঘুরে সব কাজ শেষ করলাম।

—কালই চলে যাবি?

—হ্যাঁ।

—তাহলে চল।

ঘরে গিয়েই আমি হাত-মুখ ধুয়ে জামা-কাপড় বদলে নিলাম। মাণিকও হাত-মুখ ধুয়ে নিল। তারপর চা খেতে খেতে শুরু হ'ল আবার আমাদের গল্প। দিল্লীর গল্প, কলকাতার হোটেল-রেস্তোরাঁর গল্প, ট্যাক্সির নানা রকমের যাত্রীর কথা, ট্যাক্সির ব্যবসা নিয়ে আলোচনা। আরো কত কি। কথায় কথায় পারিবারিক প্রসঙ্গ এসে পড়ল। বললাম, তুই একবার তোর স্ত্রী আর মেয়েকে নিয়ে দিল্লী আয়।

মাণিকের ঠোঁটের কোণায় বিদ্রূপের হাসি উঁকি দেয়। বলে, আমার স্ত্রী যথেষ্ট সখ-আনন্দ করে বেড়ায়। তাকে নিয়ে দিল্লী যাবার দরকার নেই। যদি

পারি মেয়েটাকে নিয়ে একবার ঘুরে আসব।

আমি এবার ওকে চেপে ধরলাম। তোর কী ব্যাপার বলতো? সারাদিন ধরে তোর কাছে বেসুরো কথা শুনছি।

ও হেসে বলল, জীবনটাই যে বেসুরো হয়ে গেছে।

– কিন্তু কেন? তোদের মান-মর্যাদা-অর্থের অভাব নেই। নিশ্চয়ই বনেদী বাড়ির সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে বিয়ে হয়েছে……

—ব্যস-! ব্যস! চুপ কর। বনেদী বাড়ির গুণকীর্তন শুনলে আজকাল গা জ্বলে যায়।

—কিন্তু কেন?

হঠাৎ মাণিক আমার হাত চেপে ধরে বলল, শুনবি? তাহলে শোন।

পিঠে বালিশ দিয়ে বিছানার উপর ভাল করে বসে ও শুরু করল, কলকাতার অন্যান্য বনেদী বাড়ির কথা বলতে পারি না, তবে আমাদের বাড়ির পয়সা-কড়ি, মান-মর্যাদা সবকিছুই ইংরেজদের কৃপায়। আমাদের বাড়ির সব ইতিহাস আমি জানি না; যেটুকু জানি তা বলতে গেলেও ভোর হয়ে যাবে।

আমি মাথা নেড়ে বলি, তা তো হবেই।

—তবে জেনে রাখ, আমাদের বাড়িতে বহুকাল ধরে দুর্গাপূজা হচ্ছে। পূজার সময় বাড়িতে বড় বড় সাহেবদেরও নেমন্তন্ন করা হতো। ওদের খুশি করার জন্য বাঈজীর নাচ তো হতোই কিন্তু কখনও কখনও বাড়ির সুন্দরী মেয়ে-বউকেও ভেট দেওয়া হতো।

—সত্যি?

মাণিক হেসে বলল, বাইরের লোক জানে কিনা বলতে পারি না, তবে আমাদের বাড়ির সবাই জানে, আমাদের বাড়ির এক সুন্দরী বউ লর্ড কার্জনের পার্ট-টাইম রক্ষিতা ছিলেন।……

আমি আবার বলি, সত্যি?

—একশোবার সত্যি। মাণিক একটু হেসে বলে, আমাদের বাড়ির তিন-তলার বারান্দায় আমাদের পূর্বপুরুষদের পেন্টিং ঝোলান আছে। তার মধ্যে কার্জনের ছেলেকে বেছে নিতে তোর একটুও কষ্ট হবে না।

আমি আর প্রশ্ন করতে পারি না। অবাক হয়ে ওর দিকে তাকিয়ে থাকি।

মাণিক আবার হাসে। আবার বলে, কার্জন সাহেব আমাদের বাড়ির ঐ বউকে নিয়ে ফূর্তি করবেন বলে নিজের টাকায় একটা বিরাট বাগানবাড়ি তৈরি

করে আমাদের পরিবারকে দান করেন। তাছাড়া আমাদের বাড়ির দুর্গাপূজায় যে সোনার বাসন-কোসন ব্যবহার হয় তাও কার্জন দিয়েছিলেন।

আমি না হেসে পারি না।

—হাসছিস কি রে! বনেদী বাড়ির কেলেঙ্কারীগুলোও বনেদী।

—তাই তো শুনছি।

হঠাৎ মাণিক গম্ভীর হয়ে বলল, যখন বয়স অল্প ছিল, তখন বুঝতাম না, জানতাম না, কিন্তু বড় হবার পর জানলাম, বুঝলাম, এ বাড়ির অনেক ভাসুরই ছোট ভাইয়ের স্ত্রীকে কোলের কাছে না নিয়ে ঘুমুতে পারেন না; অনেক গিন্নীও আত্মীয়-স্বজন বা কর্মচারীদের কাছে নিজেদের নিত্য বিলিয়ে দেন।

—কী বলছিস?

—ঠিকই বলছি।

—বাড়ির মধ্যেই এসব কেলেঙ্কারী হয় কেমন করে?

মাণিক হেসে বলল, শুধু আমাদের বসত বাড়িটাই সাড়ে পাঁচ বিঘে জমির উপর। শুনেছি, ছোটবড মিলিয়ে প্রায় শ' দেড়েক ঘর আছে। এ ছাড়া আছে কর্মচারীদের ঘর।......

শুনেই আমার চোখ ছানাবড়া হয়।

ও বলে যায়, সুতরাং এ বাড়ির এদিক থেকে ওদিক গিয়ে কিছু করলে স্বয়ং ভগবানের পক্ষেও জানা সম্ভব না। একটা মজাব ঘটনা শুনবি?

—কী?

—এইত বছর দশেক আগেকার কথা বলছি। আমাদের এক দূর সম্পর্কের দাদুকে হঠাৎ এক সিঁড়ির কোণায় মরা অবস্থায় দেখা গেল। ডাক্তার এসে বলল, অন্তত ছত্রিশ ঘণ্টা আগে মারা গেছেন।

শুনেও আমার হাসি পায়। হাসি থামিয়ে বলি, ওসব যাক্ গে। তুই এমন হতাশ হয়ে পড়েছিস কেন?

—হ'ব না? যার স্ত্রী স্বামী আর মেয়েকে উপেক্ষা করে বাড়ির জামাইয়ের সঙ্গে রাত কাটায়, স্ফূর্তি করে, সে হতাশ হবে না?

—কী পাগলের মত আজেবাজে কথা বলছিস?

মাণিক একটু ম্লান হেসে আমার হাতের উপর একটা হাত রেখে বলল, কিছু আজেবাজে বলছি না।

—তোর স্ত্রী কি খুব সুন্দরী?

ও আবার হাসে। বলে, শুধু সুন্দরী না, ওর চেহারায় এমন কিছু আছে, যা দেখলে বোধহয় সব পুরুষমানুষেরই ভাল লাগবে।

— তোর বোধহয় সন্দেহ বাতিক আছে, তাই না?

ও মাথা নেড়ে বলল, না।

—কিন্তু. .

মাণিক খুব জোরে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, তুই বোধহয় জানিস ছোটবেলা থেকেই মোটর গাড়ির প্রতি আমার দারুণ দুর্বলতা। তাই সিটি কলেজ থেকে বি-এস-সি পাশ করার পরই একটা ছোট্ট অটোমোবাইল ওয়ার্কশপ চালু করলাম। বাড়ির সবার খুব আপত্তি ছিল······

— কেন?

—কেন আবার? এমন বনেদী বাড়ির ছেলে মিস্ত্রীগিরি করবে?

শুনে আমি হাসি।

ও আমার হাসি দেখে যেন ক্ষেপে ওঠে। বলে, চোদ্দপুরুষে তো কেউ কখনও খেটেখুটে আয় করে নি! শুধু দালালি আর মোসাহেবী করেই এত বিষয়-সম্পত্তি হয়েছে।······

—এখনও তাই? ওর কথার মাঝখানে আমি জানতে চাই।

—এখন দু'-চারজন কোট-প্যাণ্ট পরে কোর্ট-কাছারিতে বেরুচ্ছে, কিন্তু কেউই পাঁচ-সাতশোর বেশি আয় করে না।

—আর সব?

—গোটা দশেক বস্তি আর খান-তিরিশেক ভাড়া বাড়ির আয় ছাড়াও ঐ সামান্য একটা কারখানার আয় আছে। তাছাড়া সবাই লুকিয়ে-চুরিয়ে কিছু না কিছু বিক্রী করছেই।

— আচ্ছা তোর কথাই বল।

— হ্যাঁ, বছর চার-পাঁচের মধ্যেই ব্যবসাটা দারুণ জমে গেল। হেসে-খেলেও মাসে মাসে তিন-চার হাজার টাকা আয় হয়। ঠিক এই সময় আমার বিয়ে হ'ল কলকাতার আরেক বনেদী বাড়ির এক সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে।

—তারপর?

—বছর পাঁচেক বেশ কেটে গেল; অন্তত আমি কিছু জানতে পারি নি। তারপর আমার বাবা-মা আমার স্ত্রী আর মেয়েকে নিয়ে কিছুদিনের জন্য মধুপুর গেলেন।

—তোদের তো মধুপুরে বাড়ি আছে, তাই না?

—হ্যাঁ, তিনখানা।

—তারপর?

—ওরা চলে যাবার দিন দশেক পরে দ্বারভাঙ্গার মহারাজার এক ভগ্নীপতির একটা ফোর্ড-ফ্যালকন খুব সস্তায় পেয়ে গেলাম। গাড়িটা ডেলিভারী নিতে গেলাম পাটনায়। ভেবেছিলাম, ঐ গাড়ি নিয়ে কলকাতায় ফেরার পথে দু'তিন দিন মধুপুরে থেকে সবাইকে খুব ঘোরাব।

আমি ডিটেকটিভ কাহিনী শোনার মত অবাক বিস্ময়ে মাণিকের মুখের দিকে চেয়ে আছি।

ও বলে যায়, পাটনা থেকে রওনা হতে বড্ড দেরী হয়ে গেল। তাছাড়া পথে একটা চাকা পাংচার হ'ল। তাই মধুপুরে যখন পৌঁছলাম, তখন রাত প্রায় বারোটা। বাড়ির গেটের সামনে পৌঁছেই অবাক হলাম।

—কেন?

—দেখি, আমাদের বাড়ির ভেতরে আমার ভগ্নীপতির গাড়ি। কলকাতায় শুনেছিলাম, ও একটা মামলা-মোকদ্দমার কাজে পাটনা গেছে।······

— তা গাড়ি নিয়ে কেন?

—আমার এই ভগ্নীপতিও গাড়ি চালাতে খুব ভালবাসে। তাই কটক বা পাটনা হাইকোর্টে কাজ থাকলে অনেক সময়ই গাড়ি নিয়ে বেরোয়। যাই হোক, ওর গাড়ি দেখে ভাবলাম বোধহয় পাটনার কাজ সেরে কলকাতা ফেরার পথে মধুপুরে এক রাত কাটাচ্ছে!······

—সেটাই স্বাভাবিক।

—ভাবলাম, ভালই হ'ল। বেশ জমবে। সবাইকে চমকে দেব বলে আমি গাড়ি গেটের বাইরে রেখে বাড়ির মধ্যে ঢুকলাম। তারপর নজর পড়ল, পশ্চিম দিকের একটা ঘরের জানলা দিয়ে আলো দেখা যাচ্ছে। বাগানের ভেতর দিয়ে আস্তে আস্তে ঐ জানলার কাছে এগিয়ে গেলাম। একটু দাঁড়াতেই ভেতর থেকে মেয়ে-পুরুষের কথা শুনতে পেলাম।

মাণিক যেন হাঁপিয়ে যায়। থামে। একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, প্রথমে ভেবেছিলাম, বাবা-মা কথা বলছেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনে হল, ওঁরা তো এ ঘরে থাকেন না। তবে কী অলক আর মন্দিরা?

—তোর স্ত্রীর নাম বুঝি মন্দিরা?

—হ্যাঁ।

—নামটি ভারী সুন্দর।

—ওর সবকিছুই সুন্দর; শুধু চরিত্রটাই খারাপ।

আমি মন্তব্য না করে জিজ্ঞেস করি, অলক নিশ্চয়ই তোর ভগ্নীপতি?

—হ্যাঁ। মাণিক একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, শেষে কী দেখলাম জানিস?

আমি মুখে কিছু বলি না। শুধু ওর মুখের দিকে অপলক-দৃষ্টিতে চেয়ে থাকি।

— দেখলাম, ওরা দু'জনে স্বামী-স্ত্রীর মত শুয়ে আছে।

শুনেই আমার মুখের চেহারা বদলে যায়। মুখে কোন কথাও আসে না।

—হাতে রিভলবার থাকলে ওদের দু'জনকেই খতম করে দিতাম, কিন্তু লজ্জায়-ঘেন্নায়, রাগে-দুঃখে সঙ্গে সঙ্গে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলাম।

—চলে এলি?

—হ্যাঁ। সারা রাত গাড়ি চালিয়ে পরের দিন সকালে কলকাতা পৌঁছলাম।

—তারপর কী করলি?

—কিছুই করলাম না।

—কেন?

—কয়েক মাস পরে বুঝতে পারলাম, বাবা-মা সবকিছু জেনেও চুপ করে আছেন……

—কী বলছিস তুই?

—যা বলছি, ঠিকই বলছি। এসব কেলেঙ্কারীর কথা বলতেও ঘেন্না হয়, কিন্তু দু'-একজনকে না বললেও তো বাঁচা যায় না।

—কিন্তু ওরা এত বড় একটা কেলেঙ্কারীর কথা জেনেও চুপ করে থাকবেন কেন?

মাণিক হেসে বলল, কারণ আছে। অলক শুধু বনেদী ঘরের ছেলে না, বেশ ধনীও। তাছাড়া ব্যারিস্টার ও বাংলাদেশের একজন বিখ্যাত পলিটিসিয়ান। পার্লামেন্টের ইলেকশনে জিতেছে, রোজ খবরের কাগজে নাম ছাপা হয়। সেন্ট্রাল মিনিস্টার হতে হতেও হ'ল না।

—তোর বোন জানে?

—শুধু বোন কেন, ওদের স্ফূর্তির খবর এখন আমাদের বাড়ির ঝি-চাকর থেকে শুরু করে সব আত্মীয়-স্বজনও জানে।

—তোর বোন কোন প্রতিবাদ করে না?

—করবে কোন মুখে? বিয়ের আগে কী ও কম কেলেঙ্কারী করেছে? হঠাৎ মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, এখন কী অবস্থা?

—ওদের স্ফূর্তি ঠিকই চলছে; তবে আমার সঙ্গে মন্দিরার কোন সম্পর্ক নেই।

- এক বাড়িতেই তো থাকিস?

আমি সামনের দিকের এক কোণার একটা ছোট্ট ঘরে থাকি। ভোরবেলায় উঠে পেট্রোল পাম্প থেকে গাড়ি এনে মেয়েটাকে স্কুলে পৌঁছে দিয়েই বেরিয়ে পড়ি; ফিরি অনেক রাত্রে। বাড়ির ভেতরে কি হয় না হয়, তার খবরও রাখি না।

—তোর ওয়ার্কশপের কী খবর?

—বেচে দিয়েছি।

- কেন?

—কী হবে অত টাকা রোজগার করে? শেষে আমার যদি মাথা ঘুরে যায়? আমি যে মদ আর মেয়েছেলের খপ্পরে পড়ব না, তা কে বলতে পারে?

—হুঁ! সবাই কী ওরকম হয়?

—হয় না ঠিকই, কিন্তু আমি যে কলকাতার বনেদী বাড়ির ছেলে! আমার রক্তেও যে লর্ড কার্জনের কোন সহকর্মী বা বন্ধুর ছিটেফোঁটা প্রসাদ নেই, তা কে বলতে পারে?

মাণিকের মুখখানা দেখে বেদনায় আমার মন কাণায় কাণায় ভরে ওঠে।

ও আবার বলে, ওয়ার্কশপ বেচে এই ট্যাক্সি কিনেছি আর মেয়ের নামে ব্যাংকে পঞ্চাশ হাজার টাকা রেখে দিয়েছি। একটা ভদ্র-সভ্য ছেলের সঙ্গে ওর বিয়ে দিতে পারলে আমার ছুটি।

—কিচ্ছু ভাবিস না। সব ঠিক হয়ে যাবে।

হঠাৎ মাণিকের দুটো চোখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। বলে, বিশ্বাস কর ভাই, আমার মেয়েটা খুব ভাল। আমাকে যে ও কি ভালবাসে তা বলে বোঝাতে পারব না।

—তাই নাকি?

—হ্যাঁ ভাই। ও আর একটু বড় হলেই আমি ওকে নিয়ে কোথাও চলে যাব।

—কেন?

—এই পরিবেশে ও থাকতে পারবে না; আমিও রাখব না।

কথায় কথায় অনেক রাত হয়েছিল ; তবু না খেয়ে ওকে যেতে দিলাম না। যাবার সময় ওর সার্টের বুক পকেটে একটা একশো টাকার নোট গুঁজে দিতেই মাণিক সঙ্গে সঙ্গে নোটটা হাতে নিয়ে বলল, এ কী ?

— সারাদিন ট্যাক্সি চড়লাম না ?

—তাতে কী হ'ল ?

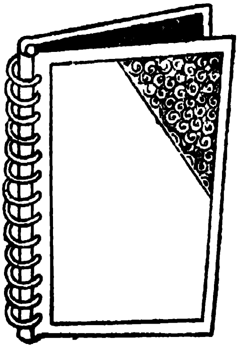
— ট্যাক্সি কী জলে চলে ?

মাণিক নোটটা আমার হাতে দিয়ে বলল, পাঁচ-সাত লিটার তেলই শুধু খরচ হয়েছে। আর কিছু তো হয়নি। তুই বরং মনে মনে আমার মেয়েটাকে আশীর্বাদ কর, ও যেন সুখী হয়।

—নিশ্চয়ই ! তোর মেয়ে তো আমারও মেয়ে।

—ব্যস ! ব্যস ! আর কিছু চাই না।

মাণিক ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেল। আমি ওকে লিফ্‌ট পর্যন্তও এগিয়ে দিতে পারলাম না। ওখানেই স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে রইলাম।



ডাক্তার

ডাক্তার আমার চাইতে বয়সে বড় হলেও বন্ধু। বেশ ঘনিষ্ঠ বন্ধু। দিল্লীতে এলেই ডাক্তার আমাকে ফোন করবে। আমার শত কাজ থাকলেও আমাকে ছুটে যেতে হবে ইন্দ্রপ্রস্থ এস্টেটের ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল এসোসিয়েশনের উপর তলার ঘরে। সকাল, দুপুর, সন্ধ্যে, রাত্তির। সময়ের কোন ঠিক নেই। ডাক্তার এ ব্যাপারে প্রায় নাদির শা। হুকুম অমান্য করা চলবে না। একদিন, দু'দিন, তিন দিন। ডাক্তার যে ক'দিন দিল্লী থাকবে সে ক'দিনই আমাকে ডিউটি দিতে হবে। এর অন্যথা ও বরদাস্ত করে না ; আমিও ভাবতে পারি না।

আমি কলকাতা এলে ঠিক এর বিপরীতটা হয় না। হওয়া সম্ভব নয়। আমি দু'চার দিনের জন্য আসি নানা কাজকর্ম নিয়ে। ডাক্তারও ব্যস্ত থাকে তার রুগীদের নিয়ে। সকাল থেকে রাত্তির পর্যন্তই ডাক্তার ব্যস্ত। মাঝ রাতেও নিস্তার নেই। হঠাৎ কোন রুগীর বুকে ব্যথাটা বাড়লেই হুড়মুড় করে উঠে নিজেই গাড়ি চালিয়ে ছুটবে। আমার ডাক্তার যে কার্ডিওলজিষ্ট ! হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ। তবুও আমার আর ডাক্তারের আড্ডা হবেই। কখনও ওর চেম্বারে, কখনও বা কোন ক্লাবে ও হোটেলে। সৌভাগ্যক্রমে হাতে খুব সিরিয়াস রুগী না থাকলে ডাক্তার নিজেই ফিয়াট নিয়ে বেরুবে। তারপর আমাকে নিয়ে চলে যাবে কোথাও। দীঘা, শান্তিনিকেতন, ডায়মণ্ডহারবার বা ঝাড়গ্রামের ওদিকে। একদিন দেড়দিন প্রাণ ভরে আড্ডা দিয়ে আমরা আবার কলকাতা ফিরে আসি।

এই আড্ডার ব্যাপারে আমার আর ডাক্তারের মধ্যে এক অলিখিত চুক্তি

আছে। আমি ওর কাছে অসুখ বিসুখের ব্যাপারে কিছু জানতে চাই না; ডাক্তারও আমার সঙ্গে রাজনীতিবিদ নিয়ে আলোচনা করবে না। এ ছাড়া বিশ্ব সংসারের যাবতীয় সব সৎ ও অসৎ ব্যাপার নিয়ে আলোচনা হয় আমাদের। তবে ডাক্তারের প্রেমের কাহিনী শুনতেই আমার সব চাইতে ভাল লাগে। এ ব্যাপারে ডাক্তারের ঔদার্য সীমাহীন। ডাক্তার হাসতে হাসতে বলে, সেকালে ভাল ভাল কবি ছিলেন বলে অর্জুনের প্রেম কাহিনী নিয়ে কত ভাল ভাল কাব্য রচনা হয়েছে। একালে যদি তেমন ভাল কবি থাকতেন তাহলে আমাকে নিয়েও অমন অনেক কাব্য রচনা হতে পারতো।

আমি হাসি।

ডাক্তার এক চুমুক হুইস্কি খেয়ে বলে, না, না ভাই, হাসির কথা নয়। রবি ঠাকুর বা শরৎচন্দ্র বেঁচে থাকলেই দেখতে আমাকে নিয়ে কত কি লেখা হয়েছে।

সব যুগেই সব দেশের মানুষই প্রেম করেছে। ভবিষ্যতেও করবে কিন্তু ভারতবর্ষে প্রেম করা যেন মহাপাপ। এ মহাপাপ সবাই করে, সবাই লুকোয়। ডাক্তার সত্যি ব্যতিক্রম। ভাল ছাত্র বলে ডাক্তারের খ্যাতি ছিল মেডিক্যাল কলেজে। এডিনবরা থেকে এম. আর. সি. পি. পাশ করেছে প্রায় অনায়াসে। তারপর এক অস্ট্রীয়ান যুবতীর মোহ ডাক্তারকে টেনে নিয়ে যায় ভিয়েনায়। কিছুদিন এই সুন্দরীকে নিয়ে দানিয়ুব খাল, ওপেরা হাউস, নাইট ক্লাব স্পেলন্‌ডিড, ফার্স্ট ডিষ্ট্রিক্টের অলিগলিতে ঘোরাঘুরি করতে করতেই ডাক্তার আরো একটা পরীক্ষা দেয়। আশ্চর্য ব্যাপার! পাশও করল। সেদিন ডাক্তার ঐ মেয়েটিকে নিয়ে ইভ'এ নেচেছিল সারা রাত।

মেডিক্যাল কলেজে পড়ার সময়ও ডাক্তারের জীবনে একাধিক মেয়ে এসেছে। সহপাঠিনী নীলিমা, ফাইন্যাল ইয়ারের জয়া, নার্স কৃষ্ণা ছাড়াও কিছুকালের জন্য ডাঃ মৈত্রের স্ত্রীর সঙ্গেও বড় বেশি জড়িয়ে পড়েছিল। বিলেত থেকে ফিরে আসার কয়েক মাসের মধ্যেই ডাক্তার বিয়ে করে অপরূপাকে। অপরূপা সত্যি অপরূপা। রূপে, গুণে। অপরূপাকে বিয়ের পিছনেও একটু কাহিনী আছে।

ডাক্তার সবে বিলেত থেকে ফিরেছে। বিশেষ কেউই চেনে না। কিছু পুরনো বন্ধু-বান্ধব ছাড়া আর কেউই নাম জানে না। রুগী আসে কম। 'কল' আসে আরো কম। তবে হ্যাঁ, রুগী এলে ডাক্তার জানপ্রাণ লড়িয়ে দেয় তাকে সুস্থ করার জন্য। যে বাড়িতে 'কল' পায়, ডাক্তার সেখানে বার বার যায় রুগী দেখতে। টাকা? না, না, ঐ একবারই নেয়, বার বার নয়। ডাক্তারের এই আগ্রহ,

সঠিক চিকিৎসা, হাসিখুশি মুখখানা আর অমায়িক ব্যবহার রুগীর বাড়ির সবাইকে মুগ্ধ করে। ডাক্তারের খ্যাতি ছড়ায়।

রাত তখন এগারটা। ডাক্তার শুয়েছে। হঠাৎ টেলিফোন পেয়েই ছুটল ল্যান্সডাউনে। মিঃ চৌধুরীর অবস্থা সত্যি সঙ্কটাপন্ন। ডাক্তার পর পর দুটো ইনজেকশন দিয়ে বার বার হার্ট আর পালস্ দেখে। ঘণ্টা খানেক পরে আবার ইনজেকশন। যুদ্ধ চলল সারা রাত। ভোরের দিকে ডাক্তার বাড়ির সবাইকে বললেন, মনে হয় এখন মিঃ চৌধুরী ঘুমুবেন। এখন আমি যাচ্ছি। যদি দরকার হয় সঙ্গে সঙ্গে ফোন করবেন।

--ফি ?

—না, না, এখন কিছু দিতে হবে না। আগে উনি সুস্থ হয়ে উঠুন। তারপর ওঁর হাত থেকেই আমি আমার ফি নেব।

ডাক্তারের কথা শুনে বাড়ির সবাই অবাক। এ ডাক্তার সত্যি বিচিত্র। রুগীদের চিন্তায় এর ঘুম হয় না, স্বস্তি পান না। যখন তখন রুগী দেখতে আসেন। প্রয়োজন মনে করলে বার বার আসেন, থাকেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা। দিনে, রাতে।

তারপর একদিন মিঃ চৌধুরী সম্পূর্ণ সুস্থ হলেন। নিজেই এলেন ডাক্তারের কাছে। বললেন, আপনি না হলে সত্যি আমি বাঁচতাম না। আপনার ঋণ কোনোদিনই শোধ দিতে পারব না। তবু বলুন, কত দেব।

ডাক্তার হেসে বলে, না, না, আপনাকে কিছু দিতে হবে না।

—তাই কি হয় ? আপনি বলুন, কী দেব ?

ডাক্তার মুখ নিচু করে একটু ভাবে।

মিসেস চৌধুরী স্বামীর পাশেই ছিলেন। উনি বললেন, এতদিন আমাদের বাড়িতে যাতায়াত করে তো বুঝতে পেরেছেন আমরা অত্যন্ত সাধারণ মধ্যবিত্ত। আপনাকে যা দেওয়া উচিত তা দেবার ক্ষমতা আমাদের নেই কিন্তু কিছু না দিলে তো আমরাও শান্তি পাব না।

ডাক্তার এবার হেসে বলেন, সত্যি কিছু দেবেন ?

ওঁরা স্বামী-স্ত্রী প্রায় এক সঙ্গেই বললেন, নিশ্চয়ই।

ডাক্তার দ্বিধা করে। বলে, কিন্তু যদি বেশি চেয়ে ফেলি তাহলে……

মিসেস চৌধুরী বললেন, আমরা জানি, আপনি এমন কিছু চাইবেন না যা আমরা দিতে পারবো না।

এবার ডাক্তার যেন একটু সাহস পায়। বলিষ্ঠ হয়। বলে, ইচ্ছা করলে

আপনারা দিতে পারবেন কিন্তু তা কি আমাকে দেবেন ?

স্বামী-স্ত্রী এবারও একসঙ্গে বলেন, নিশ্চয়ই দেব।

—তাহলে অপরূপাকেই দিন।

আনন্দে, খুশিতে মিঃ চৌধুরী দু'হাত দিয়ে ডাক্তারকে টেনে নিয়ে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরেই কেঁদে ফেলেন। কাঁদতে কাঁদতেই বলেন, তুমি যে আমার কি উপকার করলে বাবা, তা পরমেশ্বরই জানেন।

মিসেস চৌধুরী দু'হাত দিয়ে ডাক্তারের মুখখানা ধরে কপালে একটা চুমু খেয়ে বললেন, তোমাকে ধন্যবাদ জানিয়ে ছোট করব না। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, তোমার খ্যাতি-যশ সারা জগতে ছড়িয়ে পড়ুক।

ডাক্তার হুইস্কীর গেলাসে চুমুক দিয়ে বলে, এককালে বহু বড় বড় জমিদার সর্বস্বান্ত হয়েছে মদ আর রক্ষিতাদের কল্যাণে। বহু লোক সর্বস্বান্ত হয়েছে মামলা-মোকদ্দমা করে। কিন্তু আমাদের দেশে সব চাইতে বেশি লোকের সর্বনাশ হয়েছে রোগের জন্য।

আমি বলি, ঠিক বলেছ ডাক্তার।

ডাক্তার হেসে বলে, অন্যদের কথা আর কি বলব। আমার বাবা আর দিদির চিকিৎসা করতে গিয়েই মা পথে বসেন। ডাক্তার একটু থামে। তারপর বলে, তাই তো মা আমাকে অনেক দুঃখ-কষ্টের মধ্যেও ডাক্তারী পড়ান।

ডাক্তার অধিকাংশ সময়ই বর্তমানের কথা বলে। অতীতকে নিয়ে টানাটানির অভ্যাস বিশেষ নেই, কিন্তু আজ ডাক্তার শুধু ফেলে আসা দিনগুলোর কথাই বলছে।

ডাক্তার হাসতে হাসতে বলে, মেডিক্যাল কলেজে পড়ার সময় যেমন পড়াশুনা করেছি, তেমনি প্রেম করেছি। দুটোই করেছি প্রাণভরে। এমন একটা সময় এসেছিল যখন নীলিমা আর জয়ার মধ্যে টাগ-অব-ওয়ার শুরু হল আমাকে নিয়ে। ঠিক এই সময় রি-ইউনিয়নে আলাপ হল শিখাদির সঙ্গে।

—কে শিখাদি ?

—আরে, ডাঃ মৈত্রের স্ত্রী।

—তারপর ?

—তারপর মাকে জগন্নাথ দর্শন করাবার জন্য পুরীতে গিয়ে হঠাৎ শিখাদির সঙ্গে দেখা।

—আরে ডক, তুমি ?

—এখন তো সবে ফোর্থ ইয়ারের ছাত্র। কেন আর, ডক বলে লজ্জা দিচ্ছেন ?

—আজ যা হোক কাল তো পাশ করে ডাক্তার হবে।

—যদি ফেল করি ?

— ওসব কথা ছাড়ো। বেড়াতে এসেছ ?

—মা জগন্নাথ দর্শন করতে এসেছেন।

শিখাদি হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করেন, তুমি কাকে দর্শন করতে এসেছ ?

ডাক্তারের মুখ দিয়ে হঠাৎ বেরিয়ে যায়, আপনাকে।

আমি শুনেই হাসি। বলি, তারপর ?

ডাক্তারও হাসে। বলে, ডাঃ মৈত্র ওঁর ডাক্তার বন্ধুদের সঙ্গে বিয়ার খেতেন—ফ্ল্যাশ খেলতেন আর আমি শিখাদিকে নিয়ে পুরীর সমুদ্রে স্নান করতাম।

—আর ?

—শিখাদি আমাকে আর মাকে নিয়ে কোনার্ক গেলেন। মা একটু দেখেই বসে রইলেন। আমি আর শিখাদি খুব ঘুরলাম।

—তারপর ?

— কলকাতা ফেরার দু'এক সপ্তাহ পর ডাঃ মৈত্রের বাড়ি ফোন করলাম।······

শিখাদি অভিমানের স্বরে বলেন, তুমি তো অদ্ভুত ছেলে।

— কেন ?

—এতদিন পরে তুমি ফোন করছ ?

—কী করব বলুন। পড়াশুনা নিয়ে বড়ই ব্যস্ত ছিলাম। তাছাড়া হসপিট্যাল ডিউটিও এমন পড়েছে যে······

—আচ্ছা থাক। অত লেকচার না দিয়ে চলে এসো।

—এখন ?

—হ্যাঁ, এখন।

—আপনার ওখানে যাতায়াত করতে করতেই তো আমার হসপিট্যাল ডিউটি'র সময় হয়ে যাবে।

—সময় না থাকে ট্যাক্সিতে চলে এসো।

—ট্যাক্সি ! ট্যাক্সি চড়ার পয়সা কোথায় ?

— আচ্ছা, আচ্ছা, আমি ভাড়া দেব। তুমি চলে এসো।

ডাক্তার আবার এক চুমুক হুইস্কী খায়। বলে, ভাল ছাত্র, ভাল ডাক্তার বলে ডাঃ মৈত্রের সঙ্গে শিখাদির বিয়ে দেন ওর বাবা। হসপিট্যাল আর প্রাইভেট

প্রাকটিশ করে ডাঃ মৈত্র যেটুকু সময় পেতেন তা তাস খেলেই কাটিয়ে দিতেন। স্ত্রীর প্রতি কোন কর্তব্য করারই সময় ছিল না তাঁর।

আমি সিগারেট টানতে টানতে ডাক্তারের কথা শুনি।

ডাক্তার আবার এক চুমুক হুইস্কী খায়। আবার বলে, শিখাদি অত্যন্ত প্রাণবন্ত ছিলেন। তাই এই স্বামীর পাল্লায় পড়ে তিনি সত্যি পাগল হয়ে উঠেছিলেন। আমার সঙ্গে শিখাদির কোন দৈহিক সম্পর্ক ছিল না কিন্তু উনি আমাকে সত্যি ভালবাসতেন।

—তাই নাকি ?

—হ্যাঁ জার্নালিষ্ট ! শিখাদি আমাকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসতেন এবং ওরই তাগিদে আমি বামন হয়েও চাঁদে হাত দিতে সাহস করেছি।

—তার মানে ?

—শিখাদি অমন করে আমার পিছনে না লাগলে আমি সত্যি বিলেত যেতাম না। ডাক্তার একটু থেমে আমার দিকে তাকিয়ে একটু হাসে। তারপর বলে, আমার বিলেত যাবার জাহাজ ভাড়া শিখাদিই দিয়েছিলেন।

—আচ্ছা !

—হ্যাঁ জার্নালিষ্ট। কিন্তু বিলেত থেকে ফিরে এসে আর শিখাদিকে পেলাম না।

—কেন ?

—শিখাদি আত্মহত্যা করেছিলেন।

—কেন ?

—শিখাদি স্বামীর অবজ্ঞা অনেক সহ্য করেছিলেন কিন্তু যখন শুনলেন, অমন ভাবভোলা স্বামীরও আরেকটা সংসার আছে, তখন উনি সিদ্ধান্ত নিতে দেরি করেননি।

—সত্যি, কি দুঃখের কথা।

—কলকাতার অনেক ডাক্তারের কাছেই শিখাদির নামে অনেক কুৎসা নোংরামী শুনতে পাবে। অনেকে বলে, শিখাদি বছর দুই আমার সঙ্গেই সংসার করেছেন।

—এটা তো আমাদের জাতীয় চরিত্র।

—সে যাই হোক, শিখাদির কথা আমি কাউকে বলি না কিন্তু তোমাকে বলছি, ওর জন্য আমি এমন একটা শূন্যতা বোধ করতাম যা তোমাকে বোঝাতে পারব না।

—ঠিক বুঝতে না পারলেও আন্দাজ করতে পারি।

ডাক্তার একটু হেসে বলে, অপরূপাকে প্রথম দিন দেখেই আমি চমকে

—কেন ?

—অনেকটা শিখাদির মত দেখতে।

—তাই নাকি ?

—হ্যাঁ। তাইতো ওকে আমি বিয়ে করলাম।

—খুব ইণ্টারেষ্টিং তো !

—অপরূপাকে বিয়ে করার আরো একটা কারণ ছিল।

—কী ?

—প্রথম দিন অপরূপার বাবাকে দেখতে গিয়েই বুঝলাম, ওরা ধনী নয়। আরো দু'চারদিন যাবার পর বুঝলাম, মিঃ চৌধুরীর অসুখের খরচ চালাবাব মত অর্থের সংস্থান ওদের নেই। আমি ফি না নিলেও অন্য ব্যয় তো আছে।

—তা তো বটেই।

—তাই দেখলাম, অপরূপাকে যদি বিয়ে করি, তাহলে ঐ পরিবারের অনেক উপকার হবে।

শুনে আমার ভাল লাগে। বলি, ডাক্তার তোমাকে কি আমি এমনি এমনি ভালবাসি ?

ডাক্তার যেন আমার কথা শুনেও শোনে না। বলে, আমি অপরূপাকে ভরিয়ে দিয়েছি সবকিছু দিয়ে। ওর কোন ইচ্ছাই আমি অপূর্ণ রাখি নি কিন্তু ও আমাকে এমন দুঃখ দিয়েছে যে আজ আমি অপরূপার পাশে শুতেও ঘেন্না বোধ করি।

—কেন ? অবাক হয়ে আমি প্রশ্ন করি।

—দুর্ঘটনাই বলতে পারো কিন্তু এখন কলকাতার বাজারে আমার বেশ সুনাম। সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তার হেসে বলে, চরিত্রের ব্যাপারে নয়, ডাক্তার হিসেবে। তারপরই ডাক্তার গম্ভীর হয়। বলে, কিন্তু লোকে তো চরম বিপদে পড়েই আমাকে ডাকে।

—সে তো একশ' বার।

—তাই পেসেণ্টদের বাড়ির অবস্থা খারাপ দেখলেই আমার বাবার অসুখের সময়ের কথা মনে পড়ে যায়। আমি কিছুতেই ওদের কাছ থেকে টাকা নিতে পারি না।

আমি হেসে বলি, এই মন আছে বলেই তো তুমি এত বড় হয়েছ।

ডাক্তার একটু ম্লান হাসি হেসে বলে, একটা ঘটনা শোন। সেদিন শনিবার। রাত তখন গোটা নয়েক হবে। চেম্বারের রুগী দেখা শেষ করে দুটো একটা পেসেন্টের কিছু রিপোর্ট দেখছিলাম। হঠাৎ এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলেন—

—চিনতে পারছ বাবা?

চেহারা অনেক বদলে গেছে কিন্তু তবু ডাক্তার চিনতে পাবে, হ্যাঁ স্যার, চিনতে পারব না কেন?

—না বাবা, সব ছাত্র তো চিনতে পারে না। তাছাড়া তুমি এখন বিরাট ডাক্তার।

—ওকথা বলবেন না স্যার। আপনাদের পাঁচজনের আশীর্বাদে কিছু শিখেছি মাত্র। বলুন স্যার, কি ব্যাপার?

—বাবা, পাড়াব ডাক্তার বললেন, জামাইয়ের নাকি হার্ট এ্যাটাক হয়েছে।

—সে কি?

—হ্যাঁ বাবা। বৃদ্ধ কাঁদতে কাঁদতে বলেন, অন্য ডাক্তারের কাছে যাবার তো সাহস নেই, তাই তোমার কাছে ছুটে এলাম। তুমি যদি একটু দয়া ·····

—কী বলছেন আপনি? আমি এখুনি যাচ্ছি।

দু'এক মিনিটের মধ্যেই ডাক্তার মাষ্টার মশায়ের সঙ্গে গাড়িতে রওনা হয়।

গাড়ি মাষ্টার মশায়ের বাড়ির সামনে থামতেই ডাক্তার ড্রাইভারকে বলে, তুমি বাড়ি গিয়ে খাওয়া-দাওয়া করে এসো। আর অপরূপাকে বলে দিও, আমি এখানে আছি।

পেসাণ্টের ঘবে পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গেই ডাক্তার যুদ্ধ শুরু করে। পাড়ার ডাক্তার-বাবু ওকে সাহায্য করেন। ঘণ্টা তিনেক পরে যুদ্ধের প্রথম পর্ব শেষ হয়। ডাক্তার এবার একটু হেসে মাষ্টার মশায়ের মেয়েকে বলে, দিদি, এবার এক কাপ চা খাব।

—এখুনি দিচ্ছি ডাক্তারবাবু।

—ডাক্তারবাবু না, আমি তোমার দাদা। বাবার ছাত্র দাদাই হয়, তাই না?

ডাক্তারের কথা শুনেই এই দুর্যোগের মধ্যেও আনন্দে মাষ্টার মশায়ের মেয়ের চোখে জল আসে।

চা খেতে খেতেই পাড়ার ডাক্তারবাবু কিছু নির্দেশ দেন। পাড়ার ডাক্তারবাবু

চলে যাবার পর ডাক্তার মাষ্টার মশাইকে প্রেসক্রিপসন দিয়ে বলেন, শুধু এক নম্বর ওষুধটা কিনবেন। আর সব ওষুধ আমার কাছে আছে। তারপর ডাক্তার মাষ্টার মশায়ের মেয়েকে বলে দেয় কখন কোন ওষুধ খাওয়াতে হবে।

ডাক্তার যখন ও বাড়ি থেকে রওনা হয়, তখন রাত প্রায় দেড়টা। মাষ্টার মশাই ডাক্তারের হাতে কিছু টাকা গুঁজে দিতে যান। ডাক্তার সঙ্গে সঙ্গে হেসে বলে, কি করছেন স্যার ?

ডাক্তার আর কথা বলতে পারে না। গাড়ি চলতে শুরু করে।

ভোর সাড়ে চারটে নাগাদ এক নার্সিং হোম থেকে ডাঃ ঘোষ ফোন করেন ডাক্তারকে, তুমি একটু আসবে এখুনি ? আমার একটা পেসাণ্টের ব্যাপারে তোমার ওপিনিয়ন······

ডাক্তার একটু হেসে জানতে চায়, পুরুষ না মেয়ে পেসাণ্ট ?

—পুরুষ।

—শালা, মেয়ে পেসাণ্ট হলে তো কখনও আমাকে কনসাণ্ট করার কথা মনে পড়ে না ?

ডাঃ ঘোষও হাসেন। বলেন, ওরে শালা, তুমি তো আমার বউয়ের মেডিক্যাল এ্যাডভাইসার। আচ্ছা, তাড়াতাড়ি এসো।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, আসছি।

ডাক্তার কয়েক মিনিটের মধ্যেই গ্যারেজ থেকে গাড়ি বের করে নিজেই চালিয়ে চলে যায়। আধঘণ্টার মধ্যেই নার্সিং হোম থেকে ডাক্তার বেরিয়ে পড়ে। সোজা চলে যায় মাষ্টার মশায়ের জামাইকে দেখতে। মাষ্টার মশায়ের মেয়ে দরজা খুলে দিয়েই অবাক, আপনি ? এত ভোরে ?

ডাক্তার বলে, আগে বলুন, আমার পেসাণ্ট কেমন আছেন ?

—এখনও ঘুমুচ্ছেন।

ডাক্তার পেসাণ্টকে দেখে। আবার ই-সি-জি করে। আরো কত কি ! একটা ইনজেকশনও দেয় ডাক্তার। তারপর আবার ই-সি-জি, আবার ব্লাড প্রেসার দেখে। খুব মন দিয়ে নাড়ির স্পন্দন পরীক্ষা করে বার বার। ষ্টেথো কানে দিয়ে বুক পরীক্ষা করে বহুক্ষণ ধরে।

ঘরখানা অত্যন্ত ছোট। তাই ডাক্তার ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বারান্দায় পা দিয়েই একটু হেসে মাষ্টার মশায়ের মেয়েকে বলে, চায়ের জল চাপিয়েছো ?

সেও হাসে। বলে, চায়ের জল ফুটছে।

—তাহলে এখুনি পাব ?

—নিশ্চয়ই। এবার মাষ্টার মশায়ের মেয়ে ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করে, কেমন দেখলেন দাদা ?

ডাক্তারের মুখে হাসি লেগেই আছে। বলে, আমাকে দেখেও বুঝতে পারছো না ?

—একটু ভাল, তাই না ?

—একটু না, বেশ ভাল।

পাশের ঘরে বসে চা খাবার সময় মাষ্টার মশাই ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করলেন, অত রাত্তিরে গিয়ে আবার এই ভোরবেলায় না এসে একটু বেলায় .....

—সাড়ে চারটের সময় একটা নার্সিং হোমে একজন পেসান্টকে দেখতে গিয়েছিলাম। তাই ফেরার পথে ঘুরে গেলাম।

মাষ্টার মশায়ের মেয়ে বলে, তাহলে তো ঘণ্টা দুয়েকের বেশি ঘুম হয়নি।

ডাক্তার হেসে বলে, না, তা হয় নি।

—দিনে কি ঘুমুবার সুযোগ হবে ?

—বছর খানেকের মধ্যে তো দিনে ঘুমুবার সুযোগ হয় নি। জানি না আজ কি হবে।

—কিন্তু এভাবে পরিশ্রম করলে তো শরীর ভেঙ্গে পড়বে।

—বিধবা মা অনেক দুঃখ-কষ্টের মধ্যে আমাকে মানুষ করেছেন। এই কষ্টে আমার শরীর ভেঙ্গে পড়বে না।

দিন পাঁচেক পর মাষ্টার মশায়ের জামাইয়ের অবস্থা সত্যি ডাক্তারকে ঘাবড়ে দিয়েছিল কিন্তু না, শেষ পর্যন্ত সামলে যায়। তারপর থেকে আস্তে আস্তেই অবস্থার উন্নতি হচ্ছে।

এই তিন সপ্তাহে ডাক্তারের সঙ্গে এ বাড়ির সবার সম্পর্কও অনেক ঘনিষ্ঠ হয়েছে। মাষ্টার মশায়ের স্ত্রী আর ঘোমটার আড়ালে নিজেকে লুকিয়ে রাখেন না। মাষ্টার মশায়ের সেই কৃপাপ্রার্থীর মনোভাব আর নেই। জামাই সুজিত ডাক্তারের প্রায় বন্ধু হয়ে গেছে। হাসতে হাসতে সুজিত বলে, এখন মনে হচ্ছে শ্বশুর বাড়ি বেড়াতে এসে অসুস্থ হওয়ায় ভালই হয়েছে। অসুস্থ না হলে তো আপনাকে পেতাম না। মাষ্টার মশায়ের মেয়ে দেবকী বলে, আমরা এলাহাবাদ ফিরে গেলে আপনাকে একবার আসতেই হবে।

ডাক্তার হেসে বলে, সময় কোথায় ?

ওসব জানি না। আপনাকে আসতেই হবে।

ডাক্তার ওর দিকে তাকিয়ে হেসে হেসে বলে, আসতেই হবে ?

—একশ' বার আসতে হবে।

ডাক্তার সুজিতের দিকে তাকিয়ে বলে, জামাই, শুনছ তোমার বউয়ের কথা ?

ও ঠিকই বলছে।

ডাক্তার বলে, তাহলে একবার নিশ্চয়ই এলাহাবাদ যেতে হবে।

এর দু'চার দিন পরেই অপরূপা হাসতে হাসতে ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করল, মাষ্টার মশায়ের বাড়িতেও কি আরেকটা অপরূপার দেখা পেলে ?

ডাক্তার অবাক হয়ে বলে, তার মানে ?

- মানে দেখে শুনে মনে হচ্ছে ওখানেও একটা অপরূপা পেয়েছ। তা না হলে বিনা পয়সার চিকিৎসায় এত উৎসাহ কেন ?

—যাদের বেশি পয়সা নেই, যারা শুধু আমার উপর নির্ভর করে, সেরকম সব পেসাণ্টদের বাড়িতেই আমি বার বার যাই।

—পয়সা পেলে কেন যাবে না ?

—শুধু পয়সার জন্য আমি চিকিৎসা করি না।

—কেন ? তুমি কি রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসী ?

- সন্ন্যাসী কেন হব ?

—তাহলে মাষ্টার মশায়ের কাছ থেকে কিছু নিলে না কেন ?

—কারণ উনি আমার মাষ্টার মশাই।

—পেসাণ্ট তো ওর জামাই। সে তো চাকরি বাকরি করে ?

ডাক্তার হেসে বলে, ও বাড়ি থেকে টাকা নিইনি বলে কি তোমার কোন কষ্ট হচ্ছে ?

—কষ্টের কথা তো বলি নি। তোমার প্রাপ্য তুমি নেবে না কেন ?

ডাক্তার সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিতে পারে না। মুখে নিচু করে একটু ভাবে। বলতে পারে না, অপরূপা, আমি যদি আমার উচিত প্রাপ্য নিতাম তাহলে তোমার বাবা-মাকে পথের ভিখারী হতে হতো। তোমারও বিয়ে হতো কিনা, তা ভগবান জানেন। ডাক্তার বলতে পারে না তার মায়ের কথা, ভাখ বাবা, পয়সার লোভে চিকিৎসা করবি না। যদি তোর খাওয়া-পরার কষ্ট না থাকে, তাহলে কোন গরীব লোকের কাছ থেকেই পয়সা নিস না। দেখবি, ওদের আশীর্বাদে তোর আয় দশ গুণ বেড়ে যাবে।

মার কথা ভাবতে গিয়েও ডাক্তারের চোখে জল আসে। ডাক্তার হুইস্কীর গেলাসটা পাশে সরিয়ে রেখে আমাকে বলে, জানো জার্নালিষ্ট, মার কথা বর্ণে বর্ণে সত্যি প্রমাণিত হয়েছে আমার জীবনে। একটা গরীব পেসাণ্টের টাকা ছেড়ে দিলে দশটা বড়লোকের বাড়ির পেসাণ্ট হাতে আসে।

তাই নাকি ?

—হ্যাঁ, জার্নালিষ্ট। আমি পদে পদে এর প্রমাণ পাই। ডাক্তার একটু হেসে বলে মাঝে মাঝে আমার মনে হয়, আমি কি ভবিষ্যতে বেশি পাবার লোভে এদের কাছ থেকে টাকা নিচ্ছি না ? পর মুহূর্তে মনে হয়, না, না, তা কেন হবে ? আমি তো আমার মাতৃ আজ্ঞা পালন করছি।

—তাই তো।

ডাক্তার গেলাসে এক চুমুক দিয়ে বলে, অপরূপা এত তাড়াতাড়ি তার অতীত ভুলে গেল যে আমি অবাক না হয়ে পারলাম না। তাছাড়া ও যত পেয়েছে, তত ওর লোভ বেড়েছে। আমি সত্যি এসব ভাবতে পারি না।

—তুমি ওকে বোঝাবার চেষ্টা করেছ ?

—বহুবার, বহু ভাবে। ডাক্তারের গেলাস খালি হয়। আবার ভরে নেয়। বলে, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক এমনই অদ্ভুত যে একজনের সব মহত্ত্ব-ক্ষুদ্রতাই অন্যের কাছে ধরা পড়ে। তাই প্রতিদিন প্রতি পদক্ষেপে ওর এত ক্ষুদ্রতা, এত দৈন্য দেখি যে আমি আর ওকে ভালবাসতে পারি না ; বরং ঘেন্না করি। আমি আস্তে আস্তে ওর থেকে দূরে সরে যেতে যেতে আজ কতজনের মধ্যে নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছি।

এবার আমি একটু হেসে বলি, অনেকের কাছে নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছ ?

—হ্যাঁ, অনেকের কাছে। তারপর ডাক্তার একটু হেসে বলে, ছাত্রজীবনের অনেকের সঙ্গে প্রেম করেছি কিন্তু চরিত্রহীন ছিলাম না। একবার নীলিমা আমাকে কি বলেছিল জানো ?

—কি ?

—বলেছিল, ছেলেদের সঙ্গে একটু বেশি ঘনিষ্ঠতা হলেই তারা অনেক কিছু দাবী করতে শুরু করে কিন্তু তুমি বেশি কিছু দাবী কর না বলেই তোমার সঙ্গে এত প্রাণ খুলে মিশতে পারি।

শুনে আমি হাসি।

ডাক্তার হুইস্কীর গেলাসটা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে একটু ম্লান হাসি

হাসে আপন মনে। তারপর সে যেন স্বগতোক্তি করে, নদীর জলে বাধা দিলেই সে দশদিক দিয়ে এগুবার চেষ্টা করে ; এটাই জলের ধর্ম। মানুষের তাই স্বভাব। সে একজনের কাছে প্রাণ ভরে ভালবাসা পেলে দশজনের কাছে ভালবাসার ভিক্ষা চাইবে না কিন্তু ঐ একজনের কাছে হতাশ হলে সে বিপথগামী হবেই।

আমি বলি, হ্যাঁ ডাক্তার, অনেকের জীবনেই এই ঘটনা ঘটে।

ডাক্তার আমার দিকে তাকিয়ে হেসে বলল, জার্নালিষ্ট, এখন অন্যের কথা বাদ দাও। আমার কথাই শোন।

পার্ক সার্কাসের এক তরুণ ডাক্তারের টেলিফোন পেয়েই ডাক্তার ছুটে গেল। ভদ্রলোকের বয়স বেশি না, বড় জোর চৌত্রিশ-পঁয়ত্রিশ। কন্‌সট্রাকশন ইঞ্জিনিয়ার। বিলেতেই থাকেন। বিয়ে করেছেন বছর পাঁচেক আগে। একটি মেয়ে হয়েছে। তার বয়স বছর দেড়েক। ভদ্রলোকের স্ত্রীকে এককালে কলকাতার নানা মঞ্চে শ্যামার ভূমিকায় দেখা গেছে। সব চাইতে ছোট ভাইয়ের বিয়ের জন্য লণ্ডন থেকে এসেছেন। বিয়েও বেশ ভালভাবেই হয়েছে। বৌ-ভাতও খুব সুষ্ঠ ভাবে হল। চার ভাই মহা খুশি। খুশি ওদের বৃদ্ধা মা ও বাড়ির সবাই।

দু'দিন পর ভোরের দিকে হঠাৎ বুকে ব্যথা। অসহ্য ব্যথা। অবশ হয়ে যাচ্ছে এক দিক। সঙ্গে ঘাম। ফ্যামিলী ফিজিসিয়ান ছুটে এলেন। একটু দেখেই তাঁর মুখের চেহারা বদলে গেল। ওঁর টেলিফোন পেয়েই ডাক্তার ছুটে গেলেন। হ্যাঁ, যা সবাই আশঙ্কা করেছিলেন, তাই।

বড় ভাই ডাক্তারকে বললেন, ভাইকে সুস্থ করার জন্য যা দরকার তাই করুন। ডাক্তার, নার্স, ওষুধ—নার্সিং হোম, কোন ব্যাপারেই আপনার দ্বিধা করার প্রয়োজন নেই।

ডাক্তার বললেন, এ পেসাণ্টকে নার্সিং হোমে নিয়ে যাওয়া অসম্ভব। তাই বাড়িতেই সবকিছু করতে হবে।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাই করুন।

পার্ক সার্কাসের এই বাড়ির পেসাণ্টের ঘরকেই আধুনিক নার্সিং হোমে পরিণত করা হল। কত রকমের মেসিন আনা হল। কার্ডিয়াক পেসাণ্ট দেখাশুনা করে এমন নার্সদেরও আনা হল। ঘণ্টায় ঘণ্টায় দেখছেন ফ্যামিলী ফিজিসিয়ান। এছাড়া ডাক্তার বার বার আসছেন ও ঘণ্টার পর ঘণ্টা থাকছেন।

বাহাত্তর ঘণ্টা কেটে গেল। সবার চোখেই আশার আলো। রাত সাড়ে বারোটার পর ডাক্তার বাড়ি যাবার সময় বলে গেলেন, হার্টের কণ্ডিসন অনেকটা

ষ্টেরিলাইজ করেছে। অবস্থা এই রকম থাকলে ভয়ের কিছু নেই।

রাত পৌনে তিনটের সময় হঠাৎ সিস্টারের ফোন, স্যার, এখুনি চলে আসুন।

ডাক্তার পনের মিনিটের মধ্যে ছুটে যায়। হ্যাঁ, হঠাৎ সেই ব্যথা, সিরিয়াস সেই ব্যথা। ডাক্তার যুদ্ধ করে, যুদ্ধ করে নার্স কিন্তু না, ওরা হেরে গেল। চারদিকে ভোরের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গেই এ বাড়িতে অমাবস্যার অন্ধকার নেমে এল। ডাক্তারের পায়ের উপর মূর্চ্ছা গেলেন পেসান্টের স্ত্রী আর বড় ভাই। ডাক্তার চোখে অন্ধকার দেখে। হঠাৎ মাথা ঘুরে পড়ে যাবার উপক্রম। সামলে নেয় সিস্টার।

ডাক্তার আমার দিকে তাকিয়ে বলল, মৃত্যু অনেক দেখেছি কিন্তু এই পেসান্টের মৃত্যুতে এমন শক্ পেলাম যে তখন গাড়ি চালিয়ে বাড়ি ফেরার মত অবস্থা আমার নেই। সিস্টার কাছেই সি. আই. টি. রোডে থাকত। ও আমাকে ওর বাড়িতেই নিয়ে গেল।

— তারপর ?

ছোট্ট দু'খানা ঘরের ফ্ল্যাট। আশা আর ওর দাদা-বৌদি থাকেন। কখনও কখনও দেশ থেকে মা আর ছোট ভাই আসে। ঘরে ঢুকলেই বোঝা যায়, অত্যন্ত সাধারণ অবস্থা কিন্তু আশার আন্তরিকতায় মুগ্ধ হয়ে যান ডাক্তার।

ডাক্তার বলল, বোধহয় ঘণ্টাখানেক আশার ওখানে ছিলাম কিন্তু ঐটুকু সময়ের মধ্যেই বুঝলাম, আশা মানুষকে ভালবাসতে পারে, মানুষের সুখ-দুঃখ বোঝে।

তারপর প্রায় বছর খানেক আশার সঙ্গে ডাক্তারের দেখা হয় না। সেদিন রুগীরা চলে যাবার পরও ডাক্তার চেম্বারে বসে আছেন এক বন্ধুর অপেক্ষায়। একলাই। ষ্টাফদের ছুটি দিয়েছেন। হঠাৎ টেলিফোন......

—ইয়েস !

—স্যার আমি আশা।

—আশা। মানে সিস্টার আশা ?

—হ্যাঁ স্যার।

—কেমন আছ ? কাজকর্ম কেমন চলছে ?

— এমনি ভাল আছি, তবে কাজকর্ম কখনও ভাল, কখনও খারাপ।

- তুমি কি কোন নার্সিং হোমে চাকরি করতে ইণ্টারেষ্টেড ?

—হ্যাঁ স্যার।

— ঠিক আছে, আমি দেখছি।

—স্যার, আমি কিন্তু নিজের জন্য টেলিফোন করিনি। ..

—হ্যাঁ বল, টেলিফোন করলে কেন ?

—স্যার আপনার শরীরটা বোধহয় ঠিক নেই, তাই না ?

—হ্যাঁ, খুব টায়ার্ড কিন্তু তুমি কি করে জানলে ?

—সেদিন কন্টিনেণ্টাল নার্সিং হোমে আপনাকে দূর থেকে দেখেই ····

—তুমি ওখানে ছিলে নাকি ?

—হ্যাঁ স্যার, আমি পাশের কেবিনে ছিলাম কিন্তু আপনাকে দেখেছি। দেখেই মনে হল, আপনার রেষ্ট দরকার।,

সত্যি ডাক্তার বড় ক্লান্ত। হবে না কেন ? এত রুগী সামলান কি সহজ ব্যাপার ? খাওয়া-দাওয়ার কোন ঠিক নেই। ঘুম ? না, বহুকাল ভাল করে ঘুমুতে পারে না কিন্তু কেউ তো ডাক্তারকে বলেনি, তুমি ক্লান্ত, তুমি বিশ্রাম নাও।

মুগ্ধ ডাক্তার সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিতে পারে না। কয়েক মুহূর্ত পরে বলে, ঠিক বলেছ আশা, আমাব রেষ্ট দরকার।

— অন্তত দশ-পনের দিনের জন্য কোথাও চলে যান স্যার।

—অত দিন বাইরে থাকা মুস্কিল কিন্তু পাঁচ-সাত দিনের জন্য যেতে পারি। তবে-একলা গেলে তো সারাদিন শুধু হুইস্কী খাব ; তুমি যাবে আমার সঙ্গে ?

—আমি ? আশা অবাক হয়ে প্রশ্ন করে।

—হ্যাঁ, তুমি।

—আপনি সিরিয়াসলি বলছেন স্যার ?

—হ্যাঁ আশা, আমি সিরিয়াসলি বলছি। তুমি ক'দিন দেখাশুনা করলে আমি সত্যি সুস্থ হব।

—আপনি যদি তাই মনে করেন তাহলে নিশ্চয়ই যাব স্যার।

ডাক্তার আমার দিকে তাকিয়ে একটু ম্লান হাসি হেসে বললেন, আশাকে নিয়ে চলে গেলাম গোপালপুর অন-সী। ওবেরয় পাম বীচ-এ আগের থেকেই ঘর বুক করা ছিল। সত্যি বলছি জার্নালিষ্ট, আমাকে আশা কত শ্রদ্ধা করে, ভালবাসে, তা সেবার দেখে আমি মুগ্ধ হয়ে গেলাম। সেবা-যত্নের কথা তো বাদই দিচ্ছি।

আমি একটু হেসে বললাম, সো, ইউ হ্যাড এ ভেরি নাইস টাইম !

—একশ'বার ! মানসিক, দৈহিক সব দিক থেকেই মহানন্দে ছিলাম।

— আশা এখনও কলকাতায় আছে ? আমি হাসি চেপে প্রশ্ন করি।

—হ্যাঁ।

—এখনও মাঝে মাঝে গোপালপুরের সমুদ্রে দুজনে একসঙ্গে স্নান কর?

—বছরে একবার নিশ্চয়ই যাই। তাছাড়া দু'এক মাস অন্তর দু'একদিনের জন্য কোথাও না কোথাও আশাকে নিয়ে চলে যাই।

—তুমি কি আশাকে ভালবাসো?

—নিশ্চয়ই ভালবাসি।

—আর কাকে ভালবাসো?

—অনেককেই আমি ভালবাসি।

—অনেককে?

—হ্যাঁ অনেককে। যারা আমাকে ভালবাসে, আমিও তাদের ভালবাসি।

আমি হেসে বলি, নট এ ব্যাড থিওরি।

ডাক্তার আমার প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট বের করে ধরায়। পর পর দু'তিনটে টান দেবার পর বলল, এইত দিল্লী আসার পথে দু'দিন এলাহাবাদে কাটিয়ে এলাম।......

—এলাহাবাদে?

—হ্যাঁ। দেবকী আছে না?

—কোন দেবকী?

—মাষ্টার মশায়ের মেয়ে। যার স্বামীর......

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে পড়ছে। তুমি তাহলে সত্যি এলাহাবাদ গেলে?

—গেলে মানে? দিল্লী আসা-যাওয়ার পথে সব সময় এলাহাবাদ নামি! না নেমে পারি না।

—তাই নাকি?

—হ্যাঁ।

আমি হেসে জিজ্ঞাসা করি, তোমার হৃৎপিণ্ডের এক টুকরো কি ওখানেও জমা রেখেছ?

—ইয়েস।

—গুড গড।

—তাহলে শোনো।......

আগে মনে পড়ে নি। মনে পড়লে নিশ্চয়ই চিঠি লিখত, দেবকী, মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের কাজে দিল্লী যাচ্ছি। মাঝ পথে এলাহাবাদ। তাই ভাবছি নেমেই পড়ব দু'এক দিনের জন্য। তোমাদের দুজনের সঙ্গে আড্ডা দেবার লোভ

কিছুতেই সামলাতে পারছি না। কিন্তু না, মনে পড়েনি। ডাক্তার এত ব্যস্ত থাকে যে অনেকের অনেক কথাই মনে পড়ে না। রুগীদের চিন্তায় এত ব্যস্ত থাকে যে অন্য কোন কিছু চিন্তার অবকাশ পায় না। মনে পড়ল কালকা মেলে উঠে। ডাক্তার মনে মনে অনুশোচনা করে চিঠি না দেবার জন্য। চিঠি না দিয়ে যাওয়া উচিত নয় কিন্তু মনে মনে বড় ইচ্ছে করছে দেবকীর কাছে যেতে।

কালকা মেলের বার্থে বসে হুইস্কী খেতে খেতে ডাক্তারের মনে পড়ে দেবকীর কথা।......

—ডাক্তারদা।

—কি ? ডাক্তার মুখ না ফিরিয়েই জানতে চায়।

—এই হরলিক্সটুকু খেয়ে নিন।

ডাক্তার বিস্মিত হয়ে ওকে দেখে। ওর স্বামী জীবন-মরণের মাঝে ভাসছে কিন্তু তবু সে হরলিক্স এনেছে ?

দেবকীর মুখে হাসি নেই কিন্তু সারা মুখে তার ঐকান্তিকতার ছাপ। বলল, এখন রাত প্রায় একটা। কখন বাড়ি গিয়ে খাওয়া-দাওয়া করবেন, তার তো ঠিক নেই। এটুকু খেয়ে নিন।

ডাক্তার একটু হেসে বলে, এই অবস্থার মধ্যেও তুমি আমার জন্য হরলিক্স তৈরী করলে ?

—তাতে কি হল ? আপনার শরীরটাও তো দেখতে হবে।

হুইস্কীর গেলাসের দিকে তাকালেই যেন ডাক্তার দেবকীকে দেখতে পায়। কি অপূর্ব শান্ত, স্নিগ্ধ মূর্তি ! ঐ মহাবিপর্যয়ের মধ্যেও সে অবিচলভাবে কর্তব্য পালন করেছে। বিপদের মধ্যেও সে মুষড়ে পড়েনি ; আবার যেদিন সম্পূর্ণ সুস্থ হল সেদিন আনন্দেও ভেসে যায় নি। ও যেন মাঝ গঙ্গায় আপন মনে ভাটিয়ালি গাইতে বিভোর। জোয়ার না ভাটা—সেদিকে খেয়ালই নেই।

জামাইয়ের ঘরে ডাক্তার ছাড়াও আরো অনেকে। হঠাৎ দেবকী এসে বলল, ডাক্তারদা, একটু হাত ধুয়ে নিন।

— না, না, এখন কিছু খাব না ?

দু'মিনিট পরেই দেবকী ঘুরে এল। সবার সামনে নির্বিবাদে বলল, শিগগির হাঁ করুন।

ডাক্তার অবাক হয়ে হাসে। দেবকী ঐ সুযোগেই ওর মুখের মধ্যে লুচি-আলুর দম পুরে দেয়।

এ রকম আরো কত টুকরো ঘটনা ডাক্তারের মনে পড়ে। দেবকীর কথা ভাবতে ভাবতে এমন বিভোর হয়ে যায় যে হুইস্কীর গেলাসে চুমুক দিতেও ভুলে যায়। তারপরে হঠাৎ কালকা মেল খুব জোরে ব্রেক কষে থামতেই ডাক্তারের সম্বিত ফিরে আসে।

ডাক্তার গেলাসের হুইস্কী শেষ করে আবার ভরে নেয়। আবার ভাবে দেবকীর কথা। জামাইয়ের কথা। খবর না দিয়ে গেলেও কোন অসুবিধা নেই। ডাক্তারকে কাছে পেলে ওরা দুজনেই খুশি হবে। দারুণ খুশি হবে। পাঁচ পেগ হুইস্কী পেটে যাবার পর ডাক্তার ঠিক করল, এলাহাবাদে নামবে। নামতেই হবে।

কালকা মেল আধ ঘণ্টা দেরীতে এলাহাবাদ পৌঁছল। ঠিক মহল্লায় পৌঁছে যেতে বেশি সময় লাগল না কিন্তু বাড়িটা খুঁজতে একটু সময় লাগল। ডাক্তার পৌঁছবার আগেই জামাই অফিস চলে গেছে। দরজা খুলেই ডাক্তারকে দেখে দেবকী আনন্দে খুশিতে চিৎকার করে উঠল, ডাক্তারদা!

দেবকী ওর হাত ধরে টানতে টানতে ঘরের মধ্যে নিয়েই টিপ করে প্রণাম করল। ডাক্তার দু'হাত দিয়ে ওকে জড়িয়ে ধরে বলল, খবর না দিয়ে এসে অন্যায় করলাম কি?

দেবকী ডাক্তারের বুকের উপর মুখখানা রেখে বলে, এমন অন্যায় রোজ করতে পারেন না?

—রোজ?

—হ্যাঁ রোজ। রোজ আপনার কথা ভাবি।

—কাল সারা রাত আমিও তোমার কথা ভেবেছি আর গেলাসের পর গেলাস হুইস্কী খেয়েছি।

—তাই কি কাল সারা রাত আমিও ঘুমোতে পারি নি?

—কাল রাত্তিরে বুঝি তোমার ঘুম আসছিল না? ডাক্তার আলতো করে হাত দিয়ে দেবকীর মুখখানা তুলে ধরে জিজ্ঞাসা করে।

—ঘুমিয়েছি কিন্তু একেবারে ভোর রাত্রে।

—তাই নাকি?

—হ্যাঁ।

—জামাই কিছু বলল না?

—ও জানে না।

—তাহলে সত্যি তুমি আমাকে ভালোবাসো?

—নিশ্চয়ই ভালবাসি। প্রাণ দিয়ে ভালোবাসি।

ডাক্তার ওর কানের কাছে মুখ নিয়ে খুব চাপা গলায় বলল, আমিও তোমাকে ভালবাসি।

—জানি।

—সত্যি জানো ?

—হ্যাঁ জানি।

—কি করে জানলে ?

—পরে বলব। এখন বসুন। চা করি।

ডাক্তার সঙ্গে সঙ্গে বাহুবন্ধন থেকে দেবকীকে মুক্তি দিয়ে বলে, হ্যাঁ, চা করো। কতদিন তোমার হাতের চা খাই না।

ডাক্তাব কোট খোলে, টাই খোলে, জামার বোতামগুলো খুলে পাখার তলায় বসে। দেবকী চা আনে। পাশে বসে। বলে, সত্যি, আমি ভাবতে পারছি না। আপনি এসেছেন।

—কেন ?

—মনে হচ্ছে, আমি যেন স্বপ্ন দেখছি।

— কাল দুপুরেও আমি জানতাম না, আজ দুপুরে তোমাকে কাছে পাব।

—কেন ? আগের থেকে ঠিক করেন নি ?

—না। ট্রেনে উঠে হুইস্কী খেতে খেতে ঠিক করলাম, দেবকীর কাছে যাব।

—খুব ভাল করেছেন। চা খেতে খেতে দেবকী বলে, আপনি স্নান করুন। আমিও চটপট কাজ সেরে নিই। তারপর সারা দুপুর গল্প করব।

—তোমার আবার কি কাজ ?

—একটু রান্না করব।

—কেন ? তোমার রান্না হয় নি ?

—হয়েছে, একটু বাকি।

—না, না, তোমাকে আর কিছু করতে হবে না। যা আছে তাই দুজনে ভাগ করে খেয়ে নেব।

— না ডাক্তারদা তা হয় না।

ডাক্তার দেবকীর কাঁধে হাত রেখে বলেন, তাই হবে। তারপর একটু থেমে বলেন, তুমি যা দেবে তাতেই আমার পেট ভরবে।

— না, না, আপনার কষ্ট হবে।

—দেবকী, আমি বিধবার ছেলে। শুধু সিদ্ধ ভাত খেতেও আমার কষ্ট হয় না।

না, দেবকী আর কিছু রান্না করে না। যা ছিল তাই নিয়ে দুজনে খেতে বসে —ডাইনিং টেবিলে না, মেঝেয় আসন পেতে। কোন চায়নার প্লেটে না, কাঁসার থালায়। দেবকী হাসতে হাসতে বলল, খুব অসুবিধে হচ্ছে তো?

— তা একটু হচ্ছে। মা মরে যাবার পর কেউ তো এমন আন্তরিক ভাবে যত্ন করে খাওয়ায় নি, তাই অভ্যাসটা নষ্ট হয়ে গেছে।

দেবকী অবাক হয়ে ওর দিকে তাকায়। ডাক্তার আবার বলে, জানো দেবকী আমি নাকি নামকরা ডাক্তার। আমি চেম্বারে বসেই এক একদিন সাত-আট হাজার টাকা আয় করি।······

- তাই নাকি?

- -হ্যাঁ দেবকী। সবাই একশ' আঠাশ টাকা করে দেয়। পনের-কুড়ি জন পেসা'ণ্ট রোজই দেখি কিন্তু কোন কোন দিন পঞ্চাশ ষাট-জনকেও দেখি। আজ আমার কত কি হয়েছে কিন্তু পাগলের মত খুঁজে বেড়াই আন্তরিকতা আর ভালবাসা। তারপর ডাক্তার একটু হেসে বলে, ঐ দুটোর লোভেই তোমার কাছে চলে এলাম।

দেবকী মুখ নীচু করে বলে, ও দুটোর অভাব কোনদিন এখানে হবে না।

— কোনদিন হবে না?

—না। কোনদিন হবে না।

ডাক্তার খেতে খেতেই দেবকীকে একবার চুমু খায়।

খেয়ে উঠেই ডাক্তার শুয়ে পড়ে। দেবকী ওর পাশে বসে গল্প করে—জানেন ডাক্তারদা, আপনাদের জামাই যেদিন অসুস্থ হয়, সেদিন বাবা খুব ভয়ে ভয়ে আপনার কাছে গিয়েছিলেন।

—কেন?

—বাবা আপনাকে স্কুলের নীচু ক্লাশে পড়াতেন। দীর্ঘকাল আপনার সঙ্গে বাবার যোগাযোগ হয়নি। ইতিমধ্যে আপনি বিখ্যাত ডাক্তার হয়েছেন।

— তার জন্য ভয়ের কি আছে?

— ভয় ছিল টাকাকড়ির ব্যাপারে। টাকা ব্যয় করে জামাইয়ের চিকিৎসা করাবার ক্ষমতা বাবার ছিল না। তাই··· ।

দেবকী কথাটা শেষ করে না।

ডাক্তার জিজ্ঞেস করে, তাই কি?

—তাই আপনি যখন টাকা নিলেন না তখন আনন্দে বাবা কেঁদে ফেলেছিলেন। আবার যখন ওষুধপত্র দিলেন তখন বাবার গর্ব দেখে কে?

ডাক্তার হাসে।

দেবকী আবার বলে, সত্যি, আপনি ঐভাবে চিকিৎসা না করলে ওকে আমরা বাঁচাতে পারতাম না।

ডাক্তার দেবকীর হাতখানা নিয়ে খেলা করতে করতে বলে, না, দেবকী, ঠিক বললে না। টাকা ব্যয় করলেই কি রুগীকে বাঁচান যায়? এবার ডাক্তার একটু হেসে বলে, একটা কথা তোমাকে বলছি, কিন্তু কাউকে বলো না।

—না, না, বলব না।

—মাষ্টার মশায়ের জন্যই তোমাদের বাড়ি যাই কিন্তু জামাইয়ের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি শুধু তোমার জন্য।

—আমার জন্য?

—একশ'বার তোমার জন্য?

—কেন? আমি কি করলাম?

সেদিন তোমাকে দেখেই মনে হয়েছিল, আহা এই মেয়েটা যদি আমাকে একটু ভালবাসত তাহলে আমার জীবন ধন্য হত।

—কি বলছেন আপনি?

—হ্যাঁ দেবকী সত্যি কথাই বলছি। তোমাকে খুশি করার জন্যে মিথ্যে কথা বলছি না এবং বিশ্বাস করো, কোনদিনই আমি তোমাকে মিথ্যে কথা বলতে পারব না।

দেবকী মুখে কোন কথা বলে না। বলতে পারে না। শুধু মুগ্ধ দৃষ্টিতে ডাক্তারের দিকে তাকিয়ে থাকে।

ডাক্তার বলে, সেদিন তোমাকে দেখেই মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, আমি প্রাণপণে চেষ্টা করব যাতে দেবকী দুঃখ না পায়। ভগবান আমার মুখ রক্ষা করেছেন। ডাক্তার একটু থেমে বলে, তবে দু'চারদিন পরে জামাইয়েরও প্রেমে পড়ে গেলাম। ভারি সুন্দর ছেলে।

দেবকী বলে, আপনাকে যে ও কি চোখে দেখে তা বলে বোঝাতে পারব না।

—তা আমি জানি, বুঝি।

দেবকী একটু কাত হয়ে বসে ডাক্তারের মাথায় হাত দিতে দিতে বলে, রাত্রে তো ঘুমোন নি। এখন একটু ঘুমিয়ে নিন।

—না, না, ঘুমোব না।

—কেন? ঘুম পাচ্ছে না?

—ঘুমোলেই তো তুমি চলে যাবে।

—না, না, আমি চলে যাব না। আপনি ঘুমোন, আমি আপনার কাছেই থাকব। হঠাৎ ডাক্তার পাশ ফিরে শুয়ে দেবকীর কোমর জড়িয়ে ধরে বলে, দেবকী তোমাকে এত কাছে পেয়ে আমি যদি কোন অন্যায় দাবী করি?

—আপনার কোন দাবীই অন্যায় হবে না।

—কি বললে?

—বললাম তো, আপনি যা ইচ্ছে দাবী করতে পারেন। আপনার কোন দাবীকেই আমি অন্যায় মনে করব না।

আনন্দে উত্তেজনায় ডাক্তার উঠে বসে দু'হাত দিয়ে দেবকীকে জড়িয়ে ধরে বলে, সত্যি অন্যায় মনে করবে না?

—না, কখনই না।

- আমার চরম দুর্বলতা দেখেও রাগ করবে না?

—না, ডাক্তারদা, আমি কোনদিনই আপনার উপর রাগ করব না।

ডাক্তার দেবকীকে নিয়ে আনন্দে উন্মাদ হয়ে যায়।

দু'জনে মুগ্ধ হয়ে দু'জনকে দেখে। দু'জনের মুখেই আত্মতৃপ্তি মাখা খুশির হাসি। মুখে না, শুধু চোখে চোখেই দুজনে কথা বলে। অনেক কথা যে কথা মুখে বলা যায় না, তা শুধু চোখের ভাষাতেই বলা যায়। অনেকক্ষণ এ ভাবেই কেটে যায়।

তারপর দেবকী বলে, কেউ ভাবতেও পারবে না এত বড় ডাক্তার আমার কাছে এসে এত ছেলেমানুষী করে।

—আমি বুঝি খুব বড় ডাক্তার?

হ্যাঁ, তবে আমার কাছে আপনি শুধু ডাক্তারদা।

-- ঠিক বলেছ দেবকী। যে বড় হয় সেও মানুষ।

—আমি তো সেই মানুষটাকেই ভালবাসি, বড় ডাক্তারকে না।

- আমি জানি; বড় ডাক্তার ভাবলে তুমি এভাবে আমাকে কাছে টেনে নিতে পারতে না।

আরো কিছুক্ষণ গল্পগুজব করেই ডাক্তার বলে, দেবকী, চা খাওয়াও। তারপর চল আমরা দুজনে জামাইকে নিয়ে আসি।

ডাক্তারের কথা শুনে দেবকী অবাক হয়। বলে, আপনি ওর অফিস যাবেন?

—যাব না কেন? আমরা দুজনে ওকে আনতে গেলে খুব মজা হবে।

—মজা মানে? ও আপনাকে দেখে চমকে যাবে।

দেবকী চা করে। দুজনে পাশাপাশি বসে চা খেতে খেতে কথা হয়। ডাক্তার বলে, কাল এমন সময় আমি আবার ট্রেনে।

—সে কি? আপনি কালই যাবেন?

—পরশু যে দিল্লীতে মিটিং আছে। কাল দিল্লী এক্সপ্রেসে যাব।

—কী আশ্চর্য! তাহলে আপনি এলেন কেন?

—কেন এলাম, তা এখনও বুঝতে পার নি?

দেবকী মাথা নেড়ে বলে, না, না, কাল যাওয়া হবে না। এসেছেন যখন তখন দু'চারদিন থাকতেই হবে।

—কিন্তু পরশু যে আমাকে দিল্লীতে থাকতেই হবে।

—তা আমি জানি নে।

—যদি তুমি বল, তাহলে ফেরার পথে আবার আসতে পারি।

—সত্যি আসবেন?

—তুমি বললেই আসব কিন্তু······

—আবার কিন্তু কেন?

—আমি যদি আবার পাগলামী করি?

—যত ইচ্ছে পাগলামী করবেন কিন্তু আপনাকে আসতেই হবে। দেবকী ডাক্তারের হাত দুটো চেপে ধরে বলে।

চায়ের কাপে শেষ চুমুক দিয়ে ডাক্তার দেবকীর গলা জড়িয়ে ধরে বলে, তুমি না বললেও আমি আসতাম।

—তবে কেন আমাকে ভয় দেখাচ্ছিলেন?

—পাগলামী করার পারমিশনটা আগে থেকে আদায়ের লোভে।

লজ্জায় দেবকী উঠে যায়।

সাইকেল রিক্সায় উঠেই ডাক্তার দেবকীকে জিজ্ঞেস করল, জামাইয়ের ছুটি হতে কত দেরি আছে?

দেবকী ঘড়ি দেখে বলল, এখনও ঘণ্টাখানেক।

—অহলে আমরা কিছুক্ষণ ঘুরে ফিরেই জামাইয়ের অফিসে যাব।

—কোথায় ঘুরবো?

—এমনি রাস্তায় রাস্তায় ঘুরব।

—হেঁটে হেঁটে ?

—না, না, এই সাইকেল রিক্সায়। তোমাকে পাশে নিয়ে ঘোরার মত সুযোগ হয় নি, তাই……

দেবকী ডাক্তারের হাতখানা নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে বলে, আপনি সত্যি বিচিত্র মানুষ !

এ-জি অফিসের সামনে এসে যখন রিক্সা থামল, তখন ছুটির সময় প্রায় হয়ে এসেছে। দেবকী বলল, আমরা এখানেই অপেক্ষা করি। ও এখুনি বেরুবে।

হ্যাঁ, জামাই একটু পরেই বেরুল। ডাক্তারকে দেখেই আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেল। তারপর বাড়ি এসে কত হাসি, কত গল্প।

ডাক্তার মাঝখানে বসে দু'হাত দিয়ে দুজনকে জড়িয়ে ধরে বলে, আমার অনেক দোষ ত্রুটি আছে কিন্তু ভাই, আমি তোমাদের দুজনকে সত্যি ভালবাসি। তোমরা আমাকে দূরে সরিয়ে দিও না।

জামাই বলে, ডাক্তারদা, জানি আপনি অনেক বড় কিন্তু তবু আপনাকে আমাদেরই একজন মনে করি। আমরা ভুল করে আপনাকে সরিয়ে দিতে চাইলেই আপনি সরে যাবেন কেন ? আমরা দুজনেই তো আপনার।

দেবকী বলে, ডাক্তারদা, আপনি যে আমাদের কত প্রিয়, কত আপন, তা কি আপনি বোঝেন না ?

ডাক্তার বলে, তা জানি বলেই তো তোমাদের কাছে ছুটে এসেছি। আবার দিল্লী থেকে ফেরার পথে আসব। তারপর সময় পেলেই আসব। তোমাদের কাছে না এসে থাকতে পারব না।

সত্যি, ডাক্তার দিল্লী আসা-যাওয়ার পথে সব সময় দু'একদিন এলাহাবাদে কাটিয়ে যায়। যাবেই। কেন ডাক্তারের বার বার মনে পড়ে সেই ক'টা কথা।…

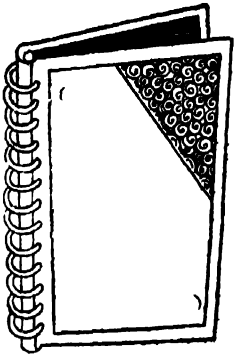
—দেবকী, একটা কথা বলব ?

—বলুন ডাক্তারদা।

—শেষ পর্যন্ত একজন চরিত্রহীন ডাক্তারের কাছে নিজের সবকিছু বিলিয়ে দিলে ?

দেবকী মাথা নেড়ে বলল, কে বলল আপনি চরিত্রহীন ? যে ভালবাসতে জানে সে কি চরিত্রহীন হয় ? যে দেয়া নেয়ার মধ্যে ভালবাসা থাকে তাতে কারুরই চরিত্র যায় না।

ডাক্তার মুগ্ধ হয়ে দেবকীকে বুকের মধ্যে টেনে নেয়।



ফ্ল্যাশ ব্যাক

আগে রাজধানী এক্সপ্রেসে শুধু দিল্লী-কলকাতার মধ্যে যাতায়াত করা যেত। মাঝ-পথে থামত গোমো, মোগলসরাই, কানপুর কিন্তু যাত্রীর ওঠা-নামা হত না। শুধু এঞ্জিনের সারথি বদলে যেত। তারপর একদিন রাজধানী এক্সপ্রেসে মাঝপথে যাত্রী ওঠানামা চালু হল।

দিল্লী থেকে কলকাতা আসছি এই রাজধানী এক্সপ্রেসে। আমার কোচেই কানপুরের কোটা। রাজধানীর চিরপরিচিত কর্মীবন্ধুদের ঔদার্যে নৈশ ভোজনটা একটু গুরুতরই হল। ঘুম এলেও ঘুমুলাম না। কানপুরের যাত্রীদের ওঠা-নামার পর্ব না মিটলে শান্তিতে ঘুমুতে পারব না বলে জেগেই রইলাম। কানপুরের যাত্রীদের নির্দিষ্ট সীটের পাশেই আমার সীট। তাই মনে মনে বেশ বিরক্ত হয়েই জেগে রইলাম।

সঠিক সময় নয়, তার আগেই রাজধানী এক্সপ্রেস কানপুরে এল। আমি করিডরে দাঁড়িয়ে সিগারেট খেতে খেতে ধনীর দুলাল-দুলালীদের ওঠা-নাম দেখলাম। একটু পরে ট্রেন ছাড়ল। তখনও আমি করিডরে দাঁড়িয়ে পরিচিত এক ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলছি আর সিগারেট টানছি। মনে হল, এক ভদ্র-মহিলা বাথরুম যাতায়াতের পথে আমাকে যেন দেখলেন একটু তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে। মনে মনে ভাবলাম, হয়ত এত রাত্তিরে করিডরে দাঁড়িয়ে সিগারেট খাচ্ছি বলে অবাক হলেন। অথবা অন্য কোন কারণে। একটু পরে নিজের সীটে ফিরে

এলাম। বসে বসেই ঘুমুবার চেষ্টা করি। অনেকেই এভাবে বসে বসে ঘুমুতে পারেন না। সারা রাত জেগে থাকেন। না, আমি ঐ দলের না। আমি বেশ ঘুমুতে পারি। তবে মাঝে মাঝেই ঘুম ভেঙ্গে যায়। উঠে পড়ি। করিডরে যাই। সিগারেট খাই। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখি রাতের অন্ধকারে রাজধানী এক্সপ্রেস ছুটছে। আবার সিগারেট খাই, আবার দেখি। তারপর ফিরে আসি নিজের সীটে। ঘুম ভাঙ্গলে আবার চলে যাই করিডরে। এইভাবেই রাত কাটে।

রাত তখন ছটো-আড়াইটে হবে। আমি করিডরে দাঁড়িয়ে সিগারেট খাচ্ছি একলা একলা। ছ' এক মিনিট পরে এক ভদ্রমহিলা করিডরে এসেই আমাকে বললেন, মাপ কিজিয়ে, আপ ভট্টাচারিয়াজী?

আমি অবাক। বললাম, জী হাঁ।

এবার উনি হেসে বললেন, পহেচেনা নেই?

আমি মুহূর্তের জন্য একবার ওকে দেখি। মুখ নীচু করে ভাবি আরো কয়েক মুহূর্ত। তারপর মাথা নেড়ে বলি, না, ঠিক চিনতে পারছি না।

ওর মুখের হাসি তখন আরো স্পষ্ট, আরো উজ্জ্বল। হেসে হেসেই বলেন, আরেকবার ভাল করে দেখুন তো চিনতে পারেন কিনা।

আমি আবার ওকে দেখি, ভাল করে দেখি। ভাবি। একবার মনে হয়, কোথায় যেন দেখেছি, কোথায় যেন আলাপ হয়েছে। আবার পর মুহূর্তেই মনে হয়, না, ঠিক চিনতে পারছি না।

—কী হল? মনে পড়ছে না?

আমি সলজ্জ হাসি হেসে বলি, না, ঠিক চিনতে পারছি না।

উনি এক গাল হাসি হেসে বললেন, আমি সাবিত্রী! এবার চিনতে পারছেন তো?

—সাবিত্রী?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, সাবিত্রী।

—মানে আপনি ...তুমি জালানজীর· ....

সাবিত্রী হেসে বলে, যাক, তাহলে মনে পড়েছে।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, সব মনে পড়েছে।

— আমি তো ট্রেনে ওঠার সময়ই তোমাকে দেখেছি।

—তাই নাকি?

—হ্যাঁ কিন্তু বুঝতে পারলাম, তুমি আমাকে চিনতে পার নি।

—না, আমি খেয়াল করি নি।

—তারপর একবার তোমাকে আরো ভাল করে দেখার জন্যই বাথরুমে গেলাম কিন্তু তখনও তুমি চিনতে পারলে না।

—তখন মনে হল, তুমি যেন আমাব দিকে তাকালে কিন্তু

সাবিত্রী হেসেই বলল, একবার মনে হল, যখন চিনতেই পারলে না, তখন আর আলাপ করব না কিন্তু শেষ পর্যন্ত চলেই এলাম।

—আমি তো ভাবতে পারি নি যে, রাজধানী এক্সপ্রেসে তোমার সঙ্গে দেখা হতে পারে। তাছাড়া বহুদিন তো দেখাশুনা নেই।

—হ্যাঁ, বহুকাল। প্রায় বারো বছর আমাদের দেখা নেই।

—বারো বছর হয়ে গেল ?

—হ্যাঁ, ঠিক বারো বছর।

আমি হেসে পশ্ন করি, এত বছর পরেও আমাকে চিনতে পারলে ?

সাবিত্রীও হাসে। বলে, আবো বারো বছর পরে দেখা হলেও চিনতে পারতাম।

ওর কথা শুনে আমি অবাক হই। প্রকাশ করি না। জিজ্ঞাসা করি, কলকাতা যাচ্ছ ?

—হ্যাঁ।

—তুমি এখন কানপুরেই থাক ?

—তুমি যখন বিয়ে করলে না তখন আর কোথায় থাকব ?

ওর কথায় আমি না হেসে পারি না।

—হাসছ কী ? আর একটু হলেই তো আমি মিসেস ভটাচারিয়া হয়ে যেতাম, তাই না ?

আমি মাথা নেড়ে বলি, তা ঠিক।

যাক্ ওসব কথা। কেমন আছ ?

—ভাল। সঙ্গে সঙ্গে আমি প্রশ্ন করি, তুমি কেমন আছ ?

—ভাল।

—তোমার স্বামী ?

—ভাল।

—ছেলে কেমন আছে ?

— ভাল। ও কলকাতাতেই থাকে, ওখানেই পড়ছে॥

— তাই নাকি?

— হ্যাঁ। ওকে দেখতে আমি প্রায়ই কলকাতা যাই।

— তোমার স্বামী যান না?

— ও ব্যবসা নিয়ে এত ব্যস্ত থাকে যে, একদম সময় পায় না। তাই আমি একাই যাই।

আমি সঙ্গে সঙ্গে কোন প্রশ্ন করি না। আবার একটা সিগারেট ধরাই। সাবিত্রী বলে, আর কত সিগারেট খাবে? ট্রেনে ওঠার পর থেকে দেখছি, কেবল সিগারেটই খাচ্ছ।

একটু হাসি। বলি, হ্যাঁ, আমি একটু বেশিই সিগারেট খাই।

— তখন তো খেতে না।

— তখন কী এই আমি ছিলাম?

— কেন? তুমি কী বদলে গেছ?

— বদলে গেছি কিনা জানি না কিন্তু অনেক কিছু তো ঘটে গেছে এই বারো বছরে।

— তা তোমাকে দেখেই বোঝা যায়।

- তাই নাকি?

— সত্যি বোঝা যায়।

আরো দু' একজন সিগারেট খেতে করিডরে আসেন। মাঝে মাঝে দু' একজন যাত্রী বাথরুম যাতায়াত করেন। সিগারেট শেষ হতেই ওকে জিজ্ঞেস করি, তোমার ঘুম পাচ্ছে না?

- এ ট্রেনে কী ঘুমোন যায়? সঙ্গে সঙ্গে ও বলে, তোমার বোধহয় ঘুম পাচ্ছে। চল, ভিতরে যাই।

— না, না, ঘুম পাচ্ছে না।

— লজ্জা করছ কেন? আমি তো বসে বসে দেখছিলাম, তুমি অঘোরে

ও আর দাঁড়ায় না। ভিতরে আসে। আমিও আমার সীটে এসে বসি। ভাবি, সাবিত্রীর কথা। না ভেবে পারি না।······

আমি তখন কলকাতার এক অখ্যাত দৈনিকের অতি সাধারণ রিপোর্টার। সুন্দরবনে দারুণ দুর্ভিক্ষ। সরকারী-বেসরকারী উদ্যোগে শুরু হল ত্রাণ সামগ্রী

পাঠান। মাঝে মাঝে খবরের কাগজের রিপোর্টারদেরও নিয়ে যাওয়া হয় ত্রাণ সামগ্রী বিতরণের সময়। কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী রফি আহমেদ কিদোয়াই-এর সঙ্গে সুন্দরবন সফর শেষ করে ফেরার ক'দিন পরই আবার সন্দেশখালি থেকে লঞ্চে উঠলাম বড়বাজার রিলিফ কমিটির আমন্ত্রণে। ঐ লঞ্চেই আলাপ হল জালানজীর সঙ্গে।

ক' মাস পরে হঠাৎ ট্রামের মধ্যে ওর সঙ্গে দেখা। পাশাপাশি বসে কথা-বার্তা হল। তারপর নেমে যাবার আগে উনি ওঁর একটা ভিজিটিং কার্ড আমার হাতে দিয়ে বললেন, রবিবার দুপুরে আমার বাড়িতে আসুন। দুপুরে ওখানেই খাবেন।

বিশেষ আগ্রহ না থাকলেও আপত্তি করলাম না। বললাম, আসব।

বিডন স্ট্রীট-সেণ্ট্রাল এভেনিউ'র মোড়েই জালানজীর বাড়ি। চিনতে অসুবিধে হল না। তিন তলায় উঠে ডান দিকে ঘুরতেই জালানজীর ফ্ল্যাট। অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে অভ্যর্থনা করলেন। স্ত্রী ও মেয়ের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন। আদর-আপ্যাযনেরও ত্রুটি রাখলেন না। খাওয়া-দাওয়ার পর আমার কাজকর্ম নিয়ে অনেক কথা হল। বিকেলবেলায় চা খেয়ে সোজা অফিস গেলাম।

পাঁচ-সাতদিন পর অফিসে টেলিফোন। আবার জালানজীর বাড়ি নিমন্ত্রণ। আবার আমি যাই। খাওয়া-দাওয়া, গল্প-গুজব করে কাটাই সারা দুপুর। আরো দু' তিনবার এমনি আসা-যাওয়ার পর জালানজী হঠাৎ একদিন বললেন, তুমি আমার মেয়েকে বাংলা শেখাও। আমি তোমাকে মাসে মাসে পঞ্চাশ টাকা দেব।

পঞ্চাশ টাকা! শুনেই আনন্দে আমি প্রায় লাফিয়ে উঠি কিন্তু বললাম, আমি তো রোজ আসতে পারব না।

—রোজ রোজ কেন আসবে? সপ্তাহে দু' তিন দিন এলেই যথেষ্ট।

—তাছাড়া সন্ধ্যের দিকে তো কাগজের কাজে ব্যস্ত থাকি।......

—সন্ধ্যের সময়ই আসতে হবে, এমন কোন কথা নেই। যখন সময় পাবে তখনই চলে এসো। আমার মেয়ে তো সারাদিন বাড়িতেই থাকে।

এ বাড়িতে আসা-যাওয়া করে বুঝেছি, আমার সঙ্গে সাবিত্রীর মেলামেশার ব্যাপারে জালানজীর আপত্তি তো দূরের কথা, আগ্রহই বেশি। আমার খটকা লাগে। হাজার হোক মাড়বারী। এদের সমাজে তো এ ধরনের মেলামেশা কেউই সুনজরে দেখে না। তবে কী জালানজী খুবই প্রগতিবাদী? নাকি অন্য কোন কারণ আছে? যাই হোক আমি জানতে চাই, কিন্তু বাংলা শিখে আপনার মেয়ের কি লাভ?

জালানজী বললেন, কলকাতায় জন্মেছে, বড় হল কিন্তু বাংলা জানে না। এ তো অত্যন্ত লজ্জার কথা। তাছাড়া তোমার সঙ্গে আলাপ-পরিচয়ও হল। তাই ভাবলাম ও বাংলাটা শিখে নিক।

তখন সেকেণ্ড ক্লাশ ট্রামে চড়ার পয়সা থাকত না আমার পকেটে। তাই পঞ্চাশ টাকার লোভ ত্যাগ করতে পারলাম না। সাবিত্রীকে বাংলা পড়ান শুরু করলাম। সোম-বুধ-শুক্র। বেলা আড়াই-তিনটে থেকে চারটে-সাড়ে চারটে পর্যন্ত। জালানজী বাড়ি থাকেন না। ওঁর স্ত্রী রোজ ঐ সময় কোণার ঘরে ঘুমোন। সামনের ঘরের গদিতে বসে আমি সাবিত্রীকে পড়াই অজ-আম কর-খল। একটা বাংলা খবরের কাগজ নিয়ে যাই। একটু একটু করে খবরের কাগজ পড়াবার চেষ্টা করি। সাবিত্রীকে যা বলি, তাই শোনে কিন্তু মনে হয় বিশেষ উৎসাহ নেই। তাছাড়া এই আঠার-উনিশ বছরের মেয়ের মুখে হাসিও বিশেষ দেখি না। আমি অবাক হই কিন্তু প্রশ্ন করি না।

এক মাস হয়ে গেল। মাইনে পেলাম। আমি মহা খুশি। একটা খদ্দরের পাঞ্জাবি আর মিলের একটা সাধারণ ধুতি কিনলাম। সাবিত্রী একটু সহজ হয়েছে। আমিও। পড়াতে পড়াতে আমরা কথাবার্তা বলি। খবরের কাগজ সম্পর্কে ও কত কি জানতে চায়। জবাব দিই সাধ্যমত। পড়ান শেষ হলে রোজই দুটো-একটা মিঠাই আর এক কাপ চা জুটে যায়। কোনদিন ও নিজে, কোনদিন ওর মা দেন।

আরো এক মাস কেটে গেল। আবার পঞ্চাশ টাকা পেলাম। এছাড়া মধ্যাহ্ন বা নৈশ ভোজনের আমন্ত্রণ তো পাই-ই।

রোজ একবার বেল বাজালেই দরজা খুলে যায় কিন্তু সেদিন তিন-চারবার বেল বাজাবার পর সাবিত্রী চোখ ডলতে ডলতে এসে দরজা খুলল। জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি ঘুমুচ্ছিলে?

—হ্যাঁ।

—তোমার মাও কি ঘুমুচ্ছেন? রোজ তো উনি দরজা খুলে দিয়েই ঘুমুতে যান।

—মা বাড়ি নেই।

আমি গদীতে বসতে গিয়েও বসতে পারি না। জিজ্ঞাসা করি, মা কোথায়?

—বাবা আর মা তারকেশ্বর গিয়েছেন।

—তুমি গেলে না কেন?

আপনি যে আসবেন।

- তাই বলে তোমাকে একলা রেখে ওঁরা দুজনে চলে গেলেন ?

সাবিত্রী হেসে বলল, হ্যাঁ।

আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবি। অবাক হয়ে ভাবি। ওর বাবা-মার কি কোন কাণ্ডজ্ঞান নেই ? এত বড় ফ্ল্যাটে ওকে একলা রেখে গেলেন ? আজ আমার আসার দিন। তা জেনেও ওঁরা ওকে একা রেখে গেলেন ?

—কি হল ? বসুন। আমি চা করে আনছি।

—চা করতে হবে না। আমি যাই।

— পড়াবেন না ? সাবিত্রী যেন একটু চাপা হাসি হেসে প্রশ্ন করে।

—থাক, আজ আর পড়তে হবে না।

এবার সাবিত্রী আমার দিকে তাকিয়ে সোজাসুজি জানতে চায়, আমি একা আছি বলে চলে যাচ্ছেন ?

—হ্যাঁ। আমিও সোজাসুজি জবাব দিই।

—আমার বাবা-মা যদি আমাকে একা রেখে যেতে পারেন, তাহলে আপনার পড়াতে আপত্তি কি ?

—তোমার আপত্তি নেই ?

সাবিত্রী মাথা নেড়ে বলল, না।

—তাহলে পড়বে ?

সাবিত্রী হেসে বলল, আপনি পড়ালেই পড়ব।

না, আমি চলে গেলাম না। বাইরের ঘরের গদীতে বসলাম। সাবিত্রী চা আর মিঠাই আনল। চা-মিঠাই খাওয়া শেষ হতেই বললাম, বইপত্তর নিয়ে এসো।

— সত্যি পড়াবেন ? সাবিত্রী হেসে প্রশ্ন করে।

আমি ওর হাসি দেখে, প্রশ্ন শুনে ভয় পাই। মনে মনে ভাবি, সর্বনাশ ! নিশ্চয়ই কোন চক্রান্ত করে আমাকে এরা বিপদে ফেলতে চায়। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে আরো কত কি ভাবি।

— কি ভাবছেন ?

সাবিত্রীর প্রশ্ন শুনে চমকে উঠি। সামলে নিয়ে বলি, না, কিছু না।

—আপনি কি খুব চিন্তিত ?

আমি সহজ হবার জন্য বলি, চিন্তিত মানে মাঝে মাঝে ভাবি, তোমার বাংলা

শিখে কি লাভ।

— লাভ-লোকসান জানি না। বাবা বলেছেন বলেই শিখছি।

—শুধু বাবা বলেছেন বলেই শিখছ ?

— হ্যাঁ।

এবার আমি বলি, আচ্ছা সাবিত্রী, তোমাকে দেখে মনে হয় তুমিও সব সময় কি যেন ভাবছ।

—কই ? আমি তো কিছু ভাবি না।

— তুমি না বললেই আমি স্বীকার করব ? সব সময় তুমি যেন অন্যমনস্ক হয়ে কত কি ভাবনা-চিন্তা করো।

—তাই মনে হয় ?

—শুধু তাই নয়। তোমাকে কখনও হাসতেও দেখি না।

সাবিত্রী চুপ করে থাকে।

আমি চুপ করে থাকি না। বলে যাই, তোমাদের বাড়ির আবহাওয়াটাও যেন কেমন অস্বাভাবিক মনে হয়। তোমার বাবা যেন চান, আমি তোমার সঙ্গে খুব মেলামেশা করি ..

—হ্যাঁ, উনি তাই চান।

—তোমার মারও আপত্তি আছে বলে তো মনে হয় না।

—মার আপত্তিও নেই, সম্মতিও নেই।

এবার হেসে প্রশ্ন করি, তোমার ?

সাবিত্রী মুখ নীচু করে বলল, আমার কথা পরে একদিন বলব।

সেদিন আরো কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলে চলে আসি। আবার পড়াতে যাই। আবার জালানজীর নিমন্ত্রণ।

বাইরের ঘরের গদীতে তাকিয়া হেলান দিয়ে আমি আর জালানজী কথা বলছিলাম। একথা-সেকথার পর হঠাৎ জালানজী বললেন, এ দেশে কি জার্নালিজম করবে ? বিলেত-আমেরিকা চলে যাও।

তখন আমার এমনই অবস্থা যে, গায়ে জামা থাকলে পায়ে চটি থাকে না, চটি থাকলে জামা থাকে না। চা খেলে ট্রামে চড়তে পারি না। আর আমি যাব বিলেত আমেরিকা ? বললাম, কি যে বলেন ? আমি বিলেত-আমেরিকা যাব কিভাবে ?

—কেন ? কি অসুবিধা ? পাশপোর্টভিসা ? সব হয়ে যাবে।

আমি হেসে বলি, অত টাকা কোথায় পাব ?

জালানজী আমার কাঁধে হাত রেখে বললেন, তার জন্য চিন্তা করো না। সে দায়িত্ব আমার।

আমি স্তম্ভিত হয়ে ওঁর দিকে তাকাই। মুখে যেন কোন কথা আসে না।

জালানজী হেসে বললেন, তোমাকে আমি ভালবাসি। তোমার মত সৎ, বুদ্ধিমান ছেলের জন্য কিছু করতে পারলে আমারও ভাল লাগবে।

—কিন্তু……

—কোন কিন্তু নেই। তুমি যদি যেতে চাও, তাহলে রবিবার দুপুরের দিকে চলে এসো। তোমার সঙ্গে আরো কয়েকটা জরুরী বিষয়ে আলোচনা করব।

রবিবার দুপুরে আমি হাজির হতেই জালানজী দু' হাত বাড়িয়ে আমাকে বুকের মধ্যে টেনে নিলেন। সাবিত্রী চা দিয়ে গেল। আমরা জার্নালিজম, বিলেত-আমেরিকা নিয়ে বেশ কিছুক্ষণ আলাপ-আলোচনা করলাম। তারপর জালানজী হঠাৎ প্রশ্ন করলেন, সাবিত্রীকে তোমার কেমন লাগে ?

এ প্রশ্নের রহস্য বুঝতে না পেরে আমি সহজভাবেই বললাম, সাবিত্রী সত্যি ভাল মেয়ে।

—আমার সাবিত্রী সত্যি ভাল মেয়ে। আমি চাই না এই মেয়েটা কোন কনজারভেটিভ মারবাড়ী পরিবারে গিয়ে কষ্ট পাক!

আমি ওঁর মুখের দিকে তাকিয়ে আছি। একাগ্র মনে শুনছি ওঁর কথা।

—আমি ভাবছিলাম, তুমি যদি সাবিত্রীকে বিয়ে কর তাহলে আমি তোমাদের বিলেত-আমেরিকা পাঠিয়ে দেব।……

—অ্যাঁ। ওঁর কথা শুনে আমি বোবা হয়ে যাই।

—জীবনে সেটলড করার জন্য তোমাদের যা কিছু দরকার, তার ব্যবস্থা আমি করব কিন্তু তোমরা এ দেশে থাকতে পারবে না।

ওঁর কথায় আমি এমন বিস্মিত ও লজ্জিত হয়ে পড়ি যে, আমি কোন কথা বলতে পারি না। উনি আরো অনেক কথা বললেন। সব শেষে বললেন, যা বললাম, তা ভেবে দেখো। কোন তাড়াহুড়ো করার দরকার নেই। তুমি সাবিত্রীর সঙ্গে কথা বলতে পারো, মেলামেশা করতে পারো। তারপর সবকিছু ভেবে আমাকে জবাব দিও।

পরের দিন সোমবার অনেক দ্বিধা-সঙ্কোচের সঙ্গেই সাবিত্রীকে পড়াতে গেলাম। যথারীতি জালানজী ছিলেন না। ওর মা ঘুমুচ্ছেন ভিতরের ঘরে। মনের মধ্যে

এমন একটা চাপা উত্তেজনা বোধ করছিলাম যে, শেষ পর্যন্ত আর চেপে রাখতে পারলাম না। বললাম, তুমি কি জানো কাল তোমার বাবা আমাকে কি বলেছেন ?

ও মুখ নীচু করে বলল, জানি।

- সব কথা শুনেছ ?

—হ্যাঁ।

-- তুমি মত দিয়েছ ?

সাবিত্রী মুখ উঁচু করে না। মুখ নীচু করেই বলে, বাবা আর আপনি যা ঠিক করবেন তাই হবে।

—তোমার কোন মত নেই ?

মুখে না, শুধু মাথা নেড়ে বলল, না।

—কিন্তু তুমি কেন আমার মত একজন গরীব বাঙ্গালীর ছেলেকে বিয়ে করবে ?

সাবিত্রী জবাব দেয় না।

এবার আমি হেসে বলি, কি হল ? আমাকে বুঝি তোমার পছন্দ না ?

—আমি তো তা বলি নি।

--কিন্তু আমাকে ভাল লাগে তা কি বলেছ ?

ও এবার মুখ তুলে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, আপনাকে আমার সত্যি ভাল লাগে।

—সত্যি বলছ ?

—হ্যাঁ সত্যি কথাই বলছি।

—আমাকে বিয়ে করবে ?

— আপনি বললে নিশ্চয়ই করব।

—করবে ?

— বললাম তো, আপনি বললে নিশ্চয়ই করব কিন্তু তার আগে আপনার সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে।

—কি কথা ?

—অনেক কথা।

- বলো কি বলতে চাও।

—না, না, আজ না। আরেকদিন বলব। তাছাড়া এখানে বসেও সে কথা

হবে না। অন্য কোথাও বলব।

তারপর একদিন কলকাতার এক নির্জন প্রান্তে বসে সাবিত্রী আমাকে সব কথা বলেছিল। সে বিবাহিতা কিন্তু পণের টাকা পুরোপুরি না পাওয়ায় শ্বশুরবাড়ী থেকে সে নির্বাসিতা।

—সে কি ?

– হ্যাঁ, আমাদের সমাজে হরদম এ ঘটনা ঘটছে।

– কে তোমাকে তাড়িয়েছেন ? শ্বশুর-শাশুড়ি ? নাকি স্বামী ?

—আমার স্বামী খুবই ভাল কিন্তু তার তো কিছু করার নেই। শ্বশুরমশাই যতদিন বেঁচে আছেন ততদিন তার কথার কোন দাম নেই।

আমি চুপ করে ভাবি।

সাবিত্রী বলে, আমাদের সমাজের ঘরে ঘরে এই সমস্যা। কেউ আত্মহত্যা করে, কেউ লুকিয়ে-চুরিয়ে হাজার রকম অন্যায় করে। আমার মত মেয়ের বাবা-মাকেও সমাজে বহু কথা শুনতে হয়।

—কিন্তু তোমার বাবা কি সত্যি তোমাকে আবার বিয়ে দিতে চান ?

—হ্যাঁ কিন্তু লুকিয়ে। সাবিত্রী থেমে বলে, তাছাড়া আপনি যদি সত্যি সত্যি আমাকে বিয়ে করেন তা হলে তো সেদিনই আমাদের বাইরে পাঠিয়ে দেবেন।

আমি আবার চুপ করে ভাবি। সাবিত্রীও চুপ করে বসে থাকে। কিছুক্ষণ পরে ও বলে, একটা লোক কথার খেলাপ করায় বাবা বিয়ের সময় পুরো দেড় লাখ টাকা দিতে পারলেন না। বাবা বার বার আমার শ্বশুরমশাইকে বললেন, তিন মাসের মধ্যে বাকি সত্তর হাজার টাকা দিয়ে দেবেন কিন্তু শ্বশুরমশাই আমাকে এক মাস পরেই পাঠিয়ে দিলেন।

—তারপর ?

– তারপর বাবা নিজে টাকা নিয়ে গিয়েছেন, ক্ষমা চেয়েছেন কিন্তু শ্বশুরমশাই তাঁকে প্রায় বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছেন।

—তারপর আর কোন যোগাযোগ নেই ?

—না।

এবার আমি বলি, দুটো-একটা কথা জিজ্ঞেস করব। ঠিক-ঠিক জবাব দেবে তো।

—হ্যাঁ।

— তোমার স্বামী কি সত্যি তোমাকে ভালবাসেন ?

ও মাথা নেড়ে বলল, হ্যাঁ।

— তুমিও তোমার স্বামীকে ভালবাসো ?

ও আবার মাথা নেড়ে বলল, হ্যাঁ।

— তোমার কি মনে হয়, তুমি আবার তোমার স্বামীর কাছে ফিরে যেতে পারবে ?

— শ্বশুরমশাই মারা গেলেই ও আমাকে নিয়ে যাবে।

— উনি কি সে কথা তোমাকে বলেছেন ?

— না বলেন নি কিন্তু আমি জানি।

— উনি কি তোমাকে চিঠিপত্র লেখেন ?

— না।

— তাহলে কি করে জানলে উনি তোমাকে আবার নিয়ে যাবেন ?

— উনি আমাকে নিশ্চয়ই নিয়ে যাবেন।

— তুমি তার জন্য অপেক্ষা করবে তো ?

— আপনি অপেক্ষা করার সময় দিলেই অপেক্ষা করব।

আমি হেসে বলি, আমি বললেই অপেক্ষা করবে ?

— এখন তো আপনার উপরই সবকিছু নির্ভর করছে।

আমি আবার হেসে বলি, হ্যাঁ। তুমি নিশ্চয়ই অপেক্ষা করবে। তোমার স্বামী নিশ্চয়ই তোমাকে নিয়ে যাবেন।

সাবিত্রী যেন আমার কথা শুনে চমকে ওঠে। জিজ্ঞেস করে, আপনি আমাকে বিয়ে করবেন না ? বিলেত যাবেন না ?

আমি হাসতে হাসতে মাথা নেড়ে বলি, না, বিয়েও করব না, বিলেতেও যাব না।

আমি জানি, সেদিন সেই মুহূর্ত থেকে সাবিত্রী আমাকেও ভালবাসে।

তারপর কাজ-কর্মের অছিলায় সাবিত্রীকে বাংলা শেখান ছেড়ে দিলেও যাতায়াত মেলামেশা বন্ধ হল না; বরং বাড়ল। দুজনের মাঝখানের দূরত্বও অনেকটা কমে গেল। জালানজী কিছু বলার আগেই সাবিত্রী ওর বাবা-মার সামনেই আমাকে বলে, হঠাৎ না বলে পালিয়ে যেও না। আমি পুরি ভাজছি।

না, আমি হঠাৎ পালাই না। ওর হাতের পুরি-সব্জি খেয়েই আসি।

এমনি করেই চলছিল দিন। তারপর আমি জীবনযুদ্ধে দিগ্‌ভ্রষ্ট নাবিকের মত

দিশেহারা হয়ে যাই। সাবিত্রীর কাছে যাবার সময় হয় না। তারপর তো কলকাতা ছেড়েই চলে গেলাম। দুই-তিন বছর পর জালানজীর সঙ্গে দেখা হয়েছিল দমদম এয়ারপোর্টে। শুনেছিলাম, সাবিত্রীকে তার স্বামী নিয়ে গেছেন। একটা ছেলেও হয়েছে।

রাজধানী এক্সপ্রেসের প্রায়ান্ধকার কামরায় বসে বসে সেইসব কথাই ভাবছিলাম। হঠাৎ সাবিত্রী ওর সিট থেকে উঠে এসে আমার মুখের সামনে মুখ নিয়ে জিজ্ঞেস করল, ঘুমুচ্ছ?

—না।

—হা ভগবান! তবে এতক্ষণ চুপচাপ কি করছিলে?

—তোমার কথা ভাবছিলাম।

—সত্যি?

—সত্যি।

—আমিও এতক্ষণ বসে বসে তোমার কথাই ভাবছিলাম।